উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
ও
আমরা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য

প্রকাশক / পরিবেশক
অমিত ভট্টাচার্য

২০১৮

ALLAUDDIN KHAN O AMRA
by Jotin Bhattacharyya

প্রকাশক
অমিত ভট্টাচার্য

পুনঃ প্রকাশক
ড. প্রণব সেন

প্রথম প্রকাশ : ১২ই আশ্বিন (মহালয়া) ১৩৮০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫ (১৬ই পৌষ, ১৪০১)
তৃতীয় প্রকাশ : ১৪ জুলাই, ২০১৮ (রথযাত্রা, ২৯ আষাঢ়, ১৪২৫)

অক্ষরবিন্যাস
দি ডিকমলেসার
৬০, সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রণ
আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৫, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পত্নী
শ্রদ্ধেয়া মা মদনমঞ্জরী দেবী, সংগীতের অনন্তরত্নগর্ভা দেবী অন্নপূর্ণা
এবং বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের
তৃতীয় প্রজন্মকে

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

Ustad Allauddin Khan and His Music
উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা (১ম খণ্ড)

প্রকাশনার নেপথ্যে

পুনঃ প্রকাশক : ড. প্রণব সেন (Violinist)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (রসায়ন বিভাগ)
স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথমেই জানাই কোন ব্যবসায়িক স্বার্থে পুস্তকটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে না। কপি রাইটের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বিনা অনুমতিতে কোন পুস্তক প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপকর্ম। আমার গুরুর ঐকান্তিক ইচ্ছাই আমার পাথেয়। তাঁর চোখে আমার প্রয়াস অপত্যকর্ম বলেই বিবেচিত হতো বলে আমি বিশ্বাস করি। গুরুজী বারবার বলতেন বাবার জীবনী সকলের জানা উচিত।

নবকলেবরে মুদ্রণকল্পে খণ্ডপ্রতি সাতশত পঁচিশ টাকার ব্যয়ভার বহন করেও বইটির বৈষয়িক মূল্য নির্দ্ধারণ করা থেকে বিরত রইলাম। কারণ সাহিত্যরসিকের চোখে বইটি অমূল্য হবে বলেই আমি মনে করি। এই বই ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য ও রসিক পাঠকের জ্ঞান স্পৃহা নিরসন করতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত হোক। এটাই আমার প্রার্থনা।

এক বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছিলেন "Abnormally normal, gorgeously simple and wisely foolish"। আমার পূজনীয় গুরুজী পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পড়ে মনে হয়েছিল উপরোক্ত অভিধা মাত্র আর একজনের সম্পর্কে সুপ্রযোজ্য হতে পারে। তিনি হলেন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ।

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত বাংলা কথাসাহিত্য যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনই কোন অতি নিপুণ যন্ত্রশিল্পীও চেষ্টাকৃত উদাসীনতা ও অনাসক্তি দিয়ে তাঁর চেতনাকে সেনিয়া মাইহার (মৈহার) ঘরানার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন না। শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রবহমান ধারায় আচার্য আলাউদ্দিনের উপস্থিতি এতটাই ওতপ্রোত। অথচ উস্তাদ বাবা আমাদের কাছে প্রায় অজানা।

এখানে উল্লেখনীয় বাবার একান্ত প্রিয় শিষ্য ও সচিব পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য লিখিত "Ustad Alauddin Khan and His Music" (১৯৭৯) একটি সত্যানুসারী প্রামাণিক দলিল হলেও মূলত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় হওয়ায় তা সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবার ইংরাজিতে লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণবোধ্য হয়ে ওঠেনি।

১৯৯৬ সালে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের কাছে আমার ঈপ্সিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়ার অনতিবিলম্বে পণ্ডিতজীর লেখা 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' হাতে এসেছিল। এক নিশ্বাসে প্রথম খণ্ডটি শেষ করলাম। মনে হল ঘন তমিস্রার বুক চিরে বর্ণাঢ্য উদ্ভাসে অরুণোদয় দেখলাম। আমার সমুখে সঙ্গীতাচার্য মহামহিম রূপে প্রতিভাত হলেন। লেখক ছিলেন উস্তাদ বাবার একমাত্র শিষ্য, যাঁকে তিনি নিজ বাসভবনে আশ্রয় দিয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলত প্রতিনিয়ত খুব কাছ থেকে বাবাকে দেখার সুযোগ হওয়ায় লেখকের পক্ষে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সঙ্গে বাবার অন্তর্জীবনের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বইটি ঐতিহাসিক উপাদানে সম্পৃক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে যার সাহিত্যমূল্য অসীম। বইটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আর একটি দিনপঞ্জীর, শ্রীম কথিত "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ ক'টি বছরের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যা না পেলে পরমপুরুষ আমাদের কাছে অধরা থেকে যেতেন। শুধু জীবনী নয়, উস্তাদ বাবার সার্বিক মূল্যায়নে পণ্ডিতজীর প্রয়াস একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের জীবনীকার (আশার ছলনে ভুলি) শ্রদ্ধেয় গোলাম মুরশিদের অনন্য অবদানের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

গভীর পরিতাপ ও হতাশায় বিষয় এই যে উস্তাদ বাবার মতো ক্ষণজন্মা সঙ্গীতসাধকের স্মৃতিরক্ষার কোন সার্বিক প্রচেষ্টা আজও করা হয়নি। তিনি এতটাই অজ্ঞাত যে তাঁর জন্ম সময়ও বিতর্কিত। তবে একট সুগভীর তৃপ্তির দিকও আছে। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মিলনের স্বার্থান্বেষী উদগাতাদের বিষাক্ত কুনজর এড়িয়ে ব্রহ্ম আজও অনুচ্ছিষ্ট। প্রার্থনা করি কালপুরুষের আশীর্বাদে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের "আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" পুস্তকটির মাধ্যমে তাঁকে বাঙালি চিনুক জানুক স্মরণ করুক। একটি মহতী উপেক্ষার অবসান হোক।

"তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে"। সেই সুরের ধারায় অবগাহন করতে, তাঁর সত্তাকে স্পর্শ করতে, তাঁর মহত্ত্বকে আত্মস্থ করতে, তাঁর অবদানকে উপলব্ধি করতে, তাঁকে মননে চিন্তনে চৈতন্যে ধরে রাখার আকুতি নিয়ে পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে প্রয়াসী হলাম। গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় কেটে যাওয়া চন্দন মৃগনাভি সৌরভাকীর্ণ আমার শিক্ষা জীবনের শেষ কুড়ি বছরের স্মৃতির আবিলতায় আজও জারিত হই। এই স্মৃতিমেদুরতাই আমার অনুঘটক হয়ে আমায় উৎপিপাসু করেছে। উদ্যমী করেছে। উৎসাহিত করেছে। মৈহারে উস্তাদ বাবার নির্জন অনাড়ম্বর সমাধিভূমি দেখে চোখে জল আসে। হয়তো বা কেবলমাত্র "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা" তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষাকল্পে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের একক প্রচেষ্টার এক প্রকীর্ণ প্রতিফলন হয়ে ভবিষ্যতেও জাগরুক থাকবে।

আমার পূর্ববর্তী গুরুবর্গের অসীম কৃপায় আমি যেন একটু একটু করে বেনারসে গুরুজীর কাছে আমার সঙ্গীত শিক্ষাজীবনের (শিক্ষাকাল ১৯৯৬-২০১৬) শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ

অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। এক সামান্য তুচ্ছ অকিঞ্চনের আজীবনের মাধুকরী যাঁদের করুণা মমতা দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিল আমার সেই গুরুবর্গের স্মৃতিচারণ করে তাঁদের প্রতি আমার অপরিশোধ্য ঋণের বিনম্র স্বীকৃতি রেখে গেলাম। মূল পুস্তকের শেষে স্মৃতিকথাটি সংযোজিত হল। উপসংহারে জানাই, আমার স্বপ্নের বাস্তবায়নের তিন রূপকার হলেন পুত্রপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণগোপাল অনুজপ্রতিম অধ্যাপক ড. শতদল ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী জয়া সেন।

জন্মাষ্টমী, ১৬ই ভাদ্র, ১৪২৫
এসি ৪৫, স্ট্রিট নং ৪৩
নিউ টাউন
কলকাতা ৭০০১৫৬
Mobile : 98742-88158

ড. প্রণব সেন (Violinist)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
(রসায়ন বিভাগ)
স্কটিশ চার্চ কলেজ
কলকাতা ৭০০০০৬

স্বগতোক্তি

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীটা দ্বিতীয় সূর্য্য পরিক্রমা আরম্ভ করেছে আর পাঠকের হাতে দ্বিতীয় খণ্ড পৌঁছনোর প্রাক্কালে হয়তো সে যাত্রাও সমাধা হবে। বাবার জীবনের পূর্বমেঘ যেমন রসগ্রাহীদের প্রীত ও অভিভূত করেছে, তেমনই নিন্দুককূলকে করেছে মুখর। আমি বলি জীবন্ত মে শত্রুগণাঃ সদৈব। আমার শত্রুগণ দীর্ঘজীবী হোন কারণ তাঁরাই ত্রুটির শোধনাগার। আঙ্গুল তুলে দোষ না দেখালে শোধরাব কি করে?

দ্বিতীয় খণ্ড, উত্তরমেঘ। এতে বোধহয় উত্তরী বায়ুর অধীরতা একটু বেশীই আছে। অনেক নিস্তরঙ্গ জলাভূমিরই উত্তাল হবার সম্ভাবনা থাকবে কিন্তু নান্যপন্থাঃ। একে ন্যায়ের দণ্ড তায় চোখ বাঁধা মহাকাল বিচারক তাই অমোঘ পরিণাম এড়ানো সত্যই দুষ্কর।

প্রথম খণ্ডে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব অর্থাৎ আমার উস্তাদ বাবার জীবনের একটা ধারাবাহিক রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যা আমার বই-এর নামের পূর্বার্ধ, অর্থাৎ "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ" আর দ্বিতীয় খণ্ডের ইতিবৃত্ত "ও আমরা"।

প্রথম খণ্ডে বাবার অর্থাৎ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের আমার দেখা ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত ধারাবাহিক জীবন যাত্রাকে লিপিবদ্ধ করার সাথে এঁর আগের জীবনের বর্ণনাও রয়েছে। আমার মনে হয়েছে কিছু বর্ণনা পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। তথাপি আমার বক্তব্য হোল—একটা জীবনকে হুবহু তুলে ধরতে গেলে একটু মোনোটনী তো আসবেই। নদীতেও সারা বছর বন্যার জলপ্লাবন থাকে কি? শীতের নিঃশব্দতা, বৈশাখের হাঁটু জল আর বর্ষায় তীরভাঙ্গা প্লাবনকে এক করলে তবেই নদীর ইতি কথা পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তার বিরাট পর্ব থেকে শান্তিপর্ব পর্য্যন্ত। "ও আমরা" তাই বোধহয় একটু বেশী মাত্রায় অম্ল-মধুর। সাহিত্যে ইমপার্শিয়ল বা নিরপেক্ষতা শব্দটা সত্যই নিরাকার ব্রহ্মের মত। যত মত তত পথ। তাই সকারাত্মক নিরপেক্ষ বিভীষণ দোষ-গুণ বিচার করে সত্য, ন্যায় বা রামের পক্ষ ধারণ করে আজীবন গালাগালি খাচ্ছে। এই যদি ভদ্রলোক নকারাত্মক নিরপেক্ষ হয়ে বলতেন—দাদা খারাপ কাজ করেছেন, তাই দাদাকে বর্জন করলাম, কিন্তু দেশধর্ম ও লোকধর্মকে মনে রেখে রামের পক্ষে না গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বনে যাচ্ছি, তা হলে গালাগালির হাত থেকে মুক্তি পেতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা হতো যথাস্থিতিবাদের সমর্থন। লাভ হ'তো রাবণেরই।

আমি রামের কল্যাণকল্পে রাবণারি হয়েছি। আমার মনে হয়েছে ঘরে যদি পাপ ঢোকে তাহলে ঘর আর ঘর থাকে না। তাই ঘরভেদী শব্দটা অবান্তর বা নীচ স্বার্থপ্রণোদিত। যদি শম্বুকবধের পরও রাম মর্যাদা-পুরুষোত্তম, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত কারণ আমার কলম একাই নিজের রক্ত ঝরিয়েছে, এখনও শম্বুক অক্ষত।

যতীন ভট্টাচার্য

উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও আমরা

৪২

কিছুদিন পরেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বাবাকে একটা বই পাঠালেন। উত্তরে বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখলাম, 'মহারাজ, আমার জীবনে অনেকদিন থেকে একটি বাসনা আছে। মৈহার ছেড়ে যে সময় কোলকাতায় যাব আপনার কাছে, সেই সময় মনের বাসনা নিবেদন করব। আশা করি, আপনি আমায় নিরাশ করবেন না।'

মৈহারের বাড়ীর উপর, পরের পর যে দুটী অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল, তার জন্য মনটা ভারাক্রান্ত। আজ শুক্রবার। বাজনা বাজাতে হবে না। মনটা ভাল নাই সেইজন্য ডেভিড ও রবীনকে নিয়ে সারদা দেবী দর্শন করতে গেলাম। দর্শন করে পুজো দিলাম। তারপর সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে একাগ্রচিত্তে চোখ বুজে প্রার্থনা করে নিজের মনে মনে বললাম, 'মা, মৈহারে এসে অবধি শুনেছি তোমার অনেক অলৌকিক শক্তি আছে। যদি সত্যই তোমার মহিমা থাকে তাহলে এই অধমের মনে শান্তি দাও। যা তোমার ভাল মনে হয় তাই করো। যে কোন বিপদই আসুক, আমি যেন জয় করতে পারি। আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও, আচমকা কি মনে হোল জানি না, ছেলে মানুষের মত কোথা থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসতে লাগল। শরীরটা হঠাৎ কাঁপছে। মনে হোল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এ আমার জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা। ডেভিড এবং রবীন আমার অবস্থা দেখে, ঘাবড়ে গিয়ে আমার হাত ধরে বলল, 'শান্ত হোন দাদা।' কিছুক্ষণ পরে লজ্জা হোল ডেভিড এবং রবীনের সামনে, এ কি ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেললাম। প্রধান পূজারী আমার এই অবস্থা দেখে বললেন, 'দাদা আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ছোটবেলা থেকে বুড়ো হয়ে গেলাম। দেবীর বহু লীলা দেখলাম। বুঝেছি আপনার মনে কোন কষ্ট আছে, দেখবেন মা আপনার কষ্ট দূর করে দেবেন। আমার এই কথা ভুলবেন না। আপনার ইচ্ছা পূরণ হলে কখনও এসে পুজো দিয়ে যাবেন। এ হোল মায়ের খেলা।' এর পর প্রায় আধঘণ্টা মন্দির প্রদক্ষিণ করে, প্রসাদ নিয়ে মন্দিরের নীচে নেমে বাড়ী চলে এলাম।

আলিআকবরের চিঠি এলো বাবার কাছে। আলি আকবর প্রার্থনা করে লিখেছে, 'চোদ্দ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ আলিআকবর কলেজ অফ মিউজিকের উদ্‌ঘাটন হবে। এই উপলক্ষে আপনাকে কোলকাতায় এসে বাজাতে হবে। আমার খুব ইচ্ছা অন্নপূর্ণা বাজায়, কিন্তু অন্নপূর্ণা বাজাতে চাইছে না। আপনি আদেশ করলে অন্নপূর্ণা না করতে পারবে না। মাননীয় গভর্ণর কলেজের উদ্‌ঘাটন করবেন। আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন।' ইতি আপনার অধম সেবক আলিআকবর।

বাবা চিঠি পড়ে খুসী হলেন। বললেন, 'আমার গুরুর বিদ্যা আলি আকবর ছাত্রদের

শেখাবে এ ভাল কথা। আলিআকবর যখন লিখেছে তা হলে যেতেই হবে।' যথা সময়ে বাবা গেলেন। ফিরেও এলেন। মনে ইচ্ছা থাকা সত্বেও বাবাকে বলতে সাহস পেলাম না বাবার সঙ্গে কোলকাতায় যাবার জন্য। জানি বাবা বলবেন, 'কলেজ কি করে চলবে? তা ছাড়া আগে শিক্ষা করো, তারপর বাজাবে এবং সকলে শুনবে।' এই বাজনার সম্বন্ধে এক বছর পরে কোলকাতায় গিয়ে সব শুনেছিলাম। একটী ঘরোয়া আসরে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের সামনে, এই প্রথম একক অন্নপূর্ণা দেবী পুরিয়া ধানেশ্রী বাজিয়েছিলেন। এ ছাড়া কলেজের উদ্‌ঘাটনের দিন কনফারেন্সে কৌশি এবং মাঝখাম্বাজ বাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু কারো কি জানা আছে সেই সময়কার নিভৃত নিঃসঙ্গ মানসিকতার, যে সময়ে অন্নপূর্ণা দেবী বাজিয়েছিলেন আলিআকবর কলেজের উদ্ঘাটনের দিন। এই পরিস্থিতিতেও যে অপূর্ব বাজনা হয়েছিল তা শুনে একজনের মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। সেই বাজনার বিকৃত রূপ অলক্ষ্যে বসে একজন কত বড় মিথ্যার প্রোপাগাণ্ডা করেছিলো তা কি কেউ জানে? কে কৌশলে এই বাজনার বিকৃত টেপ করে লোক সমাজে বোঝাতে চেয়েছিল, বাজনা ভাল হয়নি, এ কথা কি কেউ জানে? এই বিকৃত টেপ বিক্রি করে ফাঁকতালে একজন কত টাকা কামিয়েছিলো এবং এখনও কামাচ্ছে, এ কথা কি কেউ জানে? যতই বিকৃত টেপ করুক কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য। প্রকৃত যে বাজনা বেজেছিল তা শুনেছি অনেক পরে।

বাবা মৈহারে ফিরে আসবার পর একদিন সেক্রেটারি অফ এডুকেশন এসে বললেন, 'ছাত্র নিবাসের জন্য একজন ওয়ারডেনের প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতি কেমন হচ্ছে লিখে জানাতে হবে। বিদ্যালয়ের মধ্যে, যে শিক্ষক সব পত্রালাপ করতে পারবে সেই শিক্ষক ছাত্রাবাসে থাকবে। ছাত্রাবাসে বিরাট হলঘর এবং ঘরের লাগোয়া রান্নার জায়গা আছে। যে ওয়ারডেন হবে, তাঁর বাড়ী ভাড়া লাগবে না।' সেক্রেটারি অফ এডুকেশনের কথা শুনে সুযোগ পেলাম। বাবাকে বললাম, 'বাবা এখন তো আমি একশো আশি টাকা মাইনে পাচ্ছি, সুতরাং আমি ছাত্র নিবাসে গিয়ে থাকব। সেইখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নেব। রোজ দুইবেলা আপনার সঙ্গে এসে দেখা করে যাব। চিঠি লেখা এবং কোন কাজ থাকলে সব করব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।' বাবা আমার কথা শুনে প্রথমে আপত্তি করে বললেন, 'আরে না না তুমি কোথাও যাবে না। সলামৎ খাঁ বাড়ী ভাড়া নিয়ে রয়েছে সুতরাং নিখরচায় সেই থাকবে। তাঁর বাড়ী ভাড়া লাগবে না।' বাবার কথা শুনে সেক্রেটারি বললেন, 'সলামৎ খাঁ কি লেখাপড়া জানেন? প্রত্যেক মাসে ছাত্রদের চাল চলন, শিক্ষার প্রোগ্রেসের রিপোর্ট ইংরাজীতে লিখতে পারবেন কি? এ ব্যাপারে আপনার সেক্রেটারির চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কেউ নাই।' অগত্যা বাবাকে অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হতে হোল। বাবা বললেন, 'রোজ দুই বেলা বাড়ী এসে খেয়ে যাবে।' হাতজোড় করে বাবাকে বললাম, 'একজন রাঁধবার লোক রেখে দেব। দুই বেলা খাবার খেতে গেলে যে সময় লাগবে, সেই সময় রিয়াজ করব।' অনেক কষ্টে বাবাকে রাজী করালাম।

পরের দিন সকালে ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠলাম। এই সময় দ্যুতি এবং ডেভিড সুন্দর ভাবে আমার ঘর গুছিয়ে দিলো। গুলগুলজী রান্না এবং ঘর পরিষ্কার করবার জন্য একটি দাই-এর

ব্যবস্থা করে দিলো। বিকেলে বাবা ব্যাণ্ডে এসে প্রথমেই আমার ঘরে এলেন। ছাত্রদের সামনে আমাকে দেখে, বাবা ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হোল আমার ছেলে। এতদিন আমার কাছেই ছিলো। তোমাদের জন্যই এখানে এসেছে। তোমরা তোমাদের গুরুকে সেবা করবে। আমার ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।' বাবার এই কথায় সকলের চোখে জল এসে গেল। নূতন জায়গায় এসে কয়েক রাত ঘুমই এলো না। দিন যায়, রাত আসে। রাত্রে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে। সকলেই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। এ কোথায় চলে এলাম। যদিও স্বাধীন মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্নেহনীড় থেকে একেবারে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রান্তরে। এখানে আবার অন্য সমস্যা। ছাত্ররা যদিও রান্নার ব্যবস্থা সব করে দেয়, কিন্তু এখানে অন্য রকম। বাবার বাড়ীর পরিবেশ এখানে কি পাবো। জন্মের পর কাশীর জীবনে মা ছিলেন। মাইহারে এসেও মা পেয়েছিলাম কিন্তু আজ দুই মায়ের কাছ থেকেই দূরে।

উপস্থিত রোজ সন্ধ্যায় ডেভিড, ইন্দ্রনীল, রবীন ও দ্যুতিকিশোর শিখতে আসে। আমার রিয়াজ কমে গেছে। বাবা উপস্থিত সকলকে শেখান বন্ধ করে দিয়েছেন। কি জানি কেন আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, কেননা বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আমি তো আসি নি মৈহারে। এখন আমার সাধনা করার সময়, অথচ এ কি বিড়ম্বনা। বিদ্যালয়ের কাজ ঠিকমত চলছে। একদিন সকালে পোষ্ট অফিসে চিঠি আনবার জন্য যাচ্ছি, দেখি বাবাও আসছেন। এ সময় বাবা তো কখনও আসেন না। বোধ হয় দেখতে আসছেন ছাত্ররা মন দিয়ে বাজাচ্ছে কিনা। বাবার বাজারে না গিয়ে, এ দিকে আসার কারণ কি? বাবা আমার কাছে এসেই বললেন, 'তুমি তোমার পদ বড় করে বাইস প্রিন্সিপাল হয়েছ, আর তুমি আমাকে তোমার থেকে ছোট পদ প্রিন্সিপাল করেছ। এত নীচ তুমি। একেই বলে গুরু মারা বিদ্যা।' বাবার কথা শুনে আমি অবাক। বললাম, 'কে বলেছে আপনাকে এ কথা?' আমার কথা শুনে বাবা ক্ষেপে লাল। বাবা বললেন, 'আমি কি বাজে কথা বলছি। তুমিই বল না? আমাকে করেছ প্রিন্সিপাল আর তুমি আমার চেয়ে বাইস গুণ বেশী উচ্চপদে বাইস প্রিন্সিপাল হয়েছো। এ কথা ঠিক কি না?' বাবার কথা শুনে বুঝলাম, কেউ বাবার মন ভাঙ্গানর জন্য বুঝিয়ে বলেছে, 'আপনি তো শুধুই প্রিন্সিপাল, আর যতীন ভট্টাচার্য আপনার থেকে বাইস গুণ বেশী।' ভাইস কথাটা, বাইস বলে বাবার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ এ ধরনের কথা বলে বাবার কান ভারি করেছে। বাবাকে বোঝান কঠিন ভেবে বাবাকে নিয়ে পোষ্টমাষ্টারের কাছে গিয়ে বললাম, 'বাবাকে বলুন তো, কার পদ বড়? প্রিন্সিপাল না ভাইস প্রিন্সিপাল।' আমার কথা শুনে পোষ্টমাষ্টার একটু অবাক হলেন। পোষ্টমাষ্টারকে ব্যাপারটা বোঝালাম। পোষ্টমাষ্টার বাবাকে বোঝালেন, কথাটা ভাইস প্রিন্সিপাল, বাইস প্রিন্সিপাল নয়। প্রিন্সিপালই বড় এবং তাঁর নীচে ভাইস প্রিন্সিপাল। বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে আপনাকে এই কথা বলেছে?' বাবা মৈহারের একজন এম.এল.-এর নাম বললেন। ব্যাপারটা বুঝলাম। যে হেতু এম.এল.এ নেতা, সেইজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। এই নেতার সঙ্গে আমার মৌখিক পরিচয় আছে। আমি এই নেতাকে বেশী প্রাধান্য

দিই না বলে, বাবার কাছে এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। ব্যাপারটা বাবা বুঝলেও বললেন, 'লোক এই রকম বলে কেন?' বাবার কথায় মেজাজ হঠাৎ গরম হয়ে গেল। বললাম, 'উড়ো খবর যাঁরা রটায়, ভেতরে তাঁরা তলিয়ে দেখে না। লোকে তো অনেক কথাই বলে। তাই বলে আপনি বিশ্বাস করবেন কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা আগে জানবেন তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। আমার প্রতি আপনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। সুতরাং বিদ্যালয় ছেড়ে কাশী চলে যাব। শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি পদত্যাগ পত্র জানিয়ে টেলিগ্রাম করছি।' বাবা আমার কাছে এ ধরনের কথা আশা করেন নি। বাবা বললেন, 'আরে আরে, তোমার জন্যই কলেজ খুললাম আর তুমিই চলে যাবে।' উত্তরে বললাম, 'বিদ্যালয়ে কাজ করবার জন্য আমার এক পয়সাও ইচ্ছা নাই। বিদ্যালয় করেছি আপনার কথা ভেবে। আমি শিক্ষকতার উদ্দেশ্য নিয়ে মৈহারে আসি নি।' এই কথা বলেই সামনেই রাখা টেলিগ্রাম ফর্মে ত্যাগপত্র লিখে পোষ্টমাষ্টারকে দিলাম। বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। বাবা পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কাগজে কি লিখেছে?' পোষ্টমাষ্টার ব্যাপারটা বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে ই, বাবা টেলিগ্রাম ফরমটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, 'আরে আরে, কি সব দুষ্ট লোক। মিথ্যা কথা বলেছে আমাকে, তার জন্য তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি।' বাবাকে বললাম, 'এই ধরনের ভুল আপনাকে বোঝাবে আর আপনি প্রতিপদে ভুল বুঝবেন। বিদ্যালয়ের কাজ ঠিক চলে যাবে, আমাকে অনুমতি করুন আমি মৈহার ছেড়ে কাশী গিয়ে সাধনা করি।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'বাবা, ভুল বুঝো না। আমার মাথার ঠিক নাই। এই দুষ্ট নেতা আমাকে ভুল বুঝিয়েছে। আর কখনও তোমাকে ভুল বুঝব না।' বাবার সরলতায় হাসিও পায় আবার দুঃখ হয়। বাবার চিঠি নিয়ে বাড়ী গিয়ে উত্তর লিখে যাচ্ছি দেখে, আচমকা বাবা বললেন, 'কি খাচ্ছ?' মা'কে ডেকে বললেন, 'কিছু খাওয়াও।' বললাম, 'আমার কোন কষ্ট নাই। একটী দাই রান্না করে দেয়।' এ কথা শুনে বাবা জোর করে গাছের ফল দিলেন। মনে মনে হাসি পেলো। যে হেতু ভুল বুঝে বলেছেন, সেইজন্য তাঁর খেসারৎ দিলেন ফল দিয়ে। ফল নিয়ে ছাত্র নিবাসে গেলাম।

৪৩

যে সময় মনটা ভারাক্রান্ত, নানা চিন্তায় বিপর্যস্ত সেই সময় চিঠি পেলাম হাথরস থেকে। লল্লা লিখেছে আমার পাঠানো অনুবাদ পেয়েছে। দুইটী প্রস্তাব দিয়েছে। প্রথম প্রস্তাবে জানিয়েছে ভাতখণ্ডের ছয়টি খণ্ডের প্রথম খণ্ডটির বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশে যদি চলে, তাহলে সব কটি খণ্ডই আমাকে দিয়ে অনুবাদ করাবে। তাঁর জন্য আমাকে হাথরসে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। থাকা খাওয়া ছাড়া কি পারিশ্রমিক পেলে আমি যেতে পারি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখেছে, সেপ্টেম্বারে তিন মাসের জন্য দক্ষিণ ভ্রমনে যাচ্ছে দুইটী উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্য, সঙ্গীত ম্যাগাজিনের প্রথম পাতার জন্য, দক্ষিণে গিয়ে, মন্দির থেকে নটরাজ এবং দেবদেবীর নৃত্যের যে ভাস্কর্য আছে, তার ফটো ওঠাবে। সঙ্গীত পত্রিকার জন্য, তিন বছরের খোরাক হবে। এ ছাড়া যেহেতু দক্ষিণে তাঁর জানাশোনা আছে, সেই জন্য আমি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে যাই তাহলে সঙ্গীতের কার্যক্রম রাখবে। আমি গেলে সেই ফাঁকে আমার কাছে শিখবে, এবং সেও আলাদা

বাজাবে। হাথরসের একজন তবলা বাদক জুম্মন খাঁ সঙ্গে যাবে। দক্ষিণ ভ্রমনে, প্রথমে মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, আন্নামালাই ইউনিভারসিটি, চিদম্বরম, মাদুরাই, ব্যাঙ্গালোর, মহিশূর, রামেশ্বরম এবং বেজওয়াডায় প্রোগ্রাম স্থির করবে। এই চিঠি পেয়ে মনে হোল খুব ভাল প্রস্তাব। মা সারদা বোধ হয় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। এই অযাচিত আমন্ত্রণে মনে হোল আমার মানসিক অশান্তি অনেকটা লাঘব হবে। বাজনা বাজাবার জন্য মোটেই উদগ্রীব হই নি। চিঠির উত্তরে জানালাম, 'ভাতখণ্ডের পাঁচটা খণ্ডের অনুবাদ পরে চিন্তা করব। দক্ষিণের সব জায়গায় প্রোগ্রামগুলির তারিখ যথাযথ ঠিক করো। ঠিক করে জানালেই মৈহার থেকে সোজা হাথরসে যাব এবং পরের দিনই মাদ্রাজে রওনা হবো।' চিঠি তো লিখে দিলাম, কিন্তু পরে মনে হোল বাবাকে তিন মাসের ছুটির কথা কি করে বলব? আমি না থাকলে বিদ্যালয় চলবে কি করে? অবশ্য উপস্থিত সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মন দিয়ে শেখাতে লাগলাম। বছরের ছয় মাস পেরিয়ে যাবার পর ছাত্রদের উন্নতি দেখে বাবাকে পরীক্ষার কথা বললাম। বাবা বললেন, 'এবারে পরীক্ষার ব্যবস্থা করো।' পরীক্ষার সব ব্যবস্থা হোল। বাবাই পরীক্ষা নিলেন। বাবাকে প্রস্তাব দিলাম, 'ইমন, ভৈরবীর পর, খাম্বাজ এবং কাফী রাগের এক একটী সরগম এবং তাঁর মধ্যেই হস্তসাধন করাতে হবে।' বাবা বললেন, 'তাই করো।'

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত। বৈচিত্রহীন জীবন। মাঝে মাঝে বাবার কাছে শিক্ষা করে আসি। ইতিমধ্যে কাশী থেকে রাজেশ মৈত্র আমার কাছে এলো শিক্ষার জন্য। ছাত্রাবাসে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম। ছাত্রাবাসে আসবার পর, রোজ ডেভিড, রবীন, দ্যুতিকিশোর এবং ইন্দ্রনীলকে শেখাই। রাজেশ চারদিন শিক্ষার পর চলে গেল কাশী। রাজেশকে বললাম, 'ছয় মাসের মত সাধনার জিনিষ দিলাম। পরে কাশীতে গেলে শেখাব।' সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি কি ভাবে কেটে যায় বুঝি না। তারপর আমার মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা ভর করে। এক এক সময়ে মনে হয়, মানুষ জীবনে ভুল করে। কিন্তু সে ভুলের জন্য যদি তার অনুশোচনা হয়ে থাকে, তাহলে সেই মানুষকে ভর্ৎসনা না করাই কি বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়? এক সময় মনে হয়, ধৈর্য আর নিষ্ঠা, এই দুই মনের শুচিতা রক্ষা করে। আমার তো মনে হয় দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ ভুলে থাকবার পক্ষে সঙ্গীতের চেয়ে বড় জিনিষ আর কিছুই নাই। আমার নিঃসঙ্গ বৈচিত্রহীন জীবনে, সঙ্গীত একটা বড় রকমের অবলম্বন হবে। তাই বৃথা রাত না জেগে যন্ত্র নিয়ে বসে যাই। গভীর রাত অবধি বাজাই। সেইসময় সব ভুলে যাই। এ ভগবানের চরম আশীর্বাদ। তারে যখন আঘাত করি, তখন মনের সরোবরের উপর ছেয়ে থাকা পানাগুলো আপনি আপনি দু ফাঁক হয়ে যায়, কিন্তু যেই বাজনা থামাই, অম্নি একাকার। বাজনা শেষ হলেই আবার নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিছক পশু হলে আমার জীবন হয়ত সার্থক হ'তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিছক পশুও নই, নিছক দেবতাও নই। উভয়ের সংমিশ্রণে হয়েছি মানুষ। তাই আমার এই দুর্দশা। এই সব ভেবে রাগ করা উচিত। কিন্তু চেষ্টা করেও রাগ করতে পারছি না বলেই নিজের উপর রাগ হয়। আবোল তাবোল চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি জানি না।

প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি এক নিয়মে চলে। কিন্তু রাত্রে নিদ্রাটাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

রাত্রে, আগে বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যেত। কিন্তু বাড়ীতে যে দিন কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেল, সেইদিন থেকে কে যেন আমার ঘুম কেড়ে নিল। অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী, অথচ তাঁর জন্য কিছু করতে পারছি না ভাবলেও নিজেকে অপরাধী মনে হয়। রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরের সঙ্গে একবার দেখা হলে এই বিপর্যয়ের সমাধান করতে পারি কিন্তু উপস্থিত দেখা হবার কোন সুযোগ নাই। চিঠি লিখে কোন লাভ নাই। কিন্তু দেখা হবে কবে? আপন মনে কথোপকথোন করি। অবাক হয়ে ভাবি কত দিন আগে থেকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করা হয়েছে। নইলে এই অসম্ভব সম্ভব হোল কি করে? দিল্লী থেকে জুবেদা বেগমের টেলিফোন পেয়ে যদি না দক্ষিণা রায়চৌধুরী জুবেদা বেগম ও পরিবারের অন্যদের দিল্লী থেকে প্রথমে মৈহারে ও পরে কলকাতায় না নিয়ে যেতেন তবে কি বিপদেই না তারা পড়তো। কত দিন আগে এই চামচেদের হঠিয়ে দেবার জন্য বলেছিলাম। চামচেদের তাড়িয়ে দেবে বলেছিলো, কিন্তু সব জেনেও তাদের বাড়ী থেকে বের করে দিলো না কেন? জীবনের বিচিত্র পথ পরিক্রমার খবর যারা রাখে, তাঁরা জানে যে এই সব চামচের দল যখন একবার এসে হাজির হয়, তখন সহজে তাঁরা যায় না, তারা ঠিক সময়েই আসে, আর ঠিক সময়েই তাঁরা বিপর্যয় বাধিয়ে দেয়। চামচারা হোল জাহাজের ইঁদুর। জাহাজ তৈরি হওয়া মাত্রই জোটে আর জাহাজ ভরাডুবির সম্ভাবনা দেখলেই, সর্বপ্রথম পালায়। এঁদের প্রীতি, ঐশ্বর্য্যের রসদে। মালিকের সাথে কদাপি নয়। কিন্তু তারপর? তারপর সমস্ত সত্তা দুমড়োনা নকল যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে একজনের মুক্তির দিন, অন্যের জন্য অবাক হবার পালা। গোপনতার শেষ। চিন্তার এক ছায়া, আর এক ছায়া টানে বোধ হয়। এ না হলে পরের পর এই অলীক ঘটনাগুলো কেন মনে আসে। সময় সব কিছু ভোলায়। তাই সময়ের প্রতীক্ষা ছাড়া করবার কিছুই নাই। স্বপ্নে কত কি অঘটন ঘটে যায়। কত আগুন লাগে, কত কি ছারখার হয়ে যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গলে স্বস্তি। নিমেষে পুনর্জীবন, ঠিক তেমনি যদি হ'তো। কিন্তু না তা হোলো না। এটা স্বপ্ন নয়, এটা বাস্তব। প্রতিটি রাত্রে এই ভেতরটা নিয়ে আমি ক্ষত বিক্ষত। বাইরে হাসছি কিন্তু ভেতরে জ্বলছি। এ কি নিদারুণ অভিশাপ। বাবার এক একটা দিন কি ভাবে যাচ্ছে সে কথা ভেবেই মনে কষ্ট পাচ্ছি। এই ঘটনার পর উদ্বেগ থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, আজ থেকে কিছুদিন পরেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। না বোঝা মানে সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। শেষ পর্যন্ত তা হয়েছিল।

যদিও ছাত্রাবাসে থাকি কিন্তু বাবার কাছে রোজ সকালে এবং সন্ধ্যায় যাই। সকালে চিঠি নিয়ে যাই। পড়ে শোনাই, উত্তর লিখে বাড়ী ফিরবার সময় প্রণাম করলে বলেন, 'সুখে থাক। তোমরা সুখে থাকলেই আমার সুখ।' সন্ধ্যায় যে দিন বাজনা শিখি, প্রণাম করলে বলেন, 'যে আশা নিয়ে এত কষ্ট করে এসেছ, মা সারদা যেন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন।' তারপর বাবা খাবার খেয়ে যেতে বলেন। বাবার কথায় যখন বলি, 'দাই রান্না করে রেখেছে।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলেন, 'আমাদের দেশে কথা আছে, বাড়া ভাত আর সাজা তামাক কখনও ফেলতে নাই। অনিশ্চিতের পেছনে না ছুটে যা পাচ্ছো সেটা গ্রহণ করো। ভাবছ বাড়ীতে

গিয়ে তৈরী খাবার পাবে। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে যদি কারো অঘটন শোনো তা হলে খাওয়া সারারাতের জন্য মাথায় উঠবে। পরের দিন পিত্ত পড়বে। ফলে শরীর পাত হবে। সুতরাং প্রাচীন কালের অনুভবী মনীষির কথা অবহেলা করতে নাই। অতএব বাড়া ভাত অস্বীকার কোরো না। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নাও। জানি না, কি ছাতার খাচ্চ? তোমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে।' মা'কে বললেন, 'যতীনকে খাবার দাও।' অগত্যা খাবার খেয়ে ছাত্রাবাসে যেতে হয়। রাত একদিন সকাল হয়। দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রম নাই। দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কি ভাবে কেটে গেল টের পেলাম না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবার বাড়ী গিয়ে দেখি এক মৌলবি এসেছেন। বাবা বললেন, 'মৌলবি সাহেব, আমার মন বড় অশান্ত, নানা কারণে মনে শান্তি নাই। এ কথা শুনে মৌলবি বললেন,

'রাত যিতনা ভী সংঙ্গীন হোগী
সুবহ উতনি কি রঙ্গীন হোগী
গমন ন কর গৈর হয় বাদল ঘনেরা
কিসকে রোকে রুকা হয় সবেরা।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'বাঃ'। মৌলবিকে বললাম, 'দয়া করে আর একবার বলুন। আমি লিখে নি।' লিখে নিলাম। বাবা বললেন, 'এর মানে বুঝেছ?' বললাম, 'হ্যাঁ।' বাবা বললেন, 'আমাকে বোঝাও।' বাবাকে বললাম, 'রাত্রি যতই ভয়ঙ্কর হোক, সকাল ততই রঙ্গীন হবে। আকাশে কালো মেঘ এলেও ভয় নাই। সকালকে কেউ রুখতে পারবে না। ভোর হবেই।' বাবা আমার কথা শুনে মৌলবিকে আবার কবিতাটা শোনাতে বললেন। মৌলবি বললেন শেরটি। বাবা মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, 'শুভান আল্লা, আপ পীর হ্যায়।' মৌলবিকে বাবা ফল, চাল, ডাল, এবং টাকা দিলেন। মৌলবি চলে যাবার পর সুরশৃঙ্গারে বাবা শুদ্ধ কল্যাণ বাজালেন। বাজনা শেষ হবার পর বললেন, 'শুদ্ধ কল্যাণের মানে কি বল তো?' চুপ করে রইলাম। বাবা নিজের থেকেই বললেন, 'নিজেকে শুদ্ধ কর, তবে কল্যাণ হবে। বড় কঠিন রাগ। অনেকদিন বাজাবার পর এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারা যায়। বাজনা শুনতে যাও, শুনতে শুনতে কান তৈরি হবে। তখন শুনতে ভাল লাগবে। যখন দেখবে শুনতে ভাল লাগছে তখন বুঝতে শুরু করবে। যখন বুঝতে শুরু করবে তখন নেশা ধরে যাবে। যখন নেশা ধরে যাবে, তখনই সঙ্গীত ভালবাসতে শুরু করবে। তারপর সঙ্গীতে প্রবেশ করতে পারবে। গান, বাজনা, রোনা, পিটনা সকলেই করতে পারে কিন্তু সত্যকারের গানা, বাজনা, রোনা, পিটনা কজনে করতে পারে। দরদ পৈদা করে গান বাজনা করলে, চোখে জল আসবে। নিজের প্রিয়জন কেউ মারা গেলে সকলেই কাঁদে কিন্তু গান বা বাজনা বাজিয়ে কতজন কাঁদতে পারে এবং কাঁদাতে পারে। পরমহংসদেব পড়নি? মায়ের কাছে মাথা ঠুকতেন তাঁর কৃপা পাবার জন্য, কামকে জয় করবার জন্য। সেই রকম মা সারদার কাছে মাথা ঠুকে বলতে হবে, কত বড় দুর্ভাগা আমি, তোমার কৃপা পেলাম না। যেদিন কাঁদাতে পরবে সেইদিন বুঝতে সত্য বাজনা হয়েছে। এ জিনিষ একমাত্র আমার মা অন্নপূর্ণার মধ্যে আছে। আলিআকবরের মধ্যেও ছিলো কিন্তু টাকার লোভে অন্য পথে চলে গেছে। নইলে

তার মধ্যেও শক্তি ছিল, লোককে কাঁদাতে পারত।' বাবা চুপ করে গেলেন। বাবার মুখে এই কথা শুনে আমি অবাক। এ সব কথা বাবা কোথায় শিখেছেন? বাবা মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই।

কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় বুঝতে পারিনা, ইতিমধ্যে হাথরস থেকে লল্লার চিঠি পেলাম। লল্লা লিখেছে, 'দক্ষিণে বহু জায়গায় প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। প্রথম বাজনা মাদ্রাজে হবে পনেরোই সেপ্টেম্বার, বাকী সব প্রোগ্রাম ঠিক হলেই জানাব। প্রোগ্রামের তিন দিন আগে, হাথরস থেকে যাত্রা করতে হবে। প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করবে মাদ্রাজের আকাশবাণীর ডিরেক্টর।' এখনও তিন মাস দেরী আছে। আগেও বলেছি, আবার লিখছি বাজনা বাজাবার আদৌ ইচ্ছা নাই। তবে রাত্রে জেগে জেগে যে কষ্ট পাই, তার থেকে উদ্ধার পাব। লল্লাকে লিখে দিলাম, 'ঠিক সময় হাথরস পৌঁছব।' লিখে তো দিলাম যাবো, কিন্তু বাবাকে কি করে বলবো? বাজনার কথা বললে, বাবা চটে গিয়ে বলবেন, 'উস্তাদ হয়ে গিয়েছ। বাজনা ভাল ভাবে না শিখে, বাজান ঠিক নয়, কিন্তু অলক্ষ্যে মা সারদা বোধ হয় হাসছিলেন। তখন কি জানতাম, মৈহার ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ কি অদ্ভুত উপায়ে ঘটে গেল।

সেক্রেটারি অফ এডুক্রেশন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছেন। বিদ্যালয়ের কর্মচারী একবার যে ভুল করেছিল আবার সেই ভুল করেছে। কর্মচারী কশান মানি খরচা করে ফেলেছে। কর্মচারী ভুল করলেও বিপদ আমারই। কশান মানি পুরো করলাম। সেক্রেটারি অফ এডুকেশন কশান মানি দেখলেন। চিন্তায় পড়লাম, কর্মচারি এই রকমের ভুল করলে লোকে ভাববে টাকা আমিই খরচা করেছি। সুতরাং চিন্তা করে কর্মচারিকে বললাম, 'তুমি দরখাস্ত করো বদলীর জন্য, যে হেতু বাড়ী তোমার রেওয়াতে, এবং বৃদ্ধ বাবা, মা ছাড়া কেউ নাই। তাই যদি এ না কর তাহলে আমাকে তোমার ভুলের খেসারত দিতে হবে।' সে আমার পা ধরে কাঁদতে লাগল। সে বলল, 'আমার চাকরি চলে গেলে কি খাবো?' কর্মচারীকে বললাম, 'চাকরি যাবার প্রশ্ন নেই, তবে এটা ঠিক, তোমাকে বিশ্বাস করে মৈহারে রাখব না।' কর্মচারীকে দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে বাবাকে দিয়ে স্বাক্ষর করালাম, দরখাস্তর মধ্যে এডুকেশন মিনিষ্টারকে জানিয়ে লিখলাম, 'বর্ত্তমানে যে কাজ করছে তাঁর জায়গায় অন্য একজন কর্মচারীকে এখানে পাঠান, কেননা এই কর্মচারিকে বারবার রেওয়া যেতে হয়, তাঁর রুগ্ন বাবা মায়ের দেখাশোনার জন্য।' এক সপ্তাহের মধ্যে নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হোল। নতুন কর্মচারীকে বুঝিয়ে বললাম, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে নিয়োগ করিয়েছি। তুমিও যদি কাজ ঠিক না করো এবং কশান মানির হিসেব ঠিক না রাখো, তাহলে তোমার নামে অভিযোগ করতে বাধ্য হব।' নূতন কর্মচারী বলল, 'এমন কাজ কখনো আমি করবো না।' সে সময় কি জানতাম নূতন কর্মচারী আগের থেকেও খরাপ হবে।

যতই কাজের মধ্যে থাকি রাত্রিতে যেন চিন্তা আমাকে পাগল করে দেয়। দুটি চরিত্রের মধ্যে কত তফাৎ। একজনের চরিত্রে যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁর সম্বন্ধে এই কথাই মনে হয়, কথা সবাই বলতে পারে কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে কজন? তাঁর চরিত্রে শব্দটাই মনে হয় ব্রহ্ম। তাই শব্দকে অযথা অপব্যবহারের কলঙ্কিত করতে চাইতেন না। তাই কখনও বেশী কথা বলতে দেখিনি। হ্যাঁ বা না করেই চালিয়ে দেন। ব্যতিক্রম হয় ঘরোয়া পরিবেশে। কিন্তু আর

একজনের চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি অল্পবয়স থেকে বিদেশে ভ্রমণ করে আদব কায়দায় দুরস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম ব্যক্তির চরিত্র ঠিক এঁর বিপরীত। তাঁর মধ্যে কখনও দেখিনি যা অন্যের মধ্যে দেখেছি, যেমন কমারসিয়াল হাসি। এটিকেট এবং ডিসেন্সি বাইরে এত ভাল যে, সকলেই মুগ্ধ হয়ে যায় কিন্তু ভিতরটায় যা রাজনীতি খেলে তা বাইরে প্রকাশ পায় না। জাতে হিন্দু, আচরণে ইংরেজ, ফূর্তিতে ফরাসী, সুবিধাবাদীতে জাপানি, বিষয়বুদ্ধিতে এমেরিকান।

এতদিনে একটা কথা বুঝতে পেরেছি। এখন মনে হয় বেশীর ভাগ তথাকথিত সাকসেসফুল লোকেদের চামচেরা কেন হাঁতে হাঁ করে এবং নাতে না করে। যদিও জানি সাকসেসফুল মানুষ যা বলবে, তার প্রতিবাদ করতে নাই। সেই সব মানুষরা প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না কিন্তু আমি কি করব? আমার কলেজ জীবনে এমন এক দার্শনিকের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, যাঁর কথা ছিল, 'যা সত্য তা বলব', তাঁর উদাহরণ ছিলো, ধার্মিক পাষণ্ডরা গ্যালিলিওকে দিয়ে বলাতে পারে নি, পৃথিবীকে সূর্য পরিক্রমা করছে। গ্যালিলিও মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করেছিলো। সত্যের বিশ্বাসে তাঁকে মহান করে তুলেছিলো। তাতে লোকসান হোক বা সর্বনাশ হোক। আমি দার্শনিকের কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম। এর পর মৈহারে এসে বাবার কাছেও এই শিক্ষাই পেয়েছি। বাবা বলতেন, 'হাজারো অপরাধ করো, সত্য কথা বললেই সাত খুন মাফ। সত্যের নীতি থেকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।' তাই যাঁরা অপ্রিয় সত্য কথা বলে, আমাদের পৃথিবী বোধ হয় তাঁদের এবসোলিউট ট্রুথকে সহ্য করতে পারে না। কনসেনট্রেটেড এর ঝাঁঝ বেশী হয়।

কিছুদিন পরে বিমান ঘোষ-এর একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'রবিশঙ্কর ব্রডকাস্টিং মিনিষ্টার ডাক্তার কেসকারকে বলেছেন, আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিক।' পরে জেনেছি বিমান ঘোষের চাকরি যায় নি। অবাক হই। রবিশঙ্কর পূর্ব পরিকল্পিত হয়ে কি করে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিল? এটা ছিলো লোক দেখান। একদিন বিমান ঘোষ-এর প্রতি অভিযোগ, আবার দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে তাঁর সঙ্গে এক দোলনায় দুজনকে দুলতে দেখেছি কোলকাতায়, এ কি সম্ভব? রাজনীতির ক্ষেত্রে সবই সম্ভব।

ভোর থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কেমন ভবে কেটে যায় বুঝতে পারি না। তারপর শোবার আগে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আকাশ দেখি এবং কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করি। কত কথাই না মনে পড়ে। যে অঘটন ঘটে গেল বাবার জীবনে, তার জন্যই পারিবারিক এক একজনের বিষয়ে, এক একটা কথা মনে পড়ে। যেমন কোন দিন মনে হয়েছে, ক্ষমা করা খুব মহৎ কাজ, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। প্রায় জোর করে একটা টেনিস বল গিলে ফেলবার মতো দুশ্চর সাধনা। মনে হয়েছে ফরগেট এনড ফরগিভ। ফরগিভ কথাটা বলা শক্ত, তবু একটা ইডিওটকে ক্ষমা ছাড়া আর কি করতে পারি। কারণ বাবা বলতেন, 'অবোধ, মূর্খ আর ভ্রূণ, এঁদের হত্যা এক মহাপাতক।' নানা চিন্তা করলেও ঘুরে ফিরে বাবার কথাই মনে পড়ত।

বাবা যদিও ধর্মে মুসলমান ছিলেন কিন্তু মাতৃভাষা ছিলো বাংলা। তাই উর্দ্দু কবিতা খুব প্রয়োগ করতেন না। যদিও খুব মনে ধরলে, বা যত্ন করে বুঝিয়ে দিলে, বাবা একটা দুটো লাইন মনে রাখতেন। একবার অহংকার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ইন কমজর্ফে গুব্বারো কা হাল

দেখো। চন্দ্র শ্বাসো মে ফুল জাতে হঁয় থোড়ি বুলন্দি পর।' অর্থাৎ এই অজ্ঞান বেলুনদের দেখো, কয়েকটা প্রশংসায় ফুলে ফুলে যায়, একটু উঠেই নিজের যথার্থটা ভুলে যায়।

আমি কি পাগল হয়ে যাব? কেন এত ভাবি। কি করব? দীর্ঘ সাত বছর যার কাছে সঙ্গীত সাধনা করলাম, পুত্রস্নেহ পেলাম তাঁর জীবনে যখন শনির গ্রহ চলছে, আমি কি না ভেবে থাকতে পারি। বাবার কাছে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, তাঁর কষ্টে মনে হয়েছে সে কষ্টের ধোঁয়া যেন আমার নাকের মধ্যে গিয়ে দমবন্ধ করে দিচ্ছে। আর এই জন্যই রোজ রাত্রে আমার নিজের মনে এই স্বগোতক্তি হ'তো। ছাত্র জীবনে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, যাঁর শীর্ষক ছিলো, 'দি ক্যারেকটার অফ এ জেন্টেলম্যান।' বিরাট প্রবন্ধ। তাঁর মধ্যে, একটা কথা আমার জীবনে দাগ কেটেছিল যা আজও আমি ভুলি নি। প্রবন্ধটায় ছিলো, ক্যারেকটার একটা ব্যাপক শব্দ। সুরা, নারী নিয়ে কুৎসিত ব্যবহার করলেই কোন মানুষ চরিত্রহীন হয় না। যদি কারোর কাছে কোন কৃতজ্ঞতা কিংবা কোন রকম সাহায্য পাও, কখনও তা ভুলো না। পরের জন্য যদি কিছু করো তা সর্বদা ভুলে যাবে। এই হোল ক্যারেকটার অফ এ জেন্টেলম্যানএর প্রথম কথা। যদিও আজকাল দেখা যায়, কনফেশন নামক বিজাতীয় ধাষ্টামী। বহু তথাকথিত ভদ্রলোক, নিজেদের জীবনের হিমালয় প্রমাণ চরিত্রহীনতাকে, বিন্ধ্যাচলের আকারে বর্ণনা করেন এবং নিজের সততা ও উদারতার বাহবা লোটেন। বাবা বলতেন, 'বজ্জাৎ গিরগিটি।'

মজার কথা বাবা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনদিনই মুখর ছিলেন না। কারণ যে বয়সে লোকে সাহিত্য চর্চা করে, সেই যৌবনের দিনগুলো বাবার বিভিন্ন উস্তাদের কাছে সঙ্গীত শেখার জন্য, তাঁদের গোসল খানার জল ভরতে ভরতে কেটে গিয়েছিলো। যেহেতু আমার কলেজের ডিগ্রি ছিল, বহু অলস মুহূর্তে বাবা আমার কাছে কবিতা শুনবার আশা করতেন। যদিও বাবা প্রচুর মাত্রায় গল্প এবং উপন্যাস পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পড়তেন, তথাপি আমার বিশ্রামের সাথী সঞ্চয়িতার প্রতি বাবার ঝোঁক ছিল। একটা বা দুটো কবিতা পড়লেই বাবা খুশী। বাবা কবিগুরুর দার্শনিক তত্ত্বকে বুঝবার চেষ্টা না করে, নিজের জীবন দিয়ে কবিতা বুঝবার চেষ্টা করতেন। যে দুটো কবিতা বাবাকে সব চেয়ে আকৃষ্ট করত, তার একটী হোল, 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসি, দিন চলে যায়, আমি আনমনে তাঁর আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে।' দ্বিতীয়টা হোল, সোনার তরী, 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, তীরে একা বসে আছি নাহি ভরসা...। বাবা সব কবিতা শোনার পর এই দুটো বিশেষ কবিতা আর একবার পড়তে বলতেন। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই দুটো কবিতা কেন আপনি এত ভালবাসেন?' বলেছিলেন, 'একটা কবিতা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, যে সুরের, নীল আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, ওড়ার অযোগ্যতায় পারি নি। তাই আজও নীল আকাশটা হাতছানি দেয়, আর দ্বিতীয় কবিতাটা শেখায়, নাম থাকে তার কর্মফল সঙ্গে যায়। শরীরটা একটা আধার মাত্র। তাই কখনও দেহ সুখের মধ্যে যেয়ো না। যা করলে সুকর্ম হবে, আর খুদার দরবারে দুয়া পাবে, তাই কোরো।'

আজ শুক্রবার। বাজনা বন্ধ। তাই বিকেলেই ভাবছি পাহাড়ের দিকে সারদা দেবীর দর্শন

করে আসি। আকাশে ঘন কালো মেঘ। বেশ একটা মল্লারের আবহাওয়া। হঠাৎ দেখি চাকর বুদ্ধা আসছে। ভাবলাম, ব্যাপারটা কি? বুদ্ধা বলল, 'কাশী থেকে আপনার মাষ্টারমশায় এসেছেন।' ব্যাপারটা বোধগম্য হোল না। যা হোক পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি, বাবা ঘরের বৈঠকখানায় মাটিতে বসে আছেন, আর সামনে বসে আছেন আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম ভট্টাচার্য। কাশীর অসাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিত পরিবারের প্রতিনিধি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু এবং ইংরেজীর সব্যসাচী। যা পড়েছেন তাই কণ্ঠস্থ। সকালে মৈহার দেবীর দর্শন করে বিকেলে এসেছেন বাবার দর্শন করতে। বাবার স্বভাব, কৌতুকপ্রিয়তা। বাবা বলেছিলেন, 'আপনি তো কাশীর পণ্ডিত, আমার কাছেও কাশীর এক পণ্ডিত আছে, আমার বুড়ো বয়সের ছেলে।' নাম শুনেই মাষ্টারমশায় বললেন, 'ও তো আমার ছাত্র। দু'তিন বছর আগে একবার এসেছিলাম, তখন আপনি প্রবাসে ছিলেন। ও আমাকে আপ্যায়িত করেছিলো।' বাবার তৎক্ষণাৎ জবাব, 'আপনি তাহলেতো বেয়াই। ছাত্র ছেলের দুই পিতা।' যাই হোক আমি গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি বাবার আবদারে মাষ্টার মশায় উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন মেঘদূত। শুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দ মাধুর্য, ভিন্ন কিছু বুঝবার কথা নয়, তথাপি প্রত্যেকটি শ্লোকের পর বাবা বলছেন, 'শুভান আল্লা।' আমার যাওয়াতে মাষ্টারমশাই-এর আবৃত্তি বাধা পেল। গিয়ে মাষ্টারমশায় এবং বাবাকে প্রণাম করলাম। ভাবছিলাম পণ্ডিত মাষ্টারমশায় কি ভাবছেন? কিন্তু মাষ্টারমশায় বলে উঠলেন, 'বা রে যতীন, সংস্কারের মুক্ত ষাঁড় হয়েছিস। বড় ভালো লাগলো।' মাষ্টারমশায় বাবার কাছে অনুরোধ করে বললেন, 'সংস্কৃত কাব্যে 'পূর্বা' রাগের উল্লেখ পেয়েছি। আপনি যদি দয়া করে শোনান।' বাবা এক কথায় রাজী। 'পূর্বা'তে প্রায় একঘণ্টা আলাপ করলেন। আমি জানি না মাষ্টারমশাই-এর কেমন লেগেছিল কিন্তু বেশ কয়েকবার চাদরের খুঁটোয় চোখের আর্দ্রতাকে দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। এবার মাষ্টার মশায়ের ফিরে যাওয়ার পালা। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিন ভোর কি খেয়েছেন?' মাষ্টারমশায় বললেন, 'মায়ের মিষ্টি প্রসাদ।' বাবা বললেন, 'যদি কিছু না মনে করেন আমার গাছের কয়েকটা ফল খান। আপনি খেলে আমি তৃপ্ত হব।' আমি ফল নিয়ে এসে দিলাম। মাষ্টারমশায় খেলেন। আবার নূতন করে বিশ্বাস করলাম, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান দেশকাল জাতির উর্দ্ধে। মাষ্টারমশায় যাবার পর বাবা বললেন, 'খেয়ে যাবে।' বললাম 'দাই রান্না করে দিয়েছে।' বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'হাঁ হাঁ, মা এবং দাই-এর ফারাক তো বোঝো না।' এ কথার পর আর কথা চলে না। কিন্তু আমার রান্না করা আছে বলার কারণটা অন্য ছিল। বাড়ীতে সে সময় কম লোক। মাপা রান্না খাবেন বাবা, মা এবং চাকর বুদ্ধা। আমি পাত পাড়লে কারো খাবারে ভাগ বসাতে হবে। বাবা ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন। বললেন, 'নিজের ছেলেই যখন চিন্তা করে না, তুমি অত চিন্তা কোরো না। বাবা মায়ের কোল কত বড়, আগে বাবা হও তখন বুঝবে।' বাবার কথা শুনে মনে হোল, অনেকে বাবা হবার পরেও সত্যটা বোঝে না। রাত্রে ষ্টেশনে গিয়ে মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে অনেক কথা হোল। গাড়ীতে বসিয়ে ছাত্রাবাসে চলে এলাম। বহুদিন পরে মনে আজ শান্তি পেলাম।

বাড়ীতে ফিরেই দেখি দ্যুতি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই দ্যুতি বলল,

'মুক্তাগাছায় যাবার জন্য আমার বাবা কোলকাতায় যেতে বলেছেন। মুক্তাগাছায় বর্ত্তমানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য মুক্তাগাছায় গিয়ে যতটা পারা যায় সব নিয়ে কোলকাতায় চলে আসতে হবে। পাকিস্তান হবার পরেও আমার বাবা ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে থাকা আর সম্ভব নয়। আগামী কাল কোলকাতায় যাব।' বাংলায় একটা কথা আছে, ভূতে পাওয়া। আমরাও দেখেছি তাই হয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘড়ি ধরে কাজ হয়। তাঁর পরই আমায় ভূতে পায়। কত হিজিবিজি কথা মনে আসে, কেন এরকম হোল। পূর্বকল্পিত ভাবে এই অভিনয়ের কি দরকার ছিলো? চোখের সামনে এক একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার ভাবলো না এত বড় অবিশ্বাস্য ঘটনা যতই সত্যের রূপ দিক না কেন, কেউ বিশ্বাস করবে না। বাড়ী ভর্তি লোক, হাওয়ায় হয়ত দরজা দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ নয়। অথচ চামচেরা বললো দরজা বন্ধ। আসলে চামচেরা বাইরে থেকে দরজা টেনে ধরেছে। দরজা পিটছে। দরজা খুলে গেল। মানুষের জীবনে বোধ হয় এমনি করেই অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে, যার জন্য সে দায়ী নয়। অথচ সারাজীবন এই মিথ্যের দায় বহন করতে হয়েছে। কিন্তু হয়ত এই-ই হয়। এমনি ভুল বোঝাবুঝির বোঝা মাথায় নিয়ে মানুষকে সংসারের পথে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে সেই রাত্রে অন্নপূর্ণা দেবীকে জড়িয়ে অমন কলঙ্ক রটল কেন? কে তার জন্য দায়ী? একবার মনে হয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করলেন না কেন? কিন্তু না, এতবড় মিথ্যেটার প্রতিবাদ করা অন্যায়, যেন প্রতিবাদ করলে মিথ্যাটারই মর্যাদা দেওয়া হয়। জীবনে অনেক মিথ্যার মুখোমুখি হয়েও তো অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিবাদ করেন নি। সুতরাং আজই বা প্রতিবাদ করবেন কেন? প্রতিবাদ না করায় পণ্ডিতও অবাক হয়েছে। ভেবেছে তাঁর চালাকি কেউ ধরতে পারবে না। এমনি করেই প্রত্যেকের জীবন, গড়িয়ে গড়িয়ে একদিন মহাজীবনে গিয়ে তা ঠেকে, সব মানুষই এগিয়ে চলে। এমনি করেই পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে আবার হয়ত একদিন কখন আপনার গতিপথকে অস্বীকার করে উল্কা হয়ে অন্য পথে মোড় ফেরে। তখন হয় বিপ্লব। নিজের কৃতকর্মের জন্য কাঁদতে হয়। যা পণ্ডিত স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই হোল। যাঁর জন্য নিজের অন্যায়ের জন্য কাঁদতে হয়েছিল। সব মানুষের জীবনেই অন্ততঃ একটা বয়স আসে যখন সে নিজেকে নিয়ে বড়ো বিব্রত হয়। তখন আর কারোর কথা তার মনে পড়ে না। তখন আর কারোর কথা সে ভাবে না। পণ্ডিতেরও তাই হয়েছিলো। কিন্তু পরে? সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী। আমার কিন্তু বার বার একটা কথাই মনে হয়েছে, নিশ্চেষ্ট হয়ে মর্চে পড়ার চেয়ে সংঘাতের পথে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফুরিয়ে যাওয়াই অনেক ভাল।

রাত একদিন সকাল হয়। আবার সকালও গড়িয়ে গড়িয়ে এক সময় রাতের অন্ধকারে বিলীন হয়। পরের দিন সকাল হয়। মৈহারেও এর ব্যতিক্রম নাই। রোজ সকালে বাবার কাছে চিঠি নিয়ে যাই। বাবাকে পড়ে শোনাই এবং তাঁর উত্তর লিখে ফিরে আসি ছাত্রাবাসে। চিঠি নিয়ে বাবার বাড়ীতে ঢুকতেই দেখলাম, বাবা বুদ্ধাকে বলছেন, 'লাহোল বিলা কুবত।' কখনও বাবা সংক্ষেপে বলেন, লাহোল বিলা। কামচোর বলে ধমকাচ্ছেন বুদ্ধাকে। বাবা আমাকে দেখেই বুদ্ধাকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখ এতবড় কামচোর, গাছে একটুও জল দেয়

না। সব ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে।' বুঝলাম, আজ বাবার মেজাজ সপ্তমে। ফুল বাবার প্রাণ। রোজ সকালে ফুল উঠিয়ে নিজের ঘরে সারদা দেবীর চরণে দেন। সেই ফুল যদি শুকিয়ে যায় রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমার হাতে চিঠি দেখে বললেন, 'কার চিঠি?' বললাম, 'খুলে তো দেখিনি।' চিঠি খুলে পড়ে শোনালাম। আমার সঙ্গে বাবা নিজের ঘরে গেলেন। মা তামাক সেজে দিয়ে গেলেন। চিঠির জবাব লিখতে গিয়ে অবাক হলাম, লেটার প্যাডটা দেখে। বাবা নূতন চারটে প্যাড কিনে এনেছেন। চিঠির উত্তর লিখলাম। প্যাডের প্রত্যেক পাতার একটা লাইন বারবার কাটতে লাগলাম। বারবার গোলাপ ফুলের একটা জায়গা বারবার কাটতে দেখে, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাটছ কেন?' বাবাকে বললাম, 'আপনার নামে একটা প্যাড ছাপলে ভাল হয়।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'কেন কেন? আমি কি জজ?' এ কথা শুনে বাবাকে বাধ্য হয়ে বললাম, 'এবারের চিঠির প্যাডটা ভালো নয়। এই কাগজে চিঠি লেখা আপনাকে মানায় না।' বাবা ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝেছেন। বললেন, 'কি কাটছিলে বারবার?' বললাম, ইংরেজিতে লেখা আছে 'কিস মি নট।' বাংলা তর্জমা শুনেই বাবা বললেন, 'লাহোল বিলা।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে টাকা দিয়ে বললেন, 'পাঁচটা চিঠি লেখার খাতা কিনে আনো যার মধ্যে এসব লেখা থাকবে না।' বাবাকে বললাম, 'টাকা দিতে হবে না। এই পাঁচটা প্যাড ফেরৎ দিয়ে পাঁচটা অন্য প্যাড আনছি।' মৈহারে আসা অবধি দেখেছি বাবা একসঙ্গে পোষ্টকার্ড, খাম, এবং লেটার প্যাড প্রচুর পরিমাণে কিনে রাখতেন। বাবা বরাবর নীল এবং সাদা লেটার প্যাড কিনতেন। বাবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাঁচটা নীল রং এর লেটার প্যাড কিনে নিয়ে যখন বাড়ী যাচ্ছি, আচমকা বাবা বললেন, 'আজকাল শিখতে আসো না কেন? কয়েকটা নূতন রাগ মায়ের কৃপায় তৈরি হয়েছে, শিখে রাখো। এই রাগ শিখে বাইরে প্রচার করবে। এখন ত সকলে উস্তাদ হয়ে গিয়েছে। নিজেরাই রাগ তৈরি করছে। নিজে যে রাগ তৈরি করবে, তা রেখে যাবে তোমার শিষ্যদের জন্য। তাঁরা সেগুলো বাজিয়ে তোমার নাম স্মরণীয় করে রাখবে। আগে সব রাগ শেখো তারপর নিজে রাগ তৈরি করবে।' বুঝলাম বাবা কাদের উপর কটাক্ষপাত করলেন। রাত্রে বাবার কাছে শিখতে গেলাম। বাবা বললেন, 'আমি মুসলমানও হতে পারলাম না আবার হিন্দুও হতে পারলাম না। হয়েছি একটা অপদার্থ। যদিও আমি মুসলমান, কিন্তু এ যাবৎ যত রাগ তৈরি করেছি, সব হিন্দু নাম দিয়ে। এবারে মুসলমানি নাম দিয়ে একটা রাগ করেছি, নিজের ভাইপো মোবারকের অনুরোধে, রাগটির নাম মোহম্মদ। এই রাগ সকালের। আজ শেখো কিন্তু কাল সকালেও যন্ত্র নিয়ে এসো। সকালের রাগ রাত্রে শেখাব না। অন্য তৈরি রাগ তো সবই শিখিয়েছি। মুহম্মদ রাগটা আল্লা করিয়ে দিয়েছে।' পরের দিন চিঠি নিয়ে যাবার সময়, বহুদিন পর সকালে শিখতে গেলাম। মোহম্মদ রাগে একটা গানও রচনা করেছেন। বাবা প্রথমে গানটি গাইলেন। রাগটির স্থায়ী ঃ—

ঈদ মুবারক গাইয়ে ইসলামী
খুদা কে বন্দে মুহম্মদ।
অন্তরা

অরস কুরসে জমিন আসমান
সব হি পুকারত আল্লাহো আকবর।

আজ জীবনে বাবা প্রথম গান করেছেন আল্লার নামে। এ যাবৎ বাবা সব রচনাই মাতা সারদা দেবীর নামেই করেছেন। এই রাগটির সম্বন্ধে আলোচনা যথাস্থানেই করবো। বাবার চরিত্রে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হোল, বাবা কোন মুসলমানকে শিষ্য করেন নি। বাঙ্গালী মুসলমান, যাঁরা নিজের ভাইপো তাঁদের শিখিয়েছেন। বাবা মুসলমান তবলা বাদককেও পছন্দ করতেন না। হিন্দু তবলা বাদককেই বেশী পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ মুসলমান তবলা বাদক যতই ভালো হোক না কেন, পছন্দ করতেন না যেহেতু তারা মদ খেত। এই মদের গন্ধ পেলেই বাবার মেজাজ প্রথম থেকেই গরম হয়ে যেত। এ আমি নিজেও দেখেছি মৈহারে আসবার আগে এবং পরে বহু ঘটনা শুনেছি। মাঝে মাঝে ভাবতাম বাবা কি তাহলে উর্দুভাষী মুসলমান বিদ্বেষী বা এর পেছনে কি বাঙ্গালী হিন্দু প্রীতি কাজ করছে? পরবর্ত্তীকালে যখন বাবার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছি, তখন দেখেছি বাবা রক্তেতে ভিজে মাটির শিশির খুঁজতেন। সেখানে আমিষ উষ্ণ রক্তের স্থান নেই। বাবার অবস্থাটা কাজী নজরুলের মতন। বাবার বাজনা, তাঁর ভাষা যদি কেউ পড়তে পারত, তাহলে বোঝা সম্ভবপর হতো, বাবার এককালের বাজনা আর কাজী সাহেবের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটা যেন একই অভিব্যঞ্জনা, বৃন্তের দুটী কুসুম।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে যায় নানা কাজে। সকালে বাবার চিঠি নিয়ে পড়ে শোনাই, উত্তর লিখি, তারপর সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে আসবার কিছু পরে, ডেভিড, রবীন, দ্যুতি এবং ইন্দ্রনীলকে শেখাই। এর পর নিজে বাজিয়ে, শেষকালে রাত্রি এলেই আমার আতঙ্ক হ'তো। মনে পড়ে গোড়ার দিকের একটী ঘটনা। তখনও ঠিক ধাতস্থ হয়ে উঠিনি মৈহার আবহাওয়ার সঙ্গে। একদিন রাত্রে বাবার বকাবকির ফলে ঘুম হোল না। খাটের উপর বসেছিলাম। কি করে যে বাবার অনুভূতি হোল তা আজও বুঝি নি। বাবা আমার ঘরে এসে বললেন, দেখ নিজের কথা, প্রথম পুরুষের চিন্তা করলে, চিন্তাই চিতা হয়ে দগ্ধ করে। আর প্রথম পুরুষ আর মধ্যম পুরুষের কথা চিন্তা করলে বাড়ে মাৎসর্য। তাই যদি চিন্তা, শুধুমাত্র উত্তম পুরুষের করা হয়, তাহলে মঙ্গল ঘটে।' আজ ছয় বছর পরেও কথাগুলো ভাবি। কিন্তু অর্থবোধ হয় না। বাবা বলতেন 'চিন্তাগ্রস্ত রুগীর কাছে অন্ধকারটা জলাতঙ্ক রুগীর কাছে জলের ম'তো। নিজের প্রতিচ্ছবিতেই আঁতকে ওঠে। একদিন ভুল ভাঙ্গে, তখন কিছু আর করার থাকে না। খরচের খাতায় শুধু দাগ পড়ে। এখানে সবাই হারিয়ে যায়। জীবনের অঙ্কগুলো মেলে না। ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে চলছে ওরা সবাই। তবু বাঁচতে হয়। বাঁচার অভিনয় করে তাঁরা। আজকাল সব ক্ষেত্রেই এই রাজনীতি বাঁদরামি।' আজকাল বাবা প্রায়ই বলেন, 'এখন তো বুঝতে পারছ না, এখানে রয়েছ কিন্তু যে দিন বাইরে যাবে তখন দেখবে সঙ্গীতের ভিতর কত ল্যাঙ মারামারি। কেবল পারটি, পারটি, পারটি।' মৈহারে আসবার আগে যতটা দেখেছি, বাবাকে দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে। কেননা অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনযাত্রা এবং অর্থ লিপ্সা বাবার থেকে কত তফাৎ। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে যায় বুঝি না।

একদিন রাত্রে গুলগুলজীর কাছে এক অদ্ভুত কথা শুনলাম। স্বাধীনতার পূর্বে মৈহারের

মহারাজের সময় নিয়ম ছিল, যে কোন রাজদরবারে সঙ্গীতজ্ঞ বা বাঈজী, কিংবা যে কোন মিরাশি গায়ক বা বাদকই আসুন না কেন, প্রথমে বাবা শুনে উপযুক্ত ভাবলেই, তাঁরা মহারাজের কাছে শোনাবার অনুমতি পাবে। এঁর জন্য যে গায়ক গায়িকা গাইবেন, নৃত্য করবেন বা বাজাবেন, তাঁদের কাছে সেই যুগে নিয়ম ছিলো, গায়ক বা বাদকের শতকরা তিরিশ টাকা রাজ দরবারের গায়ক বা বাদকের প্রাপ্য হ'তো। অথচ আশ্চর্য, বাবা কখনও কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও নেন নি। যত খারাপই গায়ক, গায়িকা হোক না কেন, মহারাজের কাছে হাজির করতেন, যাতে তাঁরা কিছু অর্থ পায়। মহারাজ মাঝে মাঝে বললেন, 'বাবা, এ কি গান?' উত্তরে বাবা বলতেন 'যতই হোক নাদ সাধনা তো করেছে। এঁরা ভগবানের পূজা করছে। সুতরাং আমি কখনও এঁদের নিরাশ করতে পারি না।' এ গল্প শুনে মনে হোল বাবার কি নিরভিমানী চরিত্র। অথচ আমার দেখা আছে, কিছু পয়সার জন্য সঙ্গীতজ্ঞরা কত নীচে নামতে পারেন। তাই বোধ হয় বাবাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি, 'অভাবকে ভাল বলি না কিন্তু অভাবের কষ্টকে সহ্য করার লড়াইকে ভাল বলি।'

তিন চারদিন পরে স্বাধীনতা দিবসে বাবাকে রেওয়া যেতে হবে ব্যাণ্ড পারটি নিয়ে। বিদ্যালয়ে বাবা বললেন, 'আগামী কাল সকালে যন্ত্র নিয়ে আসবে।' পরের দিন সকালে যন্ত্র নিয়ে গেলাম। বাবা বললেন, 'স্বাধীনতা দিবস আসছে ভেবে, দুটো রাগ মা সারদা তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।' বাবার মধ্যে আমিত্ব ভাব ছিলো না, যা প্রায়শই লোকের মধ্যে দেখি। বাবা বললেন, 'একটী রাগের নাম গান্ধী এবং অপরটির নাম গান্ধী বিলাবল' বাবা শেখালেন দুটী রাগই, সত্যই বাবার মত এমন স্রষ্টা দেখি নি। সংসারের মধ্যে থেকেও, সংসার থেকে বহু দূর, নইলে এইরূপ মানসিক পরিস্থিতিতে রাগ তৈরি করেন কি করে? বরাবরই দেখেছি, যতই মানসিক বিপর্যয় আসুক না কেন সর্বদাই কিছু না কিছু করছেন। একদিক দিয়ে যদিও বলা যায়, এই বয়সে ঘোর সংসারী, আবার সংসারে থেকে নিরাসক্ত সমান ভাবে দেখা যায়।

একদিন বাবার কাছে একটী ঝি এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা, আমার স্বামী অতি বড় চরিত্রহীন, প্রায় রাত কাটায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে, মদ খায় এবং আমাকে মারে। আপনি যদি দয়া করে আপনার এখানে থাকতে দেন, তাহলে সব কাজ করব এবং আপনার এবং মায়ের সেবা করব। আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে আসব।' বাবা ঝিয়ের কান্না দেখে বললেন, 'বেটি আমি আর কতদিন বাঁচব জানি না। যদি আমি মরে যাই, তাহলে তোমাকে কে দেখবে? এক কাজ কর, তোমার স্বামীকে ডেকে আনো আমার কাছে। আমি তোমার স্বামীকে বুঝিয়ে বলব তোমাকে যাতে না মারে।' ঝি এ কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার স্বামী যদি জানে আপনার কাছে এসে বলেছি তাহলে আরও মারবে।' বাবা বললেন, 'তোমার স্বামী কি করে?' ঝি বলল, 'টাঙ্গা চালায়।' বাবা চিনতে পারলেন, কেননা মৈহারে এখন দুটি টাঙ্গাওয়ালাই আছে। বাবা আমায় ডেকে বললেন, 'আমার নাম করে এই মেয়েটির স্বামীকে ডেকে আনো তো।' আমি মেয়েটির স্বামীকে ডেকে আনলাম। বাবা ডাকছেন শুনেই তো তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়। বাবা তাঁকে বললেন, 'এমন ঘরের লক্ষ্মীকে চিনতে পারো না? এ আমার মেয়ের ম'তো। যদি এর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার

করো শুনতে পাই, তাহলে দারোগাকে দিয়ে তোমাকে জেলে ভরে দেব।' বাবার কথা শুনে, ভয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বউকে নিয়ে চলে গেল। বাবা বললেন, 'প্রায় এ সব অভাগী মেয়েরা ঠাকুরের এখানে পূজা দেয় এবং জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে মাদুলী নেয় বা রত্ন ধারণ করে। আরে বাবা, তাতে কি কোন লাভ হয়।' বাবার কাছে বরাবর দেখেছি মেয়েদের মা এবং বেটি বলে সম্বোধন করতে। এও বাবার মহান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

রেওয়াতে গেলে বাবা কখনও খেতেন না। পারটির মধ্যে বাবাকে খেতে বললে বলতেন, 'আমি হলাম বাঙ্গালী। ডাল ভাত আড়াই হাত। এই সাহেব সুবো খাওয়া আমি পছন্দ করি না।' বাবা কেবল ফল এবং দুধ খেয়ে চলে আসতেন। তবে ব্যাণ্ডের ছেলেদের বলতেন, 'খুব ভরো। যত পারো খাও।' বাড়ীতে এসে জল খেয়ে গড়গড়া টানতে টানতে বলতেন, 'নিজের যেমন বাড়ীই হোক না কেন, তার থেকে আনন্দ কোথাও পাই না।' এইকথা বাবার কাছে বরাবর শুনেছি, বাইরে থেকে বাজিয়ে মৈহার আসার পর।

পরের দিন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সলামৎ খাঁ বাবাকে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, 'যদি দয়া করে একে একটু সরোদ শেখান তাহলে ছেলেটির একটা গতি হবে।' এ কথা শুনে বাবা সলামৎ খাঁকে বললেন, 'আপনার মামা অহমদ আলি খাঁ সাহেবের দয়াতেই, সরোদ শিখেছি, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমার শেখাবার শক্তি নাই। যতীনের কাছে শিখবে।' আমি পড়লাম বিপদে। বললেন, 'তোমার সরোদের ছাত্রদের সঙ্গে এই ছেলেটিকে একটু শিখিও কেননা যতই হোক সলামৎ খাঁ আমার গুরুর ভাগনে।' সলামৎ খাঁ খুসী হলেন, আর আমি ভাবলাম, আর এক বিপদ আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি কি সকলকে শেখাবার জন্য মৈহারে এসেছি। মনে মনে স্থির করেছি, মৈহার ছেড়ে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাব, তাই ডেভিডকে বললাম, 'আমার অবর্ত্তমানে এই ছেলেটিকে দেখো।' যা হোক সেই দিন থেকেই ছেলেটিকে শেখাতে আরম্ভ করলাম।

বাবাকে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে বাবার যে কি হচ্ছে বুঝতে পারি, যখন দু বেলা বাবার বাড়ীতে যাই। বাবার কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একদিন বাবাকে হাতজোড় করে বললাম, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। একটা মিথ্যা ঢাকতে গেলে একটা মিথ্যা এসে পড়ে। তারপর আর একটা মিথ্যার পাহাড় জমে ওঠে ক্রমশঃ। মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো যায় না, একদিন না একদিন অনিবার্য ভাবেই যা সত্য, তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।' হঠাৎ আমার কথা শুনে বাবা ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'জ্ঞানতঃ কখনও কাউর কোন অনিষ্ট করি নি। আমার কপালে এও ছিল দেখবার জন্য। এর আগে আমার মৃত্যু হোল না কেন? সবই খুদার মরজি। যে যেমন করেছে, খুদা তার প্রতি সেই ব্যবহারই করবে।'

এখন আমার কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এতদিন বাবার আশ্রয়ে রয়েছি। কিছুদিনের মধ্যেই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। ভবিষ্যৎ, আমার এখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের হাতে, দেখি কি হয়? রোজই ভাবি, কি করে বাবাকে বলব তিনমাসের জন্য আমি মৈহারের বাইরে যেতে চাই। জানি বাবা কখনই আমাকে যেতে দেবেন না অথচ আমাকে যেতেই হবে। আমার কাছে এখন কঠিন পরীক্ষা।

ইত্যবসরে এই সময়ে একদিন সকালে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলাম। ডেভিডকে দিয়ে বাবার কাছে খবর পাঠালাম, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যাব না। আমার জ্বরের খবর শুনেই বাবা পোষ্ট অফিস থেকে নিজের চিঠি নিয়ে আমার কাছে এলেন। বাবাকে দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠলাম। বললাম, 'বাবা আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। ম্যালেরিয়া জ্বর একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।' জানি অসুখ হলেই বাবা বিচলিত হয়ে পড়েন। বাবার সঙ্গেই গেলাম হাসপাতালে। ডাক্তার ওষুধ দিলো। ডাক্তার বললেন, 'দুইদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।' এ কথা শুনেই বাবা বললেন, 'বাড়ী চল, এখানে তোমায় কে দেখবে?' বললাম, 'অযথা চিন্তার কিছুই নাই। একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে এবং আগামীকাল বিদ্যালয়ে যাব।' বাবার চিঠিগুলো পড়ে শোনালাম। বললাম, 'আজ চিঠির উত্তর লিখে রাখব। আপনি ডেভিডের হাতে খাম এবং লেটার প্যাড পাঠিয়ে দেবেন।' বাবা আমার কথা নাকচ করে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠি লেখার দরকার নাই।' আমি তো বাবার মেজাজ জানি, তাই ডেভিডকে জোর করে সঙ্গে পাঠালাম। চিঠির উত্তরও লিখে দিলাম।

৪৪

আমার এখন বিশ্রামের দরকার। কিন্তু কি করে বিশ্রাম নেব। সকাল থেকে রাত অবধি ঘানির বলদের মত ঘুরছি। সেই সময় স্বপ্নেও কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে বিধাতা অলক্ষে আমাকে বিশ্রাম দেবার কল্পনা করেছিলেন। এ না হলে আচমকা এ ধরনের ঘটনা ঘটলো কেন? পাঁচদিনের মধ্যে কত বিপর্যয় ঘটে গেল। ঘটলোও সেই অমোঘ বিপর্যয়। সত্যই তো মানুষের জীবনের কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে। মানুষের মন যে কত বিচিত্র পথে আনাগোনা করে তার হিসাব একমাত্র বিধাতাই জানতে পারে। পৃথিবীর যত রকমের মানুষ, তত রকমের চরিত্র। শরীর খারাপের জন্য ভেবেছিলাম, দুই দিন পরে বিদ্যালয়ে যাব। কিন্তু শরীর যদিও দুর্বল ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য, তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিনেই বিদ্যালয়ে গেলাম। বিদ্যালয়ে গিয়েই দেখি, টেলিগ্রাম এলো সেক্রেটারী অফ এডুকেশনের কাছ থেকে। আগামীকাল বিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্য আসছেন। বাবা আমাকে দেখে বললেন, 'আরে আরে, তোমার শরীর খারাপ, তা সত্ত্বেও এসেছ কেন?' বাবাকে বললাম, 'শরীর ঠিকই আছে। আপনি চিন্তা করবেন না।' কর্মচারীকে বললাম, 'কসান মানি ঠিক আছে তো?' কর্মচারী সম্মতি জানাল। চিঠিপত্রের ফাইলটা আনতে বললাম কর্মচারীকে। ফাইলগুলি দিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

সেক্রেটারি অফ এডুকেশন আসছেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে সুতরাং সব জিনিষ ঠিক আছে কিনা দেখা প্রয়োজন। একটী ফাইলে যে সব চিঠি আসে সেগুলো রাখা হয়। চিঠির উত্তরের প্রতিলিপি অপর একটী ফাইলে রাখা হয়। আমার অবর্ত্তমানে দেখলাম, দুই তিনটি চিঠি এসেছে। একটী চিঠি তাৎপর্যপূর্ণ। ডাইরেকটার অফ এডুকেশন লিখেছে, বিদ্যালয়ের জন্য যদি কোন জিনিষ প্রয়োজন হয় জানাতে। বাবা নিজের ঘরে বসে আছেন। বাবার টেবিলের উপর প্রান্তে বসে চিঠি দেখে বললাম, 'এই চিঠির উত্তর দেওয়া হয়েছে?' কর্মচারী বলল, 'বাবা বলেছেন আপনি এলে, এ চিঠির জবাব দেওয়া হবে আপনার সঙ্গে

পরামর্শ করবার পর।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'কোন জিনিষের দরকার আছে কি?' বাবাকে বললাম, 'সঙ্গীতের নাম মাত্র কয়েকটি পুস্তক আনা হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্য সঙ্গীতের পুস্তক থাকা দরকার। সঙ্গীতের মাসিক পত্রিকা দেখে, প্রথমে নাম মাত্র বই আনিয়ে ছিলাম। এবারে বেশি পরিমাণে বই আনিয়ে সঙ্গীতের লাইব্রেরি তৈরি করা দরকার। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে বই-এর দাম দেখে এই প্রস্তাবটা লিখতে পারি।' বাবা খুশী হলেন। বললেন, 'ঠিক, ঠিক, ছাত্রদেরও পড়া উচিৎ। সব ভেবে চিঠি লিখে দাও।' এঁর পর চিঠির উত্তর কি দেওয়া হয়েছে ফাইলটা দেখলাম। আমি প্রতিটি চিঠি ইংরেজিতে লিখি, কিন্তু কর্মচারী হিন্দিতে লেখে। বাবার একটা আবেদন পত্র আমাকে আকৃষ্ট করলো। বাবা সেক্রেটারি অফ এডুকেশনকে লিখেছেন, 'কর্মচারী তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয়ের কমপাউণ্ডে ছোট ঘরে থাকে। কর্মচারীর ওই ঘরে কষ্ট হয়। সুতরাং তিনশত টাকা মঞ্জুর করলে সেই ঘরটিকে সামান্য রং করা যায়। এ ছাড়া কর্মচারী ছাপোষা মানুষ। যে সামান্য মাইনে পায় তাতে চলে না। বিদ্যালয়ের চিঠিপত্র এবং নানা জিনিষের তদারকি করে। সেইজন্য কর্মচারীর মাহিনা পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলে সুরাহা হবে।' চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। কর্মচারী নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের একটি কোণের ঘরে থাকবে, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি প্রথমে সমর্থন করেন নি। উত্তরে বাবা বলেছিলেন, 'রাত্রে পাহারা দেবার জন্য কর্মচারী থাকলে বিদ্যালয়ের জন্য ভাল।' বাবার মুখের উপর শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি আপত্তি করে নি। মাইনে বাড়াবার জন্য যে আবেদন করেছেন সেটা আমার কাছে বিস্ময়। ডুপ্লিকেট চিঠিটা দেখলাম ফাইলের মধ্যে ভরা হয় নি। চিঠিটা পড়ে বাবাকে বললাম, 'কর্মচারীর জন্য যে আবেদন আপনি করেছেন তা মঞ্জুর হবে না। এর ফলে আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে।' আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আমি সরকারকে কর্মচারীর সম্বন্ধে কোন আবেদন তো করি নি। চিঠিতে কি লেখা আছে?' চিঠির বিষয় বস্তু জানালাম। আমার কথা শুনে বাবা আকাশ থেকে পড়লেন মনে হোল। বাবা বললেন, 'আমি তো এ ধরনের আবেদন করি নি। কিসের ছোট ঘর? ভাড়া দিতে হয় না, তারপর মাইনে বাড়ানর জন্য আমি কেন সরকারকে লিখব?' বাবার কথা শুনে কর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'বাবাকে এই আবেদন পত্রটা পড়িয়ে, মানে বুঝিয়ে সই করিয়েছো?' কর্মচারী চোরের দায়ে ধরা পড়ে বলল, 'আমি তো আপনাকে এ সম্বন্ধে আগে অনুরোধ করেছিলাম। আপনিই তো বাবাকে বলে সই করে, অনেক আগেই পাঠিয়েছেন।' চিঠির তারিখ দেখলাম সাতদিন আগের, অর্থাৎ যে সময় আমি বিদ্যালয়ে ছিলাম। বুঝলাম, কর্মচারী আমার অনুপস্থিতিতে চিঠিটায় আগের তারিখ বসিয়ে দিয়ে ফাইলে চিঠির নকল রেখে দিয়েছে। ঘটনাটা অত্যন্ত গর্হিত এবং অপরাধমূলক। গম্ভীর ভাবে বললাম, 'যদি চিঠিটা আমি লিখে থাকি, তাহলে তোমাকে দিয়ে হিন্দিতে লেখাব কেন? আমি সব চিঠি ইংরেজিতে লিখি। এ ছাড়া এক সপ্তাহ আগের চিঠি ফাইলে পিন করা হয় নি কেন?'

আসলে কর্মচারী ভাবতে পারেনি যে আমি এত তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়ে চলে আসব। ভেবেছিল, তিন চারদিন পরে আসব সুতরাং সময়মত তারিখ হিসাবে ফাইলে পিন করে

রাখবে। কর্মচারীর এই জঘন্য মনোবৃত্তি, এবং একের পর এক মিথ্যা কথা শুনে বললাম, 'আমি যদি বিদ্যালয়ে না আসি, তাহলে নিজের স্বার্থে বাবাকে দিয়ে তো অনেক কিছু লিখে সই করাতে পারো। সেক্রেটারী অফ এডুকেশন আগামী কাল আসছেন। এ চিঠি বাবা লেখেনি জানতে পারলে তোমার চাকরি চলে যাবে, এ কথা কখনও ভেবেছ? একে অন্যায় করেছ এবং পরের পর মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ।' বাবা নির্বিকার হয়ে আমাদের কথা শুনছেন। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'মিথ্যাবাদী। অন্যায় করে বাবার কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছ।' আমার কথা শুনে ক্লার্ক হাউমাউ করে কেঁদে, বাবার পা দুটী ধরে বলল, 'বাবা এ কাজ আমি করি নি।' কর্মচারীর কান্না দেখে বাবা ভাবলেন, আমি নিজে যা ভাবি, তাই লিখে বাবাকে দিয়ে সই করাই। তাঁর মানে বাবাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরিনা। বাবাকে অগ্রাহ্য করি। বাবা এ যাবৎ কোন কথাই বলেন নি। কর্মচারীর কান্নায় দ্রব হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, 'তুমিও এমনি? সত্যই দেখছি তুমিই হলে বাইস প্রিন্সিপাল। আমাকে না বলে, না জানি কত কিছু করেছো?' বাবার কথা শুনে রাগ সংযত করে বললাম, 'এই দীর্ঘ সাতবছর আমাকে দেখে এই মনোভাব কি করে হোল আপনার?' বাবাকে একবার সব পরিস্থিতিটা বোঝালাম। এবারে বাবার গলার আওয়াজ হঠাৎ তার সপ্তক থেকে মন্দ্র সপ্তকে চলে এল। বাবা বললেন, 'যা ইচ্ছা করো, আমার আর দরকার কী?' এই কথা বলেই বাবা বাড়ী চলে গেলেন। বাবা চলে যেতেই আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'তোমার মিথ্যার জন্য যদি একটী চড় মারি, তাহলে তোমার সম্মান বেড়ে যাবে। তাই তোমাকে মারলাম না। তোমার মিথ্যার জন্য তৈরি হয়ে থাক। তোমাকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করব।' এতক্ষণ দীর্ঘ বচসার ফলে যে পরিস্থিতির উদয় হোল, যার ফলে আমার দুর্বল শরীর আরো দুর্বল হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে লাগলো। আমার সরোদের ছাত্রদের বললাম, 'আমার শরীর ভাল নাই। তোমরা বাজাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি।' বাড়ী গিয়েই মনস্থির করলাম, বাবার এই যে মনে হয়েছে, না জানিয়ে সই করিয়েছি, এ কথা মন থেকে যেতে সময় লাগবে। এ ছাড়া, এতদিন পরেও সেই পুরানো বাইস প্রিন্সিপাল অর্থাৎ বাবার থেকেও আমি বড়, বাবার মাঝে মাঝে হয়ত মনে হয়। জানি বাবা কানপাতলা। কিন্তু? থাক এ কথা। বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে হাসছিলেন। তাঁর এবং বাবার লীলা বোঝা ভার। আজ যা হোল আমার পক্ষে বদনাম। এর থেকে মৃত্যুও ভালো। এঁর একটা বিহিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে সম্বোধন করে একটা চিঠি লিখলাম, 'আগামী কাল আমি বিদ্যালয়ে যেতে পারবো না, কারণ আজ যা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সকালেই রেওয়া গিয়ে সব ব্যপার বলব।' চিঠিটা লিখে, ডেভিডকে দিয়ে বললাম, 'আগামী কাল বিদ্যালয়ে বাবাকে চিঠিটা দিও।' এরপর শিক্ষামন্ত্রীর নামে একটা চিঠি লিখলাম। দরখাস্তে লিখলাম, 'যে হেতু বর্ত্তমানে কাশীতে আমার মা অসুস্থ এবং কাছে কেউ নাই, সেই জন্য বিদ্যালয়ে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমার পরিস্থিতি বুঝে, বিদ্যালয়ের কার্য থেকে অব্যাহতি দিন।' চিঠিটা লিখবার পর অনেক রাত অবধি চিন্তা করলাম। মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। বাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে অনুতাপ হয়। পরমুহূর্ত্তে মনে হয়,

অপরাধকে ভয় করা ভালো কিন্তু অনুতাপকে নয়। অনুতাপকে ঈশ্বরের দয়া ভাবা উচিৎ। যাঁর কিছু বলবার নাই, করবার নাই, ভেবে যাঁর কিনারা পাওয়া যায় না, কেঁদে যার অন্ত পাওয়া যায় না, সেই দুঃখ যে কি দুঃখ, যার না হয়েছে সে বুঝবে না। অদৃষ্টের লিখন কেউই খণ্ডাতে পারে না।

পরের দিন সকালেই রেওয়া গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। দেখা করে গতকালের সব ঘটনা বলে পদত্যাগপত্র দিলাম। আমার সব কথা শুনে চিঠি পড়তে লাগলেন। চিঠি পড়া হলে বললাম, 'বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠ ভাবে চালাতে গেলে অবিলম্বে বর্ত্তমানের ক্লার্ককে স্থানান্তরিত করুন এবং একজন যোগ্য কর্মচারিকে মৈহারে শীঘ্র পাঠান, কারণ আমি নয় সেপ্টেম্বার কাশী চলে যাব। নূতন কর্মচারি এলে সব বুঝিয়ে তবেই আমি যাব।' মাথুর সাহেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বললেন, 'ক্লার্ককে আমি বদল করে দেব আর আপনাকে সম্পূর্ণ বেতন সহ পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করবো। আপনি কাশী ঘুরে আসুন। এই সামান্য তুচ্ছ কারণে আপনি কেন পদত্যাগ করবেন? সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রস্তাবের শুরু থেকে আপনাকে আমি দেখে আসছি। আপনি চলে গেলে বিদ্যালয় কি করে চলবে?' বললাম, 'বিদ্যালয় ঠিকই চলবে, যদি উপযুক্ত ক্লার্ক থাকে। বিদ্যালয়ের সব ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হবে না।' এক ঘণ্টা ধরে মাথুর সাহেবকে বুঝিয়ে, পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করিয়ে সব কাজ সারতে তিন চার ঘণ্টা লেগে গেল। ফিরবার সময় মাথুর সাহেবকে অনুরোধ করলাম, আমি পদত্যাগপত্র দিয়েছি এ কথাটা, আমার মৈহার ছাড়ার আগে কাউকে জানাবেন না। বাবা জানলে আমার যাওয়া হবে না।' মাথুর সাহেব হেসে স্বীকৃতি দিলেন। মৈহার ফিরবার সময় মনে হোল কতবছর ধরে সব কাজ করে আসছি। কত রকম বিপদ আপদের ঝক্কি গিয়েছে আমার উপর দিয়ে। তবু তো কিছুই বন্ধ থাকে নি কখনও। আজ প্রথম বাধা পড়লো। বৈকালে মৈহার ফিরলাম। বাবার কাছে গেলাম না।

সন্ধ্যার সময় ডেভিড এলো। বলল, 'আপনি রেওয়া গিয়েছেন শুনে বাবা রাগ করেছিলেন। তবে গতকাল রাত্রে বাড়ী গিয়ে বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝেছেন, যার জন্য আজ বিদ্যালয়ে এসে ক্লার্ককে গালমন্দ করেছেন চুড়ান্ত ভাবে। পরের দিন বিদ্যালয়ে গেলাম না। যে সময় বাবা বিদ্যালয়ে গিয়েছেন, সেই সময় বাবার বাড়ী গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। মা আমার কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'বেডা তুমি তোমার বাবার উপর রাগ করেছ? এতদিনেও তোমার বাবাকে চিনতে পারলে না। রাত্রে তোমার বাবা আমাকে এসে সব বলেছেন। তোমার বাবার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, যতীন এরকম কাজ কখনও করতে পারে না। আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বলেছে, আরে আরে যতীনকে বৃথাই বকেছি। কাল গিয়ে ক্লার্ককে তাড়াব, আর যতীনকে বলব, আমায় কেন ব্যাপারটা ভাল করে বোঝায় নি।' মায়ের কথা শুনে, মিথ্যে করে বাধ্য হয়ে বললাম, 'আজ সকালে কাশী থেকে চিঠি পেয়েছি। মা'র শরীর খুব খরাপ।' রেওয়ার ঘটনা সব বলে মা'কে বললাম, 'যতদিন না ক্লার্ক আসে, ততদিন থেকে বিদ্যালয়ের সব ব্যবস্থা করে কাশী যাব। আপনি বাবাকে সব কথা পরিষ্কার করে বলবেন।' মা'কে প্রণাম করে ছাত্রাবাসে

চলে গেলাম। বাধ্য হয়ে মা'কে মিথ্যা কথা বলতে হোল। সত্য কথা বললে মা আমাকে যেতে দেবেন না। মা'র অবাধ্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া মা এমনিতে অশান্তির মধ্যে রয়েছেন, উপরন্তু যদি শোনেন আমি চিরকালের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাহলে মা সহ্য করতে পারবেন না। মা বিশ্বাস করেন, বাবাকে একমাত্র আমিই সান্ত্বনা দিয়ে মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করেছি বা পারি।

বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়লাম। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছি। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ বাবাকে আমার ঘরে আসতে দেখে চমকে উঠলাম। এই সময় তো বিদ্যালয় বন্ধ হয় নি। ধড়মড়িয়ে উঠে বাবাকে প্রণাম করলাম। বাবা সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীরের কী হয়েছে?' বললাম, 'দুর্বল অনুভব করছি বলে বিদ্যালয়ে যেতে পারি নি।' আমার কথা শুনে বাবা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'রেওয়া কেন গিয়েছিলে?' বললাম, 'শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে ক্লার্ককে বদলী করে নূতন কর্মচারী পাঠাবার জন্য বলতে গিয়েছিলাম। যে ঘটনা গতকাল হয়েছিলো সব কথাই বলেছি। শিক্ষা মন্ত্রী আমার কথা শুনে বলেছেন দুই তিন দিনের মধ্যেই নূতন কর্মচারী পাঠাবেন।' বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভালোই করেছো। এর পর কাশীতে মায়ের শরীর খারাপ সম্বন্ধে, বাড়ীতে যা বলে এসেছি, সেই কথা বাবাকে বলে বললাম, 'নূতন কর্মচারী এলে, সব বুঝিয়ে তারপর কাশী যাব।' বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। বললো, 'কি আর বলবো। আমারই কপাল। সকলেই আমাকে ভুল বোঝে। তুমিও শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুল বুঝলে।' এই কথা বলে বাবা নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন। বাবাকে শান্ত করলাম। বললাম, 'আগামী কাল বিদ্যালয়ে যাব।' বাবা চলে গেলেন। বাড়ী গিয়ে মার কাছে শুনবেন যে আমি গিয়েছিলাম। বাবার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাইরেটা কঠিন। রেগে গেলে যা নয় তাই বলবেন। পরে অনুতাপ করবেন। এ আমার বহুবার দেখা আছে। আজ ভিতরের আবেগ চাপতে না পেরে, আমার সামনে যা করলেন, সেই দৃশ্যটা আমাকে পীড়া দিতে লাগল। যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সে কথা যে সময় বাবা জানতে পারবেন, নিশ্চিন্ত দিশেহারা হয়ে পড়বেন। কিন্তু আমি এখন অপারক। যদিও বিদ্যালয়ে আমার আর যাবার দরকার নাই, কেননা মাথুর সাহেব আমার পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর করে আমাকে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছেন, তবুও যাতে বাবার মনে কষ্ট না হয়, নূতন কর্মচারী না আসা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যাব। বিদ্যালয় থেকে ফিরবার পথে ডেভিড আমার কাছে এলো। ডেভিড বলল, 'বিদ্যালয়ে গিয়েই আজ বাবা জিজ্ঞেস করলেন, যতীন আসে নি?' বাবার প্রশ্নে আমি বাধ্য হয়ে বললাম, 'রেওয়া থেকে এসে শরীর খারাপ হয়েছে যার জন্য আসতে পারেন নি। আমাকে বলেছেন, আপনাকে জানাবার জন্য। আমার কথা শুনেই বাবা চলে গেলেন।' ডেভিডের কথা শুনে বুঝলাম ব্যাণ্ড থেকে বিদ্যালয়ে গিয়ে আমার অসুস্থতার কথা শুনেই আমার কাছে চলে এসেছেন। এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হোল। এখন মাথার মধ্যে কেবল চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। সব চিন্তার মধ্যে আছে, নিজের মনটা নিয়ে টানাটানি। যে মন সকলকে কাছে টানতে চাই, সকলকে ভালবাসতে চাই, অথচ সকলের কাছ থেকে কেবল আঘাত পাই, সে মন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিই। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি।

কয়েকটা দিন আমার মাথার ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে তা বলা সম্ভব নয়। রাত্রে শোবার চেষ্টা করলেও ইতিহাসের কখনও ঘুমোতে নেই। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই, আমার সামনে এত কাণ্ড ঘটে গেল সাত বছরে মৈহারে থাকাকালীন। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই একের পর এক ঘটনা ঘটে যায়। ইতিহাস ঘুমোয় না বলে, এখনও কত ঘটনা দেখতে হবে জানি না। তাকে রুকবার কাউর সাধ্য নেই। নানা চিন্তায় মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। তারপর যখন সত্যই ঘুমিয়ে পড়লাম, সঙ্গীত বিদ্যালয়, ক্লার্ক, বাবা, মা, ডাক্তার মাথুর সব একাকার হয়ে গেল।

যদিও মৈহারে আটটা শীত দেখেছি, কিন্তু বছর গননা করলে আর দুটো মাস পরেই আট বছরে পড়তাম। তাই সাত বছরের শেষে এসে আমাকে আজ নয় সেপ্টেম্বর মৈহার ত্যাগ করতে হবে। নূতন কর্মচারী এসে গেছে। তার কর্মভার বুঝিয়ে দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে বাবাকে একটী বিরাট চিঠি লিখলাম। চিঠিতে পুংখানুপুঙ্খ ভাবে জানালাম, আমার মিথ্যা কথার জন্য বাবা যেন আমায় ক্ষমা করেন। সেই চিঠিতে আমার জীবনের স্বপ্নের কথাও লিখতে ভুলি নি। মনের মধ্যে একটাই সান্ত্বনা, স্পষ্ট এবং সত্য কথা লিখেছি সুতরাং ভয়টা কিসের? যে হেতু বিদ্যালয়ে আমার পরের স্থান সালামৎ খাঁয়ের, সুতরাং তাঁর হাতে চিঠি দিয়ে বললাম, 'আজ রাত্রে আমি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছি। আগামীকাল বিদ্যালয়ে বাবাকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবেন।' সন্ধ্যায় বাবা এবং মা'কে প্রণাম করে একবার ভাবলাম সব কথা খুলে বলে যাই। কিন্তু রাগের মাথায় একটু কটু কথা হয়তো বেরিয়ে আসতো মুখ দিয়ে। তখন আমার অনুশোচনা হ'তো। না থাক। তার চেয়ে এই ভালো। যেমন নিঃশব্দে এসেছি, তেমনি নিঃশব্দে চলে যাওয়াই ভালো। ছাত্রাবাসে চলে এলাম।

বাইরের দরজা দিয়ে একটা পায়রা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সেও যেন সহ্য করতে পারলো না। আবার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং আমার ছাত্র ডেভিড, ইন্দ্রনীল এবং রবীন সকলেই জানে আমি চলে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর মৈহারের পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা করলাম। রাত্রে স্টেশনে এলাম। সাত বছর আগে রাত্রে যে স্টেশনে একলা এসেছিলাম, আজ সেই স্টেশনে আমাকে বিদায় দেবার জন্য লোকে লোকারণ্য। গাড়ী এসে গেল। গাড়ী ছাড়বার আগে সকলেই কাঁদতে লাগল, বিশেষ করে আমার ছাত্ররা। কেননা তাদের শিক্ষার কি হবে? ভরসা দিলাম, সময় করে কাশী এলে শেখাব। ছাত্রদের চোখে জল দেখে আমার চোখেও জল ভরে গেল সকলের কথা ভেবে। গাড়ী ছেড়ে দিল। সারারাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। বাবার কথাই মনে হচ্ছে। আগামীকাল বিদ্যালয়ে আমার চিঠি পেয়ে বাবা দুঃখ পাবেন এবং অবাক হবেন। মা'রও সেই অবস্থা হবে। বাবার এই মানসিক পরিস্থিতিতে ফেলে যাওয়া অপরাধ। মৈহারের সাত বছরের স্মৃতি আমায় কুরে কুরে খেতে লাগলো। মৈহার ছাড়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুকের ভেতর যেন একটা মস্ত পাথর চাপা পড়ে আমাকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলল। মনে হোল, আমার জীবনে এতবড় দুঃখজনক ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। মৈহার ছাড়ার সময় মনে হোল এখানকার ঘর বাড়ী, লোকজন এমন কি বাতাসটুকু পর্যন্ত যেন আরও

বেশী আপন, আরো বেশী চেনা লাগছে। বোধ হয় জীবনে প্রথম অনুভূতি হোল, বাবার বাড়ী ছেড়ে যাওয়া বেদনাদায়ক।

সকলের জীবনেই প্রায় একটা না একটা সময় আসে যখন এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যা সারাজীবন ধরে সে ভুলতে পারে না। সেই ভুলতে না পারার ঘটনাটাই তাকে সারা জীবন পীড়া দেয়। সারা জীবন তার পিছু নেয়। সারা জীবন তাড়া করে বেড়ায়। আমারও হোল সেই অবস্থা। ভবিষ্যৎ আমার কাছে অজ্ঞাত, পথ অনিশ্চিত। বারবার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে। মৈহারের এই পরিবেশ, আলো, বাতাস ছেড়ে এমন জায়গায় যাবার কল্পনা করেছি, যেখানে কোন চেনা মুখের সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না, সত্যি কি সে জায়গা পাব? ভাবপ্রবণতার জোয়ারে ভাসলে চলবে না। যদি সত্যিই সে স্থান পাই, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাবা সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। বাবার কাছে থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে, যা সবাই করে আমি তা করবো না। সকলেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা না একটা চাকরি, ব্যবসা করে। বিয়ে করে এবং পরে মারা যায়। কিন্তু আমি তাহলে কি হবো? স্থির করেছি আমি হবো সঙ্গীতের পাগল। দেখিই না চেষ্টা করে, আমি সত্যই সঙ্গীতের পাগল হতে পারি কি না? গাড়ী চলছে। ট্রেনে সকলেই ঘুমোচ্ছে। আমি জানলার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের রূপ দেখছি। এও এক যন্ত্রণা, এও এক শাস্তি, এও এক নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু আমার মতে সকলের চেয়ে বড় বিবেক। আমি তো আপোষ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেন এমন হোল? যদিও জানি আঘাত পাওয়া ভালো। অনাদর পাওয়া স্বাস্থ্যকর বিশেষ করে বাবার কাছে। কিন্তু তবুও আমাকে মৈহার ছাড়তে হোল। কোন আদর্শে পৌঁছতে গেলে বাধা আসবেই। এই বাধা দূর করবার মধ্যেই মহত্ব। এই বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই গৌরব। আমার স্থির বিশ্বাস, যদি আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তাহলে বাবা সবচেয়ে খুশী হবেন এবং মন প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। যদিও মনে হোল আগামীকাল আমার চিঠি পেয়ে, বাবার চোখ দুটো ছলছল করবে। অতীত দিনগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তবুও আমার স্থির বিশ্বাস, বাবা মনে কষ্ট পাবেন সাময়িক কিন্তু বাবাকে এতদিনে যা বুঝেছি, তাঁর আশীর্বাদ আমি পাবই।

অন্তরা

৪৫

শেষের আগে যেমন শুরু আছে শেষের পরেও তো তেমনি আছে অশেষ। মানুষের জীবন গন্তব্যস্থল তো অশেষ। সেই অশেষের দিকে যাত্রা করতে করতেই তো অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার সঞ্চয় জমে ওঠে। তখন মন বলে যা কিছু দেখলাম, তাতে আর আমার আসক্তি নাই। এবার মা সারদা আমাকে মুক্তি দাও।

চমক ভাঙ্গলো যখন পুলের উপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। সকাল হয়েছে। এলাহাবাদ পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরেই মেল ট্রেনে হাথরস যাত্রা। হাথরসে আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম। ষ্টেশনে দেখলাম লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী গিয়ে সারা রাত লল্লার সঙ্গে কথা হোল। লল্লার দীর্ঘদিনের অভ্যাস, ভোর চারটে অবধি পড়ে, লেখে এবং

তারপর ঘুমোয়। ঘুম থেকে ওঠে সকাল এগারোটা। আমার জন্য অসুবিধা হোল। লল্লার কাছে প্রথম দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সব তালিকা শুনলাম। লল্লা বয়সে আমার থেকে ছোট হলেও, বন্ধুর মত হয়ে গেল। সেই বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে। লল্লাকে মৈহারের ঘটনা সংক্ষেপে সব বললাম। আমার কথা শুনে লল্লা বলল, 'সত্য কথা বললে যেখানে উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়, সেখানে সুবিধাবাদীরা সত্য কথা বলে না। কিন্তু যাদের অভ্যাস স্পষ্ট কথাই বলা, ঘটনার পরিণতি খারাপ হলেও তারা স্পষ্ট কথা বলে। সুতরাং মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। যারা নিজের মতলব হাসিল করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়, পরে তাদের মন ক্ষত বিক্ষত হয়। কিন্তু সত্যের জয় সুনিশ্চিত।' এই কথা বলে লল্লা দুই মহারথীদের সম্বন্ধে নানা কথা বলল। সে সব কথা আমার কাছে বিস্ময়কর। একসময় মৈহারে আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের চরিত্রে যা দেখেছি, তা ছিল আমার কাছে আদর্শ। এত বড় শিল্পী হয়েও তাঁরা এক নিরহংকারী। তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রচারের কোন নির্দশনই তখন আমার চোখে পড়েনি। কাশীতে অধিকাংশ গায়ক বাদকের মধ্যে যে সব আত্মপ্রচারের ঘটা দেখেছি তা কখনও মৈহারে দেখি নি। কিন্তু হাথরসে লল্লার কাছে এমন অনেক কথা শুনলাম যা আমার স্বপ্নের অগোচর। বুঝলাম, বাবার বাড়ী ছিল সঙ্গীতের তপোভূমি। একমাত্র বাবাই ছিলেন আদর্শ। কিন্তু আমার দুজন আদর্শ গুরুভাই মৈহারে যখন আসতেন সেই সময় দেখতাম নির্বিকার, কিন্তু বাইরে তাঁদের রূপ একেবারে আলাদা। প্রকৃত ভিতরের রূপ জানলাম লল্লার কাছে। বুঝলাম, একজন অন্যের কথামত সব কাজ করে। মনে হোল কবে আমি আমার আকাঙ্খিত জায়গায় স্থান পাবো এবং একান্তে সাধনা করবো।

দুদিন পর আমার সব বাজনার খাতা এবং যাবতীয় ছোটখাট জিনিষ রেখে, মাদ্রাজে রাত্রের ট্রেনে লল্লার সঙ্গে যাত্রা করলাম। সঙ্গে তবলা বাদক ছিল জুম্মন খাঁ। লল্লা আমার জন্য বেডিং কিনে রেখেছিল। ট্রেনে এতদূর যাত্রা আমার এই প্রথম। স্কুল এবং কলেজ জীবনে, প্রতিবছর গরমে আমার মেজদার কাছে বম্বে যেতাম। কিন্তু দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, যে মুহূর্ত্তে বিজয়নগরম পৌঁছলাম, দেখলাম অন্য পরিবেশ, অন্য ভাষা, অন্য খাবার। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করল। দুর্গাপূজার দিন মাদ্রাজের হোটেলে পৌঁছলাম। মাদ্রাজে পৌঁছে বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম। লিখলাম, 'অশান্ত মনটাকে ঠিক করবার জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে এসেছি।'

প্রথম দিন, দাস প্রকাশ হোটেলের একটা সুন্দর হলঘরে বাজালাম। প্রোগ্রামটির সভাপতিত্ব করলেন মাদ্রাজ আকাশবাণীর ডাইরেক্টার ডাক্তার নারায়ণ মেনন। এই নারায়ণ মেনন পরবর্ত্তীকালে সঙ্গীত নাটক একাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্ত্তমানে রিটায়ার করেছেন। প্রথমে লল্লা সেতার এবং পরে আমি সরোদ বাজালাম। আলাপের সময় বিরক্ত বোধ করলাম। চোখ বুজে বাজাচ্ছি হঠাৎ মনে হোল, কেউ গরম চা খেলে যেমন আওয়াজ হয় সেই রকম কোথা থেকে আওয়াজ আসছে। তাকাতেই দেখি আওয়াজ বন্ধ। আবার চোখ বুজে কিছুক্ষণ বাজাবার পরই সেই আওয়াজ। মনে হোল আমাকে বাজনা থামাতে বলছে, নইলে এরকম শ্রোতাদের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছে কেন? তবে কি এঁরা আমাকে

থামিয়ে দিতে চাইছে। মৈহারে যাবার আগে দুইবার সঙ্গীত সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে কোন গায়ক বা বাদককে নিরুৎসাহিত করতে দর্শকদের মধ্যে 'নো মোর, নো মোর' চিৎকার এবং ঠোঁট দিয়ে তীব্র সিটি বাজাতে দেখেছিলাম। যাই হোক, বাজাবার পর যখন ডাক্তার নারায়ণ মেনন এসে আমার প্রশংসা করলেন, বললাম, 'আমি মন দিয়ে বাজাতে পারিনি, কেননা মাঝে মাঝে আওয়াজ হচ্ছিল।' মেনন বললেন, 'দাক্ষিণাত্যে এই আওয়াজটাই প্রশস্তির বহিঃপ্রকাশ। যেমন উত্তর ভারতে প্রশংসার বহিঃপ্রকাশ 'ক্যা বাত' ধ্বনি। নূতন অভিজ্ঞতা হোল। মেনন আমাকে রেডিওতে বাজাতে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'রেডিওতে কি আপনি বাজান?' জবাবে বললাম, 'সাত বছর আগে দুই বার রেডিওতে বাজিয়েছি, কিন্তু আমার উস্তাদ বাবা নিষেধ করাতে আমি তারপর থেকে রেডিওতে বাজাই নি।' মেনন বললেন, 'তাহলে তো রেডিওতে প্রোগ্রাম রাখতে পারব না। অডিশন দিয়ে একবার রেডিওতে শিল্পী তালিকায় নাম থাকলে, দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রেডিও স্টেশন থেকে বাজাবার ব্যবস্থা করে দিতাম। যেহেতু রেডিওর শিল্পী তালিকা থেকে নাম কাটা গেছে, সেই হেতু দাক্ষিণাত্যের কোন রেডিও ষ্টেশন থেকে বাজাতে পারবেন না।' যাই হোক এর পর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধিবেশনে বাজনার পরিবেশন অনুষ্ঠিত হোল। সেই অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করতে মেনন সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন। চারটি বিখ্যাত হলে আমার বাজনার অনুষ্ঠান হোল। অতঃপর চলে গেলাম পণ্ডিচেরি।

পণ্ডিচেরির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন মসিয়েঁ এ্যালেন ড্যানিলিউ। ফ্রান্স থেকে যে সব ছাত্র ছাত্রী পণ্ডিচেরীতে শিক্ষা করতে আসত, এ্যালেন ড্যানিলিউ তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করতেন। কাশীতে থাকাকালীন আমার সঙ্গে মৌখিক আলাপ ছিল। কাশীতে তখন ড্যানিলিউ বীণ শিখতেন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত ফরাসী ভাষাতে অনুবাদ করতেন। সে দিন মসিয়েঁর বাড়ীতে আমাদের চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বিকেলে চা পর্বের পর তাঁর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বাজনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এই প্রথম, কোন অভারতীয় শ্রোতাদের বিমুগ্ধ এবং শান্ত সমাবেশ দেখবার সৌভাগ্য হোল। বাবার কথা মনে পড়লো। বাবার কাছে বিদেশী শ্রোতাদের সঙ্গীত প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা ছিল। এতদিন সেই বিদেশী শ্রোতাদের চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হোল। এ্যালেন ড্যানিলিউ একটী ফরাসী মহিলা ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটি উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।' বললাম, 'এখন শ্রীমার আদেশ অনুসারে এখানে একটি সঙ্গীতের কার্যক্রম নির্দ্ধারিত আছে। সেই অনুষ্ঠান সেরে, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজাতে যাবার আগে, আপনার ছাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় শঙ্গীত সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' শ্রীমার অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য পরের দিন আশ্রমে গেলাম। শ্রীমা বাজনা শুনে তাঁর একজন বাঙ্গালী সচিবের মারফৎ আমাকে কয়েকদিনের জন্য অতিথি ভবনে থাকবার নির্দেশ দিলেন। পণ্ডিচেরির মত এত ভাল জায়গা দেখে মুগ্ধ হলাম। শ্রীমার অতিথি ভবনে গিয়ে উঠলাম সমুদ্রের সামনে, সুন্দর বাড়ীতে। বুঝলাম, শ্রী অরবিন্দ কতবড় কাজ করে গিয়েছেন। শ্রীমার

সচিব সব ঘুরে দেখালেন। সে এক অদ্ভুত জগৎ মনে হোল। আসনের ক্লাস দেখে মুগ্ধ হলাম। কুড়ি পঁচিশজন ছেলে মেয়ে, আসন শিক্ষা নিচ্ছেন এক মাদ্রাজী শিক্ষকের কাছে। আমি আসনের প্রথম শিক্ষা বাবার কাছে পেয়েছিলাম। পরে বই দেখে দেখে আসন করতাম। মাদ্রাজী শিক্ষককে অনুরোধ করলাম, 'আমার আসনগুলি ঠিক হচ্ছে কিনা যদি দয়া করে বলে দেন।' শিক্ষক আমাকে পরের দিন ডাকলেন। সেই সময় ঘড়ি দেখে আমি চারমিনিট শীর্ষাসন করতাম। আমার যা ভুল ছিল, শিক্ষক পরের দিন সংশোধন করে দিলেন। সেই দিন শ্রীমার সচিব বললেন, 'মা আজকেও আবার আপনার বাজনা শুনবেন।' রাত্রে বাজালাম। পরের দিন, শ্রীমার সচিব এসে বললেন, 'মা বলেছেন যদি পণ্ডিচেরিতে থেকে এখানের ছেলে মেয়েদের আপনি শিক্ষা দেন তা হলে মা খুশী হবেন।' সব কথা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দিলাম।

এ একটা অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতের অধিকাংশ বাঙ্গালী অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. থেকে আরম্ভ করে, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ব্যবসায়ী সবাই এক একজন এক একটী বিভাগ পরিচালনা করেন। অবাক হলাম যখন দেখলাম ধোপাখানার পরিচালক একজন অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. অফিসার। এক কথায় বলতে গেলে কেউ বসে নেই। সকলেই যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্যই এই নিয়ম কানুনের প্রচলন। এখানকার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম, যে সময় শ্রী অরবিন্দ জীবিত ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির সঙ্গে বাবা এসে ছিলেন। বুঝলাম, শোনা আর দেখা এক জিনিষ নয়। বাবাকে শ্রীমার সচিবের নির্দেশ জানিয়ে লিখলাম, 'মিথ্যা কথা বলে মৈহার ছেড়ে এসেছি বলে, আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না এবং কারো কাছে নিন্দা করবেন না। দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।' শ্রীমার সচিবকে বললাম, 'শ্রীমার সঙ্গে আমাকে, পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করাতে হবে একান্তে, কারণ আমার কিছু আধ্যাত্মিক প্রশ্ন আছে।' শ্রীমা সারা দিন রাতই কাজের শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন শুনেছিলাম, তাই সময় চাইলাম। সচিবের মাধ্যমে সময় নিয়ে, পরের দিন একটী নিভৃত ঘরে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা কথা বললাম। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উস্তাদ বাবার কাছে বহুবার বলতে শুনেছি, জীবনে তিন চারবার মাত্র 'সা' স্বর লেগেছে। এর রহস্য বাবা কিছুটা বললেও, আমার বোধগম্য হয়নি, এবং রহস্যই রয়ে গেছে। দয়া করে এই কথাটির মধ্যে কি রহস্য আছে দয়া করে যদি আমায় বুঝিয়ে দেন।' আমার কথা শুনে শ্রীমা বললেন, 'আপনার গুরু বাবা মস্ত বড় সাধক। ঠিক কথাই বলেছেন। কেন যে বলতেন জীবনে তিন চারবার 'সা' স্বর লেগেছে, তা বোঝাতে গেলে একটা ছেলেদের উপকথার গল্প শোন। এক কাঠুরিয়াকে, নিজের দারিদ্রকে অভিসম্পাত দেওয়া দেখে, সাধুর রূপ ধরে, ভাগ্য এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান। বলেন এগিয়ে চল। চললেই পাবি। বিশ্বাস করে কাঠুরিয়া চলতে গিয়ে প্রথমে চন্দনের পাহাড় দেখে অবাক হয়। সাধুর কথা স্মরণ করে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখে টাকার পাহাড়, তারপর সোনার পাহাড়, পরে হীরে, মণি-মুক্তোর পাহাড়। তারপর কি আশ্চর্য, সেখানে ঐশ্বর্যতার আভাতে দুই চোখ ঠিকরে যায়। এমন আশ্চর্য যে, তার চারদিক জ্যোতির সমুদ্র। এই জ্যোতির সমুদ্রই হোল 'ওঁম'

সিদ্ধির দর্শন। এই 'ওঁমের' দর্শনের কথাই তোমার গুরু বাবা বলেছেন, যে তিনি চারবার 'সা' জীবনে লেগেছে।' শ্রীমার কাছে এই উত্তর শুনে, আমার অন্যান্য প্রশ্ন এবং শ্রীমার উত্তর, এখানে যুক্তিসঙ্গত কারণেই অব্যক্ত রইল। শ্রীমা বললেন, 'অনুভূতির কথা কাউকে বলতে নাই, বললে অহংকার বাড়ে এবং তাতে নিজের এবং পারমার্থিক সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে।'

পণ্ডিচেরিতে তিনদিন থাকার কথা ছিল, সে ক্ষেত্রে চোদ্দ দিন রয়ে গেলাম। এখন আমার অন্তরর্দ্বন্দ্ব চলছে। এখানে শ্রীমার কথায় থাকতে হলে, শিক্ষা দিতে হবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, কিন্তু সেটা আমার কাম্য নয়। আমার মনকে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ টানছে, যা আমার স্কুল জীবন থেকে অবচেতন মনে ছিল। পরে বাবার সান্নিধ্যে এসে সেটা দানা বাঁধে। পরে সংযোগ বশতঃ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ হয়। কথা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছি, কোলকাতায় গিয়ে নিজের বাসনা জানাব। যে সময়ে মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, সেই সময় বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
২৭-১০-৫৬

কল্যানবর,

শ্রী যতিন তুমার পত্র পাইলাম। বিজয়ার আশির্ব্বাদ গ্রহন করিবে, তুমার মায়ের আর্শিব্বাদ গ্রহণ করিবে।

তুমি যে স্থানে পৌঁহুছিয়েছ তাহা স্বর্গ স্থান। সর্গ ছের না সেখানেই তুমার কর্ম্ম সফল হবে। সর্গের ঋৃশী মুনির সন্তানধিগকে সঙ্গীৎ শিক্ষা দান কর, আমি পারি নাই তুমার দ্বারায় যদি হয়-তবে মনে করিব আমিই সেবা করেছি।

শ্রীমায়ের শ্রীচরণে আমার কুটি কুটি প্রণাম প্রার্থনা করিবে। সর্গস্থানের ঋশীমুনি সকলের চরণে আমার প্রণাম জানাবে। যা করেন ভগবান মঙ্গলের জন্য, আশ্রমে থেকে নিজের জীবনকে ধন্ন কর। আমি তুমার নিন্দা করি না, যদি করে থাকি সাক্ষাতে করে থাকি। আমি যদি নিন্দা করি তাতে তুমার পাপ খণ্ডন হবে। এমোন কর্ম্ম করিবে যাতে যগতে স্বরনীয় থাকে। একপ্রকার তুমার কুশল কামনা করি, তুমার আর কুন পত্র পাই নাই,

ইতি
আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। বাবাকে পত্রপাঠ লিখলাম, 'পণ্ডিচেরিতে আমাকে শিক্ষা দান করতে আদেশ করেছেন কিন্তু এখন আমি নিজেই ছাত্র। শিক্ষা কি দিব? উপস্থিত আমার সাধনার সময়। যদি কোন দিন যোগ্যতা লাভ করি, তাহলে আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব।' আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে চিঠি শেষ করলাম। এঁরপর, শ্রীমার সচিব যখন বললেন, 'কি ঠিক করলেন?' তাঁকেও এই কথা বলে বললাম, 'আমাকে একটা শ্রীমার স্বাক্ষরিত ফটো দিন।' পরের দিনই শ্রীমার স্বাক্ষরিত আশীর্ব্বাদপুত একটি বাঁধান ছবি পেলাম। এবার পণ্ডিচেরি থেকে বিদায়ের আগে, আমার প্রতিশ্রুতি হিসাবে, ফরাসী ছাত্রীর

সঙ্গে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা করে, দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে আন্নামালাই ইউনিভার্সিটির জন্য পণ্ডিচেরি থেকে বিদায় নিলাম। লল্লা এবং তবলিয়া, তিন চারদিন আগেই, সব আগাম ব্যবস্থা করতে চলে গিয়েছিলো। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সব জায়গায় বাজিয়ে, যে রসজ্ঞ এবং তালজ্ঞ শ্রোতার সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁর তুলনা নাই। নির্দ্ধারিত সব জায়গায় প্রোগ্রাম করে বেজওয়াডাতে গেলাম। সেখানে বাজিয়ে লল্লা সোজা দিল্লী চলে গেল। আমি জব্বলপুর গেলাম। জব্বলপুরে আমার ছাত্র কর এবং কুলকার্নি, দুই জায়গায় আমার বাজনার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলো। জব্বলপুরে বাজিয়ে কাশী যাবার পথে রাত্রে মৈহার ষ্টেশন পড়ল। ষ্টেশনে নেমে সারদা দেবী এবং বাবাকে স্মরণ করে, মৈহার ষ্টেশনের মাটিতে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানালাম। মৈহারে নেমে বাবার সঙ্গে দেখা করলাম না, পাছে বিদ্যালয়ের জন্য আটকা পড়ে যাই। বছর শেষ হতে একটী মাস বাকী আছে, কাশীতে পৌঁছলাম।

কাশীতে এসে দিন সাতেকের মধ্যেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। এখানে কোথায় সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ? আমার গলির পৈত্রিক বাড়ীতে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কলরব। কবিরাজ আশুতোষের দোকানে, কাশীর গায়ক বাদক আসে। এখানে কেবল পরনিন্দা এবং পরচর্চা। মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে স্বর্গ থেকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সকালে বাড়ীতে যখন বাজাতে বসি, শুনতে পাই 'লে মছলি', 'লে বথুয়া কে সাগ' ইত্যাদি। গলির বাড়ী বাড়ীতে সব্জি, মাছ বিক্রি করার আওয়াজ আসে। অথচ মৈহারে কি দিন, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত্রে মনে হ'তো নির্জনপুরী। সাধনার জন্য এরকম আদর্শ স্থান কল্পনার বাইরে। একটা মাস কি ভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। উপস্থিত এই পরিস্থিতি আমাকে মানিয়ে চলতেই হবে। উপায় নেই, যতদিন না কোলকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যাই। এই কোলাহলের মধ্যেও, সকালে এবং গভীর রাত পর্যন্ত রিয়াজ করি। ইতিমধ্যে বছরের শেষে, মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, সঙ্কট মোচনে হনুমানজীর সামনে প্রথম বাজনার আয়োজন করলেন। সামতা প্রসাদ সঙ্গত করল। অমরনাথ মিশ্র কাশীর রসিক শ্রোতাদের আমন্ত্রণ করলেন। উস্তাদ বাবা, দীর্ঘদিন ধরে আমার ভিতর একটি বেদবাক্য প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'প্রশংসা এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে'। সেইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বাজনা শুনে প্রশংসা করল, আমি অন্য কান দিয়ে বার করে দিলাম। হনুমানজীর কাছে প্রার্থনা করে বললাম, 'তোমার যেমন ইচ্ছে, তেমনি সারাজীবন আমাকে সৎপথে চালনা করো, কেননা মৈহারের পাট চুকিয়ে কাশীতে সর্বপ্রথম তোমার দরবারে এই প্রথম বাজালাম।'

সময় যেমন কারোর জন্যই অপেক্ষা করে না, তেমনি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতাও কারোর নাই। বয়সের হাত ধরে যতই এগিয়ে চলেছি, ততই এই অভিজ্ঞতা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, মৈহারের সেই শেষ দিনগুলির কথা। মৈহার ছাড়ার আগে বাবা বলে ছিলেন, 'বাইরে বেরিয়ে দেখবে কেবল পারটি, পারটি।' বাবার কথাটা যে কত নিষ্ঠুর সত্য, কাশীতে এসেই বুঝতে পারছি, এবং দীর্ঘ তিরিশবছর পরেও হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

কাশীতে এসে এই প্রথম অনুভব করলাম অর্থের প্রয়োজন। জীবনের তিরিশটা বছর

চলে গেছে। অর্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝি নি। কলেজ জীবনের পর মৈহারে সাত বছর কাটিয়েছি। উপস্থিত কাশীতে এসে টাকার প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করলাম। আমার শুভাকাঙ্খী মহন্ত অমরনাথ মিশ্র, গুল্লুজী এবং কবিরাজ আশুতোষ বললেন, 'বাজাও। জলসায় বাজিয়ে অর্থ পাবে, অর্থের অসুবিধা হবে না।' ভাবলাম কথাটা অযৌক্তিক নয়। বাবা, আলি আকবর, রবিশঙ্কর বাজনা বাজিয়ে কত টাকা পায়। আমার তো জীবন সবে শুরু। দেখাই যাক না কি হয়, যতদিন না বেদান্ত মঠে যাই।

কাশীতে আসবার কিছুদিন পরই লক্ষ্য করলাম, সঙ্গীত যাঁদের পেশা, তাঁরা সকলেই চোখে মুখে কথা বলে। অনেককে দেখলাম, অযথা মিথ্যা কথা বলে, কত ব্যস্ত শিল্পী বলে নিজেকে জাহির করে। মৈহারে বাবার কাছে থেকে আমি অন্তরমুখী হয়ে গিয়েছি। কাশীতে এসে দেখলাম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ণ এবং জলসা লেগেই আছে। এই কার্যক্রমগুলি সবই সন্ধ্যার পরে হয়। এখন যদি আমাকে সব জায়গায় যেতে হয়, তাহলে রাত্রের রিয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে। মৈহারে এ সবের বালাই ছিলো না। মৈহারে কোথাও যেতাম না। কাশীতে অন্য পরিবেশ। আমাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হোল। কোন উৎসবের নিমন্ত্রণ পেলেই, বাধ্য হয়ে বলি, 'কার্যক্রমের দিন আমি বাইরে যাচ্ছি।' এর ফলে আমি একেবারে ঘরকুণো হয়ে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই ভাওয়ালি টিবি স্যানিটোরিয়ামে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। কবিরাজ আশুতোষের এক পরিচিত সাধুবাবার আমন্ত্রণে, মহন্তজী, গুল্লুজী, কবিরাজ আশুতোষ এবং আমি গেলাম। পাহাড়ী এলাকায় ভাওয়ালি প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করল। মৈহারে সাত বৎসর থাকাকালীন, সাত আটবার যখনই কোন অতিথির সমাগম হ'তো, তাঁদের সামনে যখনই সরোদ বাজিয়েছি, বাবা আমার সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়ে সঙ্গত করতেন। সরোদের সঙ্গে মৃদঙ্গ খুবই ভালো লাগতো, কেননা দুইটি বাজনার আওয়াজই গুরুগম্ভীর। সেইজন্য ভাওয়ালিতে, মহন্ত অমরনাথ মিশ্র মৃদঙ্গে আমার সঙ্গে সঙ্গত করলেন। গুল্লুজীর সঙ্গে আশুতোষ সঙ্গত করল। বাজাবার পর ডাক্তার শ্রোতারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। ডাক্তারের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়, তার প্রশংসার জবাবে বললাম, 'আমার একটা দুরারোগ্য ব্যাধি আছে।' তিনি আমার দেহ যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে নানা যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে, আমাকে কয়েকটি ওষুধ দিয়ে বললেন, 'প্রতিদিন আপনাকে নির্দেশিত পথ্যের সঙ্গে ঘোল অবশ্য পান করতে হবে।' রোগটি আমার মৈহারেই হয়েছিল। রোগটি হোল, সমস্তদিন পেটে যন্ত্রণা হওয়ার ফলে, প্রতিদিন কয়েকবার দাস্ত হ'তো। এ কথা শুনে মহন্ত অমরনাথ মিশ্র বললেন, 'কাশীতে আমার বাড়ী তুলসীঘাটে এসে সাধনা করো।' মহন্তজীর তুলসী মন্দিরের বাড়ী সম্পূর্ণ আদর্শ পরিবেশ। সন্ত তুলসীদাস ওই বাসস্থানে বসেই, ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর রামচরিত মানস রচনা করেছিলেন। মহন্তজীর, সঙ্কটমোচন মন্দিরে অনেক গরু আছে। সুতরাং বিশুদ্ধ ঘোল নিয়মিত পাওয়া যাবে। মহন্তজীর কথায় রাজী আমি হলাম। তুলসীমন্দিরে কোন কোলাহল ছিলো না। ঠিক মৈহারের পরিবেশ। যদিও মৈহারের নির্জনতার তুলনা নাই, কিন্তু তুলসী মন্দিরেও কোন আওয়াজ নাই। সাধনার জন্য উত্তম

স্থান। মৈহার থেকে এসে তিনবছর মহন্তজীর বাড়ীতেই ছিলাম। কেবল সপ্তাহে একদিন শুক্রবারে, যেমন মৈহারে বাজাতাম না, সেইরকম কাশীতে শুক্রবার না বাজিয়ে নিজের বাড়িতে সকালে গিয়ে, মায়ের হাতের রান্না খেয়ে রাত্রে আবার তুলসী মন্দিরে ফিরে আসতাম। শুক্রবার গুল্লুজী এবং কবিরাজ আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতাম। এঁরাও মাঝে মাঝে তুলসী মন্দিরে আসতেন। সকলের কথায় রেডিওতে অডিশান দিয়ে, এলাহাবাদ থেকে বাজাতে লাগলাম।

কাশীতে ফিরে বাবাকে চিঠি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবার উত্তর এলো সংক্ষিপ্ত। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৫-৩-৫৭

কল্যানবর,

তুমার পত্র পাইলাম, অত্র মঙ্গল। তুমার কুশল কামনা করি—শ্রীমান আসু দাদুকে আমার আসিবর্বাদ জানাবে।

ইতি—
আলাউদ্দিন

মনে তখন একই চিন্তা। কিছু অর্থের প্রয়োজন। তারপর সুযোগ হলেই, কোলকাতায় গিয়ে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে আস্তানা গাড়বার স্বপ্ন, দিবারাত্র চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য সুযোগও এসে গেল। হঠাৎ আশুতোষের নিমন্ত্রণে, কোলকাতার তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারি, শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বছরের মাঝামাঝি সময়ে এলেন। বেনারসের সঙ্গীত সংস্থা 'সঙ্গীত পরিষদে' তাঁর গান হোল এবং তারপর আমার বাজনা হোল। আমার সঙ্গে তবলায় সহযোগীতা করল কিষণ। শৈলেনবাবু, আমার বাজনা শুনে খুশী হয়ে, ডিসেম্বারে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে বাজাবার আমন্ত্রণ জানালেন। যাক, এক সঙ্গে দুই কাজই হবে। কোলকাতায় যাবার যখন সুযোগ এসে গেছে, তখন খুব মন দিয়ে রিয়াজ করতে লাগলাম তুলসী মন্দিরে। সেই সময় বাজনা, খাওয়া, ঘুমোন এবং বইপড়া, এই হোল আমার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী। ব্যতিক্রম একমাত্র শুক্রবার। এর মধ্যে আমার মাঝে মাঝেই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা হতে লাগল। সে সময় একচেটিয়া একবার, এলাহাবাদে এবং বিহারের বহু জায়গায় কিষণের সঙ্গে আমার বাজনা হতে লাগল।

কাশীতে ইতিমধ্যে সঙ্গীত জগতে সকলেই আমার নাম জেনে গেছে। গরম কাল। কাশীতে আনন্দময়ী মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হোল। আনন্দময়ী মায়ের প্রধান সঙ্গীত প্রেমী শিষ্য বিভ মহারাজ, কবিরাজ আশুতোষের সাহায্যে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করলেন। এই সম্মেলনে অনেকের মধ্যে আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর এল। বাবাকে চিঠি দিলাম। বাবাকে লিখলাম, 'আনন্দময়ী মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমাকে বাজাবার জন্য বলেছে। আপনার অনুমতি পেলে বাজাব।' আশ্রমের

কাছেই একটী মাঠে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হোল। কবিরাজ আশুতোষ, আলিআকবর, রবিশঙ্কর এবং আমার সঙ্গে বাজাল। বাবার কোন চিঠি না পেয়ে মনে হোল বাবা বোধ হয় রাগ করেছেন। তাই কবিরাজ আশুতোষকে বললাম, 'বাবাকে চিঠি লিখুন।' কবিরাজ আশুতোষের চিঠি পেয়ে বাবা জবাব দিলেন। চিঠি পেয়ে বুঝলাম আমার চিঠি বাবা পান নি। চিঠিটা মারা গেছে। বাবা আশুতোষের চিঠিতে জানিয়েছেন, যে আনন্দময়ীর আশ্রমে বাজিয়েছি শুনে খুশী হয়েছেন। কিন্তু বাজাবার পর জানান শয়তানের লক্ষণ জ্যেঠামি ইত্যাদি। আশুতোষকে লেখা পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার

কল্যানবর—

শ্রী মান আশুতোষ কবিরাজ মহসায় তুমার পত্র পাইলাম যতিনের বাজাবার বিষয় জানিয়েছ তাকে কুথাও বাজাবার জন্য আমার আদেশের কুন প্রয়োজন করে না, কুথাও বাজাতে তাকে নিষেধ করি নাই। শ্রী শ্রী মা আনন্দমইর আশ্রমে বাজিয়েছে ভাল করেছে এতে আনন্দ পাইলাম। বাজাবার পর জানান একটা শয়তানের লক্ষণ ও জেঠামি, আর কিছু নয়। পূজার সময় যখন আমাকে ডেকেছিলে দশমীর দিন তখন তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি এবং তুমার গুরু কবিরাজ মহাশয় ও ঐন্য ২ মাননীয় মহুদয়দের আদেশে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে জাই। আমার যথা সাদ্ধ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি, এখন তাহার যেখানে ইচ্ছা বাজাতে পারে তাকে আমার কুন আপিত্য নাই। একমাস রূজা থাকার পর বেস কাহিল হয়ে পরেছি, শরীর দুর্বল, নানা অশান্তি ভুগ করতেছি এর পর কি হবে তিনি জানেন। সকলেই আন্তরিক স্নেহ আসিবর্বাদ গ্রহণ করিবে একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি—
আলাউদ্দিন।

রবিশঙ্কর এসে আশুতোষকে ডেকে পাঠান হোটেলে। রবিশঙ্কর আমাকে ডাকল না এবং আমিও নিজের থেকে গেলাম না। পরে কবিরাজ আশুতোষের কাছে শুনলাম, প্রায় রাতভোর আশুতোষকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে যা কি বাবার কাছে বলেছিলো। প্রথমেই বলেছে, 'আমার সবথেকে বড় সঞ্চয় নিমেষে শূন্য হয়ে গিয়েছে। মুহূর্তে যেন দেউলে হয়ে গিয়েছি। ওয়ান ফাইন মর্নিংয়ে দেখলাম, আমি একা, সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে, এবং অন্নপূর্ণা সকলেরই সহানুভূতি পেয়েছে। এর ফলে সকলেই আমাকে অবহেলা করছে। কি বলব সবই আমার ভাগ্য।' এ কথা শুনে আশুতোষ প্রতিবাদ করে বলেছে, 'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কেননা আমি দীর্ঘদিন ধরে অন্নপূর্ণাবৌদিকে দেখেছি।' কবিরাজি পড়তে দিল্লীতে যে সময় আশুতোষ গিয়েছিলো সেই সময় রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণা দেবী ডি.সি.এম.-এর কর্ণধার ভরতরামের বাড়ী থাকতেন। এই ব্যবস্থা বাবাই করে দিয়েছিলেন। বাবা যে সময় দিল্লী যেতেন, ভরতরামের বাড়ীতেই থাকতেন, এবং তার স্ত্রী শীলা দেবীকে সেতার শেখাতেন। বাবাই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, রবিশঙ্কর যদি দিল্লীতে থাকে, তাহলে বরাবর শিক্ষা দিতে পারে। ভরতরাম

রাজী হয়েছিলেন। রবিশঙ্কর ভরতরামের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা দেবীকে নিয়ে থাকতেন। কবিরাজ আশুতোষ সেই সময় ছুটির দিনে তবলায় সঙ্গত করত। এ সব কথা মৈহারে যাবার আগেই, আমি আশুতোষের কাছে শুনেছিলাম। এ কথাও শুনেছিলাম যে সময় কোন তান ঠিক সমে আসত না, সেই সময় রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণা দেবীকে ডাকতেন। অন্নপূর্ণা দেবী সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দিতেন, যার ফলে তান তোড়া ঠিক ভাবে সমে এসে পড়ত। আশুতোষের কাছেই অন্নপূর্ণা দেবীর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছিলাম। পরে আমি যে সময়ে মৈহারে যাই, নিজে উপলব্ধি করেছিলাম। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রবিশঙ্কর সর্বদা সঙ্গীত সম্বন্ধে মনন, চিন্তন করে নিজের বাজনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। যাক যে কথা বলছিলাম। রবিশঙ্কর আশুতোষকে বলেছে, 'যতীন যদি জুবেদা বেগমের টেলিফোন পেয়ে দিল্লী চলে যেত, তাহলে হয়ত এ সব কিছুই হ'তো না।' কবিরাজ আশুতোষকে বিশ্বাস করাতে না পেরেই যে রবিশঙ্কর এ কথা বলেছে বুঝতে পারলাম। আশুতোষের কাছে এ কথা শুনে মনে হোল, এ যুগের লোভটাই মানুষের মনুষ্যত্বকে ধীরে ধীরে বিকৃত করে তুলেছে। মানুষ কেবল উপলক্ষ্য। সকলে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে নিজেকে স্থির সংযত রাখা কঠিন। কোন আদর্শ তাঁদের ঠেকাতে পারে না। কেন সে এমন হয়ে গেল? এর জন্য কাকে দায়ী বা দোষী করব? মনে হোল, মানুষ দূর থেকে মানুষ সম্বন্ধে এক ধরনের ধারণা পোষণ করে আর কাছ থেকে অন্যরকম। যেমন দূরে ক্যামেরা বসিয়ে কোনও জিনিষের ছবি এক ধরনের দেখায়, আর কাছে ক্যামেরা বসিয়ে আর একরকম। ভুল মানুষ করেই। কিন্তু স্বীকার করতে দোষ কোথায়? কিন্তু আজ বুঝতে পারছি এ রবিশঙ্করের ভুল নয়। নির্বুদ্ধিতা। সকলের চোখে বড়ো হবো, সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা চিরকাল ধরে পেয়ে যাবো, সকলের মাথায় চড়ে বসে থাকবো, এই ধারনাই তো নির্বুদ্ধিতা। সকলের চোখে ছোট হয়ে যাবার ভয়েই, এমন করে বসলো। নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে? মনে হয় তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো। নিজেকে যাঁরা চিনেও চেনে না, পরকেও যে চিনতে পারবে না, এটা ধ্রুবসত্য।

কাশীতে বিরাট অধিবেশন হয়ে যাবার পর আনন্দময়ী মা আমাকে আশ্রমে দেখা করতে বললেন। আনন্দময়ী মায়ের কাছে গেলাম। আমাকে দেখে নিজের গায়ের একটী চাদর আমাকে দিলেন। বললেন, 'তোমাকে আর কি দেব? আমার গায়ের চাদরটাই দিলাম।' একটী বিশেষ দিনে আমাকে বাজাবার জন্য বললেন। মা'র নির্দেশ অনুসারে, আশুতোষকে নিয়ে গেলাম। শ্রোতার মধ্যে, কেবল আনন্দময়ী মা, গোপীনাথ কবিরাজ এবং তাঁর পাঁচজন শিষ্য। আমার বাজনা শোনার পর, গোপীনাথ কবিরাজ কথায় কথায় বললেন, 'শিল্পী হলেই বে-হিসেবী হতে হবে। আর হিসেবী হলেই তাঁর দ্বারা শিল্পী হওয়া হবে না। এ দুটো হোল তেল আর জল। এ দুটো কখনও মিল খাবে না। শিল্পী হলেই টাকার ব্যাপারে ঠকতে হবে, আর হিসেবী হলেই তোমার শিল্পের ব্যাপারে ঠকতে হবে। সংসারে দস্যু রত্নাকর আর বাল্মীকি একাধারে হওয়ার নিয়ম নাই। তাই বাল্মীকি যতদিন রত্নাকর ছিলেন ততদিন তাঁর ঘুম হ'তো, কিন্তু যেই তিনি বাল্মীকি হলেন, তখন থেকে তাঁর ঘুম চলে গেল। তাই বাল্মীকিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়
তাঁরে দেয় বেদনা অপার, তাঁর নিত্য জাগরণ।

কথাটা কেন অমায়িক গোপীনাথ কবিরাজ বললেন বুঝলাম। বিভু মহারাজ যে সময় বললেন, 'সব শিল্পীই বাজানর জন্য টাকা চায়, কিন্তু যতীনদা বাজাবার জন্য এক কথায় রাজী হয়েছেন। টাকার কথা বলেন নি।' এই কথা শুনে, মা'র আশীর্বাদ নিয়ে এবং গোপীনাথ কবিরাজকে প্রণাম করে চলে এলাম তুলসী মন্দিরে।

কাশীতে তুলসী মন্দিরে, মহন্ত অমরনাথ মিশ্র মৃদঙ্গ নিয়ে আমার সঙ্গে সময় হলেই বাজাতেন। মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজিয়ে নিজেও আনন্দ পাই। ধ্রুপদ, ধামারের সঙ্গে মৃদঙ্গের যে প্রকারের সঙ্গত হয়, সেই সঙ্গতের পরিবর্ত্তন করলাম যা বাবার কাছে শিখেছি। প্রথমে সওয়াল জবাব এবং পরে মাঝে মাঝে সাথ সঙ্গত। তারপরনের কাজ, শেষে সেই সওয়ালের জবাব। মৃদঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতের একটা নূতন ধারার প্রবর্তন করলাম। যন্ত্রে কেউ মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজায় না। বাবা, এবং হাফিজ আলী খাঁ মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজাতেন শুনেছি। তবে বাবা যে ভাবে সঙ্গত করতেন, এ ঢঙ্গে কেউ বাজাতেন না। আমি সেই ঢঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজাতাম। মাঝে মাঝে মহন্ত অমরনাথ মিশ্রের সঙ্গে ঘরোয়া আসরে বাজাতাম। বাবার সঙ্গে পত্রের যোগাযোগ রাখতাম। তুলসী মন্দিরে আছি জানিয়ে বাবাকে একটা চিঠি দিলাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১২-৬-৫৭

কল্যানবর,

শ্রীমান যতিন তুমার পত্র পেয়ে শুখি হলেম, তুমার কুশল মঙ্গল কামনা করি। হাৎরস পত্রিকায় তুমার সম্বন্ধে গত মাসের পত্রিকায় পরিলাম। খুব ভাল করে সর উৎপাদন কর। ওরা লিখেছে খুব মিজ্রাপের কাজ দেখিয়েছ, কিন্তু রস এবং গুনিপনা কিছুই লিখে নাই, এজন্য মনে করি শ্রুতারা বিশেষ আনন্দ পায় নাই। শ্রুতারা চায় সুরের রসস্বাধ্, কেবল জুবার বড় ২ আঘাৎ দিয়ে বুল তান দিয়ে বাজাইলে শ্রুতা মণ্ডলি সুখি হবে না। বাদকের এবং গায়কের চাই শ্রুতা মণ্ডলিকে আনন্দ দান করা। যখন তবলার সঙ্গে সাৎ সঙ্গৎ হবে তখন শ্রুতাধিগকে, লয়ের দ্বারায় ও সুরের দ্বারায়, বুল তানের দ্বারায় আনন্দ দান করা। তা যদি করতে পার তবে নিজেও আনন্দ পাবে, পরকে আনন্দ দিতে পারিবে। তার জন্য চাই ভাল বাদকের সঙ্গে বাজানো, তুমার কাছে ত ভাল বাদক প্রস্তোৎ আছে, শ্রীমান আসোতোষ দাদুর সঙ্গে রূজ বাজাবে, তুমার দুস গুন সে বিচার করিবে, দাদুর মদ্ধে এই শক্তী আছে, শুধু কেবল তবলা বাদক নয়, দাদু সঙ্গীৎ বুঝে। বাঙ্গালি জাতির মদ্ধে দাদুই এখন প্রথম স্থান পেয়েছে, আমিও দিয়েছি তাকে প্রথম স্থান, আমার জাতির গৌরব তার দীর্ঘ জিবন কামনা করি।

আমার কথা জানাই, আমার কাছে এখন প্রাইভেট ছাত্র ১০-১৫টি বর্ত্তমান, তাদেরে দৈনিক শিক্ষা দিতে হয়, এর সঙ্গে ব্যণ্ড আছে, ধ্যানিসকে নিয়ে এসেছি, তিমিরের ছেলে আছে, দক্ষীনেশ্বরের ধীরেন আছে। আর কয়টি এসেছে দ্বারভাঙ্গা, উত্তরপারা, কাশমির,

লঙ্কা (কাণ্ড), বরিশাল, এসব পঙ্গপাল নিয়ে আছি। ডাইন পা ও কমর, ডাইন হস্ত বাতের প্রকুপে খুব দুঃখ্য ভুগ করিতেছি। ডাক্তারি ভাল চিকিৎস্বা করিতেছি, ৬ মাস যাবত ভিটামিন ঔষধ সেবন করে চলাফেরা করতে পারি। ২-১ দিনের মদ্ধে ৫০০ শত শক্তীর ভিটামিন ইংজেকসন আরম্ভ হবে। ১৬ একর জমি খরিদ করেছি লোহার লাঙ্গল মটরে চাস আরম্ভ করেছি, সাবে ৫০০ টাকা চাসের জন্য দিতে হবে। আর ৩০ একর জমির জন্য দরখাস্ত করেছি, যদি পাই তবে ভাল চাসি হতে পারব মনে করি। লোহা সিমেন্ট পাই নাই বলে ঐ টাকা দিয়ে জমি করিতেছি। অন্নপূর্নার বাটি চারধিগে প্রাচীর হয়ে গেছে। তুমার মা ভাল আছে তার আসিবর্বাদ নিবে, শ্রীমান আসো দাদুকে আমাদের আসীবর্বাদ জানাবে। একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি। সাধন কর সিদ্ধ হবে।

ইতি—
আলাউদ্দিন।

জানি না সঙ্গীত পত্রিকায় আমার বাজনার কি সমালোচনা বেরিয়েছে। বাবা পড়েছেন। বাবা সেই সমালোচনা পড়ে নিজের মন্তব্য করেছেন। বাবা যখন যাকে চড়ান সেও এক পরীক্ষা। আশুতোষকে মস্ত বড় সমালোচক বলেছেন। বাবার ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে, সবশুদ্ধ ছেচল্লিশ একর জমি কিনেছেন। যদিও চিঠিতে ষোল একর জমির কথা লিখেছেন, কিন্তু পরে আরো তিরিশ একর জমি কিনেছিলেন। বাবা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলে আজ সেই জমির ফসল বিক্রি করে বাবার পুত্রবধূ এবং নাতিদের বাৎসরিক ভালই আর্থিক সংগতি হয়।

বাবার কাছে কত জ্ঞানের কথা শুনেছি। কিন্তু কাশীতে এসে এবং বাইরে বাজাতে গিয়ে কত গোপন সর্ষেফুল দেখতে পাচ্ছি। বাবা বলতেন, 'সবাই সৎ হোক।' বাবার এই কথা অনেককে বলেছি। কিন্তু এই কথা শুনে অনেককে বলতে দেখেছি, আজকের যুগে যখন সব কিছুতেই ভেজাল, তখন সৎ থাকবো কি করে? সেইজন্য সততার রাস্তা না ধরে সবাই নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কেউ বা খোসামোদ করে, কেউ বা ঘুষ দেয়। কার্য্যোদ্ধার করাই এ যুগের সকলের ব্রত। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না। রেগে যাই। আমার শুভাকাঙ্খীরা বলে, 'রাগলে কোন কাজ করা যায় না জীবনে। ধীর স্থির ভাবে সব কাজ করতে হবে। নইলে উন্নতি করা যায় না।' অন্যায়ের সঙ্গে যারা আপোষ করে তাদের আমি মানুষ বলি না। এই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করি নি বলে অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে গিয়েছি। ক্ষতি অনেক হয়েছে। অবশ্য তার জন্য আমার দুঃখ নাই। প্রায় নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হয়। মানুষ কত বদলে যাচ্ছে। মানুষের সংসার যেমন মানুষেরই ধার ধারে না, তেমনি মানুষের ভালবাসারও ধার ধারে না। কারণ আজকাল প্রীতির চেয়ে প্রয়োজনই আজ মানুষকে সব চেয়ে বেশী গ্রাস করে ফেলেছে। প্রয়োজনই আজ সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। অবাক হই, আজকাল মিথ্যার বেসাতি বেড়ে গেছে দেখে।

বাবার কাছে দেখেছি, সোজা কথা বললে তিনি খুশী হতেন। মৈহার ছাড়ার পর

দেখলাম, যখন মনে কোন মতলব থাকে, আজে বাজে কথা বলে মতলবটা ঢাকা রাখতে হয়। তারপর বাঁকা চোরা পথে অনেক সাবধানে আসল কথাটা পাড়তে হয়। তবেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই-ই নিয়ম। আসলে ভনিতা হবে, তারপর আসল কথা। এই রকম হলে বাবা বলতেন, 'এতক্ষণ ভেদ খুলেছে।' বাবা যেটা অপছন্দ করতেন, উপস্থিত দেখছি সেইটাই আজকাল, দুনিয়াদারী। এখন দেখছি, এ যুগের সঙ্গে যে তাল রাখতে পারবে না, সে নাকি যুগের স্রোতে শুকনো এঁটো কলাপাতার মত ভেসে যাবে। বাবার সর্বদাই এইখানে বিরোধ ছিল। বাবা বলতেন, 'আমি কেন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব? যুগই আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে।' যদিও সকলে বলেন যুগের সঙ্গে না চললে তলিয়ে যেতে হবে, তবুও বাবা মনে মনে ভাবতেন, তলিয়ে গেলেও তলাবেন কিন্তু আদর্শতো বাঁচবে। তাই বাজনার মধ্যে বাবা সর্বদাই শুদ্ধতা বজায় রাখতেন। কিন্তু কোথায় গেল সেই আদর্শ? আজকাল যে হাওয়া চলছে ভাবলেও মনে কষ্ট হয়। আজকাল দেখছি, বড় হতে গেলে কিছু স্তাবক, অর্থাৎ চামচে পুষতে হয়। প্রত্যেক বড়রাই এই বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করেছে। কিন্তু বাবার কাছে কখনও তো স্তাবক দেখিনি। এখন বুঝতে পারছি, কেন বাবা বলেছিলেন, 'মৈহারের বাইরে গিয়ে দেখবে পারটি পারটি।' যখন এই সব দেখি, মৈহারের সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মৈহারের খোলা আকাশের তলায় চিৎপাত হয়ে ঘুমোতাম। সে সব দিনগুলো যে কি আরামে কেটেছে তা ভাবা যায় না। সে সময় হয়ত অনেক জিনিষের অভাব অনুভব করেছি যা এখন হাতের মুঠোয়, তবুও বলব সেই দিনগুলো অনেক ভালো ছিলো।

কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ এ নিয়ে তর্কের শেষ নাই। ভাল মন্দের মাপকাঠিটা আজকাল ঘন ঘন বদলে যাচ্চে। মনে হয়, আমি যেটা ভালো বলে বিশ্বাস করি, সেটাই যে ভালো সেটা আমি কি প্রমাণ করতে পারি? আর খারাপ যেটাকে বলি, সেটাই তো দেখছি সমাজে 'বাহবা' পেয়ে সকলের মাথায় উঠে বসেছে। নিজেকে যাঁরা চিনেও চেনে না, পরকেও যে চিনতে পারবে না, এটা ধ্রুব সত্য। আজকাল দেখছি, মনের আড়াল হলেই মানুষ ভুলে যায়। মানুষের মন তো জলের দাগের মতো।

যে সময় একলা থাকি পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে। বুদ্ধিভ্রংশ হলে, মানুষ নিজের অমঙ্গল নিজে বুঝতে পারে না। বুদ্ধিভ্রংশ হলে, মানুষ নিজের অপরাধ ঢাকতে চায়। একই মানুষের মধ্যে কি দুটো বিরুদ্ধ চরিত্র একই সঙ্গে বাস করে। ইতিমধ্যে গুরুপূর্ণিমা এবং ঈদ উপলক্ষে বাবাকে চিঠি দিলাম। বাবার উত্তর পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৩-৭-৫৭

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতিন তুমার পত্র ও টেলি দুই পেয়েছি, ইদ মুবারক, গুরূপূর্ন মাসির আসিবর্বাদ গ্রহণ করিবে।

এখানে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়েছে এজন্য এখানের সাস্ত সকলেরই খারাপ। কলেড়া, বসন্ত, ইনফ্লীঞ্জা এসব রূপে আক্রান্ত হয়ে অনেক লোক মারা জাইতেছে। এখানে কুয়াতে জল

নেই, জলের অভাব, নানা রকম কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। তুমার ঔষধ সেবন করিতে সকলকেই বলিতেছি, কিন্তু আমার জন্য চিন্তা নেই এখন যত সিঘ্র যাইতে পারি এই কামনা করি।

তুমার মায়ের আসিবর্বাদ নেবে, একপ্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি
বাবা আলাউদ্দিন।

৪৬

দেখতে দেখতে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের নির্দ্ধারিত তারিখ আসতে দেরী নাই। তাঁর আগে দুইটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ কাশীতে এসেই সঙ্কল্প করেছিলাম, বিনা পয়সায় কোথাও বাজাব না, কারণ উপস্থিত এটাই পেশা। কাশীতে এসে দেখেছি সকলেই টিউসান করে অনেক উপার্জন করে। আমি সে রাস্তাটি প্রথম থেকেই এড়িয়ে গিয়েছি। কারণ দিন রাত শিক্ষা দিলে হয়ত টাকা পাব, কিন্তু সাধনায় বাধা আসবে। এ ছাড়া স্থির করেছি, যদি কাউকে শিক্ষাও দিই, তাহলে পয়সা নেব না। এ শিক্ষা আমার উস্তাদ বাবার কাছে পেয়েছি। তিনি বলতেন, 'যন্ত্রকে মায়ের মত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং যত্ন করবে।'

যাক, কলকাতায় তানসেন কনফারেন্সে যাওয়ার ঠিক যখন হোল বাবাকে চিঠিতে সব জানিয়ে আশীর্বাদ করতে লিখলাম। যথাসময়ে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
৮-৮-৫৭

কল্যানবর,

শ্রীমান তুমার পত্র পাইলাম, কলিকাতা তুমাকে নিমন্ত্রণ করেছে নির্চ্চয় যাইবে, সবর্বত্র জাইবে এজন্য আমাকে জানাবার কুন প্রয়োজন করে না, আকাষ, মর্ত্ত, পাতাল যেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসিবে সব জায়গায় জাইবে। ইউরূপ, টিওরূপ যেখানে থেকে ডাক পরিবে সেখানে যাইবে। আমার আদেস নেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, পৃথিবীময় যাইবার জন্য আদেস দিলেম, কলিকাতা হতে একজন গুরূঠাকুর সেতার শিক্ষার জন্য এসেছে, তাকে খাওয়া, পরা দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে, এই মাত্র এসে পৌঁছিয়াছে, তাকে দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাবার পর তুমায় পত্র লিখলেম। কি লিখেলেম জানি না বুঝে নেবে।

ভাল করে বাজাবে, হাবুল তাবুল বাজাবে না, কলিকাতা হল সঙ্গীতের বিচারের স্থান, শ্রূতারা মিষ্টি চায়, নতুনও চায় রাগ বিচার করে, আমার মতন রূখা বাদ্য বাজাবে না, আসিবর্বাদ করি সেখানে খুব নাম কর, তুমার বাজনা শুনে জেন সকলে আনন্দ পায়, এই আসিবর্বাদ করি।

একপ্রকার তুমার মঙ্গল কামনা করি,

ইতি—
আলাউদ্দিন

পোষ্টাপিসে ঘট করেছে পত্র পাও কিনা জানি না।

বাবা খুশি হয়ে অনুমতি দিয়েছেন। নানা উপদেশ দিয়েছেন। হয়ত লিখতেন কিন্তু কে একজন বেচারা শেখবার জন্য গেছে যাকে দেখে বাবার মাথা গরম। এখন কাকে বলবেন ভেদ লাগাও। বিদায় কর। সেইজন্য লিখেছেন কি লিখিলেম জানি না। বুঝে নেবে। মাসিক পত্রিকায় একটা ভুল সংবাদের জন্য বাবার কাছে ছেলেরা যায় খাওয়া থাকা নিশ্চিন্তে হবে বলে। মৈহার থাকাকালীন কত ছেলেকে আসতে দেখেছি। ভাবলেও দুঃখ হয়।

বাবা একজন ভুয়োদর্শী ছিলেন। অনেক দেখে, অনেক শুনে, অনেক ভুগে এক একজন ভুয়োদর্শী হয়। কিন্তু অনেকে আবার জন্ম সংস্কারের বশেই সংসারে ভুয়োদর্শী হয়ে জন্মায়। বাবা হলেন তাঁদের দলে। অনেক টাকার মালিক হলেই কেউ পুঁজিপতি হয় না কিংবা নিঃসম্বল হলেই কেউ সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়া হয় না। বাবার সব কিছু থেকেও নিজে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত মানুষ। ঐশ্বর্য তাঁকে স্পর্শ করতো না বলে পরের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করার মত অন্তঃকরণটা তাঁর ছিলো। কিন্তু তাই বলে নিজের বাড়িতে খাইয়ে পরিয়ে ছাত্রদের রাখবেন কি করে? বাবার মনের শান্তি বিঘ্নিত হবে বলেই কাউকে দেখলে ত্রস্ত হতেন।

বাবার চিঠি পেলেই মৈহারের দিনগুলো মনের মধ্যে ভেসে আসে। এক এক সময়ে মনে হয় মৈহারের সেই অতীত দিনগুলো কি ফিরিয়ে আনা যায় না? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় আগামীকালের সকাল কিংবা রাতটা যে দেখতে পাব তাই বা কে বলতে পারে? জীবনটা বোধ হয় বড় বিচিত্র এক নৌকো। ঘাটে ঘাটে ভিড়লেও কখন যে সে আঘাটার মধ্যেও গন্তব্যস্থলের আস্বাদ পায় তা কেউ বলতে পারে না। আমারও হয়েছে সেই দশা। তানসেনে বাজাতে যাব। এই বাজনার জন্য আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাজনাটা আমার কাছে গৌণ। যদিও এই বাজনার সঙ্গে বাবার সম্মান জড়িত কেননা ভাল না বাজাতে পারলে, লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে এই বাজনা শিখেছ এতদিন বাবার কাছে? এ কথা মাঝে মাঝে মনে হলেও আমার মন পড়ে আছে সেই রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে কেননা আমার ভবিষ্যৎ জীবন জড়িত আছে সেখানে।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। কোথা দিয়ে পুজো এলো এবং কোথা দিয়ে যে পুজো চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। কাশীতে পুজোর সময় প্রাচীন কাল থেকে সঙ্গীতজ্ঞরা নবরাত্রিতে নয় রাত্রি মাদুর্গার আরাধনা করে রাতভোর বাজায় শুনে এসেছি। কি মনে হোল জানি না আমিও নবরাত্রির নয় দিন রাতভোর বাজিয়ে সকালে দুর্গা দর্শন করব বলে স্থির করলাম। পুজোতে সকলেই আনন্দ করে। ঘুরে ঘুরে দেবীর দর্শন করে। কাশীতে এই সময় বহু লোকের সমাগম হয়। কিন্তু আমি নবরাত্রির নয় দিন তুলসী মন্দির ছেড়ে কোথাও বেরোলাম না। নয়দিন রাত ভোর বাজালাম। কি করে যে পুজো চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। মহন্তজীর বাড়ির কাছেই দুর্গার মন্দির। রাত ভোর বাজিয়ে সকালে দুর্গার দর্শন করে বাড়িতে এসেই ঘুমিয়ে পড়তাম। দেখতে দেখতে বিজয়া দশমী এল। বাবাকে চিঠি দিলাম। লিখলাম অনুমতি করলে বিজয়ার পর বাবার দর্শন করতে যাব।

বিজয়ার দিন বাড়ীতে আমার মায়ের কাছে গেলাম। বাড়ীতে বহুলোক এল। বাড়ীর থেকে ফেরবার সময় বুঝলাম পুজোর সময় কত ভিড় হয়। কিছু দিন পরেই বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৬-১০-৫৭

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তুমার পত্র ঐদ্য পাইলাম ঁঔ বিজয়ার আসিবর্বাদ গ্রহণ করিবে, মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তুমার মন কামনা পূর্ণ করুন, সঙ্গীত সাধনায় তুমার জীবন ধন্ন হক, কির্ত্তী জস লাভ কর। এই বৎস্বর আমার সময় খুব খারাপ যাইতেছে, ও জাইবে আত্যিয় সজন সব সত্রো হবে, সন্তান পর্যন্ত আমার সঙ্গে সদভাব থাকবে না এ জন্য তুমাকে নিষেধ করিতেছি, এই সময় আমার সঙ্গে দেখা না করাই সঙ্গত মনে করি। আমি যে কি অবস্তায় দিন কর্ত্তন করিতেছি তাহা ভগবান জানেন লিখে জানান অসাদ্ধ। শ্রীমান দাদু আসোতোষ ভট্টাচার্য কবিরাজকে আমার ঁঔ বিজয়ার আলিঙ্গন আসির্ব্বাদ জানাবে। তুমি সাধনা করতে জান না সাধনাতে তান মন ধন সব অর্পন কর, তবেই সিদ্ধ হবে। শিক্ষা যা পেয়েছ তাহা সাধনা করে উজ্জ্বল কর। তুমার মাতার আসির্ব্বাদ গ্রহন কর, এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি। শ্রীমান দ্যুতি কিশোর আচার্যকে তুমার কাছে নিয়ে যাও। আমার কাছে এর শিক্ষা হবে কি না ভগবান জানেন, এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি। ইতি—

আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পড়ে বুঝলাম পঞ্জিকাতে বাবা নিজের সিংহ রাশির ফলাফল দেখে মনে মনে চিন্তিত আছেন। মৈহারে থাকলে বাবাকে বলতাম, 'বর্ষফল যা লেখা থাকে তা ঠিক নয়।' মৈহার থাকাকালীন বর্ষফল দেখে বাবাকে চিন্তিত হতে দেখেছি। বাবাকে বুঝিয়েছি কিন্তু এখন কি করে বোঝাব। বর্ষফল খারাপ দেখে বাবা লিখেছেন, 'সন্তান পর্যন্ত আমার সঙ্গে সদভাব থাকবে না। এ জন্য তুমাকে নিষেধ করিতেছি এই সময় আমার সঙ্গে দেখা না করাই সঙ্গত মনে করি।' বাবার এই চিঠি পেয়ে মৈহার যাওয়ার চিন্তা স্থগিত করলাম। বাবার চিঠি পাবার কয়েকদিন পরেই দ্যুতি বেনারসে এসে হাজির হোল। দ্যুতিকে দেখে বললাম, 'তুমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে সঙ্গীত বিষয়ে স্নাতক হবার জন্য পড়াশুনা করো।' দ্যুতি আমার কথা মতো স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করলো এবং নিজের বাড়ীতে থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিয়েই জীবন কাটাতে লাগলো। চতুরদের কারসাজিতে মৈহারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত্যাগের পর থেকে দ্যুতিও বাবার পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি।

দেখতে দেখতে কোলকাতায় যাবার দিন এগিয়ে আসছে। কোলকাতায় যাবার কিছুদিন আগেই কাশীর হিন্দুস্কুলে অনোখেলালের সঙ্গে এই প্রথম বাজনা হোল। তাঁর কাছেই শুনলাম তানসেন সঙ্গীত সম্মীলনিতে আমার সঙ্গে বাজাবার জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। অনোখেলাল সেই সময় হিন্দু তবলিয়ার মধ্যে সবথেকে বেশী নাম করেছেন ভারতবর্ষে। কিন্তু শুনলাম কিছুদিন হোল তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে। তবুও তিরিকিটি, ধিরিকিটি এবং না ধিন ধিন না যে সময় বাজালেন আবহাওয়া যেন বদলে গেল। বাজনা হোল এবং সাথ

সঙ্গতও শুরু হোল। যতই হোক অনোখেলালের নাম তুঙ্গে এবং আমার মত নূতন একজনের সঙ্গে বাজাচ্ছে, কিন্তু গুরুর কৃপায় অনোখেলাল যে আমার বয়স কম বলে আমাকে ছোট নজরে দেখছিল, সে ভুল তার ভেঙ্গে গেল। তবে এ কথা ঠিক এমন নিরভিমানি শিল্পী সত্যই দেখা যায় না। কাশীতে বাজাবার কিছুদিন পরেই কোলকাতায় গেলাম। কাশী থেকে কবিরাজ আশুতোষও গেল কেননা শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় অপেশাদার শিল্পী হিসাবে আশুতোষকে প্রতিবছরই ডাকতেন এবং সকলের সঙ্গে বাজাবার সুযোগ করিয়ে দিতেন। যেমন বাবা, আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে বরাবর বাজাবার সুযোগ পেতেন। সে সময় পেশাদার তবলা বাদকের মধ্যে কেরামত খাঁ এবং তরুণদের মধ্যে শ্যামল বোস এবং বিশ্বনাথ বোস ছিল। অপেশাদার তবলার মধ্যে হীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাবার সঙ্গে বাজাতেন। আর ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশ জলসায় বাজাতেন না। তিনি শুনলাম ছাত্রদের তৈরী করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তখন শ্যামল বোস এবং কানাই দত্ত তৈরী হচ্ছে। যদিও এঁরা পূর্বে অন্যের কাছে শিখেছে তবে বর্তমানে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে শিখছে।

প্রায় একবছর পর কোলকাতায় গিয়ে প্রথমেই আলিআকবরের বাড়ী গেলাম এবং সেখানে অন্নপূর্ণাদেবী, জুবেদা বেগম, আশিস, ধ্যানেশ, প্রাণেশ এবং অমরেশকে দেখলাম। আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবীকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম বাজাবার জন্য। আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'বাবার নাম স্মরণ করে বাজান।' কোলকাতায় গিয়ে ভাবলাম সরোদের চামড়াটা কোথায় বদলাব। কবিরাজ আশুতোষের ছোট ভাই সন্তোষ সেই সময় কোলকাতায় একটা সাড়ীর দোকানে কাজ করত। সন্তোষ আমাকে হীরেন রায়ের দোকানে নিয়ে গেল। হীরেন রায় চামড়া বদলে দিলেন, কিন্তু হাজারো বলা সত্ত্বেও টাকা নিলেন না। আমাকে ঋণী করে রাখলেন। সেই সময় আমার সুরের কোন রেশ থাকত না। সেই খারাপ সরোদেই বাজাতাম। সাতান্ন সনের ডিসেম্বর মাসটা আমার কাছে স্মরণীয় দুটো কারণে। প্রথম কারণটা বাজনা। আমার বাজনার দিন আলি আকবর, অন্নপূর্ণাদেবী এবং বাড়ীর সকলেই বাজাবার সময় সামনে উপস্থিত ছিলেন। নিখিল সকলের সঙ্গে বসে আছে। আলিআকবরকে বললাম, আসর ছেড়ে চলে যেতে কারণ তাঁর সামনে বাজাবার দুঃসাহস ছিলো না, বাজালে সেটা হ'তো অহঙ্কার। পরে শুনেছিলাম আমার কথায় আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাস্তায় লাউড স্পীকারের সাহায্যে গাড়ীতে বসে আমার সম্পূর্ণ বাজনা শুনেছিলেন। অন্নপূর্ণাদেবী আমার শিক্ষাগুরু। তাঁর কাছে আমার ঋণের অন্ত নাই। তাই তাঁর উপস্থিতিতে আমার বাজাবার কোন অহঙ্কারের প্রশ্নই ওঠে না। জীবনে এই প্রথম এবং শেষ অন্নপূর্ণাদেবীর সামনে প্রকাশ্য সম্মেলনে বাজনা বাজিয়েছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলে রাখি, ভোর রাত্রে শেষ প্রোগ্রাম বাজাতে কোলকাতার ইন্দিরা সিনেমায় বাজাতে গেলাম। হলের বাইরে লাউড স্পীকারে গান শুনতে পেলাম এবং সিনেমার দুই ধারের ফুটপাত থেকে সড়ক পর্যন্ত সব সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে মেয়ে এবং বৃদ্ধ চাদর পেতে কম্বল গায়ে দিয়ে বাজনা শুনছেন। আমার কাছে এ এক পরম বিস্ময়। এত লোক দেখে,

যেমন ভীত হলাম তেমনি মনে মনে স্থির করলাম যে আমাকে এই আসরে ভাল বাজাতেই হবে, কেননা এতে বাবার সুনামের প্রশ্ন জড়িত। যদি তেমন ভাল বাজাতে না পারি তাহলে বাবারই দুর্নাম। আর বাবার দুর্নাম মানেই আমার মৃত্যু। বাবার কথা স্মরণ করে মনে প্রচুর বল পেলাম। সে বাজনা যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁদের অনেকের মুখেই শুনেছি যে সবাই নাকি বলেছিলো এ উস্তাদ বাবার যোগ্য শিষ্য। কিন্তু আমি জানি এঁর রহস্য। বাবার কাছেই আমি এঁর তালিম পেয়েছিলাম। বাবা বলতেন, 'প্রথম প্রথম বড় বড় তবলা বাদকেরা তোমাকে ছোট ছেলে ভেবে তবলা পিটতে শুরু করবে। নিজের বাহাদুরি দেখিয়ে যখন তোমাকে অতিক্রম করতে চাইবে, তখন তুমি, নানান রকমের প্যাঁচের তালিম যা শিখিয়েছি তাই বাজাবে।' বাবার সেই প্যাঁচ সে দিন কাজে দিল। ঘনঘন হাততালিতে হল ভরে উঠল। বাজাবার পরই রেডিওতে দ্বিতীয় দিন সকালের অধিবেশনে আমার বাজনা রিলে করে শোনান হবে জানান হোল। বাজিয়ে উঠেই প্রথমে অন্নপূর্ণাদেবীকে প্রণাম করলাম এবং নিজের বাসস্থানে সরোদ রেখেই আলি আকবরের কাছে গেলাম আশীর্বাদ নিতে। আলি আকবর এবং সকলেই সবে বাড়ী ঢুকেছে। আলি আকবরকে প্রণাম করতেই, আলি আকবর বলল, 'এতদিন বাজাচ্ছি। এতদিন বাজিয়ে যে নাম করেছি তুমি তো দেখছি প্রথম দিন বাজিয়েই সেই নাম করলে।' আলিআকবরের পা ধরে বললাম, 'সবই বাবার কৃপা।' কথাটা অপ্রিয় হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এর পরের দিনই অনোখেলালের বাজানোর কথা ছিল আলিআকবরের সঙ্গে। আলিআকবর টেলিফোন করে শৈলেন ব্যানার্জিকে বললেন, 'যতীনের সঙ্গে আনোখেলাল বাজাতে পারেনি সুতরাং আমার জন্য আশুতোষকে সঙ্গত করবার জন্য দেবেন।' আশুতোষ এ কথা শুনে বললেন, 'আরে এ কি কথা! এত বড় বাজিয়ে আনোখেলাল।' যাইহোক শেষ পর্যন্ত আলিআকররকে আশুতোষ রাজী করালেন এবং আনোখেলালই বাজালেন। দ্বিতীয় দিনে সকাল এগারোটার সময় আমার বাজনা হোল। রেডিওতে রিলে করে শোনান হোল। আমার সঙ্গে তবলায় আশুতোষ বাজাল। এই প্রথম দিনের ভাল বাজনাই আমার জীবনে কাল হোল। আমি আমার সর্বনাশ ডেকে আনলাম। সেই বাজনার পর থেকেই আজ পর্যন্ত আমার স্বগোত্রের লোকেরাই আমার বিরুদ্ধে যে কত কথাই রটাতে লাগল এবং আমার প্রোগ্রাম নাকচ করে দিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

তানসেনে বাজাবার পর একদিন আলি আকবরের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা হোল। তখন কথাসূত্রে আমি বললাম, 'অন্নপূর্ণাদেবীর দাম্পত্য জীবনের অশান্তির সমস্যা তো একমাত্র আপনিই সমাধান করে দিতে পারেন, কারণ এ সমস্যার সমাধান না হলে বাবার জীবন সংশয় ঘটবে। তাতে আমরা কেউ নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। এবং তাতে আমরা সকলেই বাবার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবো। আমার কোলকাতায় পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই এক প্রশ্ন করেছেন আমাকে, প্রশ্নটা হোল এই যে, স্বামী রবিশঙ্কর থাকতে অন্নপূর্ণাদেবী কেন নিজের দাদার কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে নিযুক্ত আছেন? মজার কথা, এই অভিযোগগুলো আপনি, রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবী থাকতেও আমার কাছে উত্থাপন করে। আমার একটাই উত্তর। আমি তাঁদের এই উত্তর দিই যে, কোন মানুষ বিখ্যাত

হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অখ্যাতি রটে।' আলি আকবর সব শুনলেন। বললেন, 'কিছুদিন যেতে দাও তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।' মৈহার যাবার পর দেখেছি, প্রতিবছর বাবা, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর কোলকাতার সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এই প্রথম দেখলাম একমাত্র আলি আকবর ছাড়া বাবা এবং রবিশঙ্কর এবারে অনুপস্থিত।

আলি আকবরের বাড়ীতে দেখলাম, নিখিল রোজ আলি আকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে তালিম নিচ্ছে। কোলকাতায় এসে একটা অভিজ্ঞতা হোল। দেখলাম পরিতোষণ গুণ একটা আর্ট বিশেষ। মহৎজন তাকালেও ক্ষুদ্রজনের কপাল ফেরে। তোষামোদ যে করে আর যে তাতে তুষ্ট হয়, দুজনের মনের তারে মিল হওয়া চাই। অমিলটা জলের উপর তেলের মত চোখে লাগে। আমি সেই মিলটা কোনকালেই বুঝি নি। মেলানর আর্ট জানা থাকলেও মনের থেকে কখনও সাড়া পাই নি।

অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'যদি সম্ভব হয় বাবার মুখ চেয়ে অন্ততঃ এতদিন যেমন সব দুঃখ কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন, কাউকে মনের কথা জানতে দেন নি, সেইরকম মুখ বুজে সহ্য করে যান নইলে বাবাকে আমরা হারাব।' অন্নপূর্ণাদেবী চুপ করে আমার কথা শুনলেন। মনে হোল এ যেন আর এক অন্নপূর্ণাদেবী। চোখে জল বেরোয় না, শরীরে বোধ হয় রক্ত নেই নইলে চোখ দিয়ে রক্ত বেরোত। এখন জলও বেরোয় না, রক্তও বেরোয় না। বুকটাকে পাথর করে ফেলেছেন।

কথা প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবীকে বিমান ঘোষের চাকরির বরখাস্তর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'পণ্ডিতজী ব্রডকাস্টিং মিনিস্টার ডাক্তার কেসকারকে বিমান ঘোষকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবার জন্য বলেছিলেন। বিমান ঘোষের কাছে এই সংবাদ পেয়ে আমি এক পত্র লিখে বিমান ঘোষের প্রতি সুবিচার করতে অনুরোধ করি। এও লিখেছিলাম বিমান ঘোষের যদি কোন অপরাধ থাকে তাঁর সত্যাসত্য সমস্ত কিছু যাচাই করে তবেই যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনার পরই ডাক্তার কেসকার পণ্ডিতজীর অনুরোধ সত্ত্বেও বিমান ঘোষকে পদে বহাল রাখতে স্থির করেন।' এই কথা শুনে বুঝলাম অন্নপূর্ণাদেবী যদি ডাক্তার কেসকারকে এই অনুরোধপত্র না লিখতেন তাহলে বিমান ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা বিমান ঘোষ আমাকে মৈহারে লেখে নি। লিখেছিলেন রবিশঙ্কর চক্রান্ত করা সত্ত্বেও চাকরি যায় নি। অন্নপূর্ণাদেবীর মুখে সব ঘটনা শুনে ব্যাপারটা বুঝলাম।

এরপর যে প্রলয় আমার উপর দিয়ে ঘটে গেল সেই কথাই বলি। এবারে পাড়ি দিলাম রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে। মহারাজ আমাকে দেখে খুব সাদর সম্ভাষণ করলেন। প্রথমেই বাবার সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। আমাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি ফটো উপহার দিলেন। বাবার কাছেও এইরকম একটা ফটো দেখেছি যা মহারাজ বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। পরে যখন আমার আজীবনের স্বপ্নের কথা বললাম, মহারাজ এক কথায় বললেন, 'এরকম কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। আমাদের এখানে ছাপাখানা আছে। আমাদের যত বই লেখা হয় তা এই ছাপাখানাতে ছাপা হয়। এখানে গানবাজনার কোন

ব্যবস্থা নেই। আর একটা কথা, আপনি যে বাবার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, সেইটাই এখন চালিয়ে যান, তাতেই আপনার অভিষ্ট লাভ হবে এবং আপনার গুরুর নামও দিক বিদিকে বিস্তার লাভ করবে। তাতে মানুষের উপকার হবে।' এই কথা শুনে আমার মনের মধ্যে তুফান শুরু হয়ে গেল। আমার এতদিনকার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল। আমার ধারণা ছিল ঠাকুরের সামনে সাধনা করব এবং আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা মহারাজ করে দেবেন। কিন্তু মহারাজের কথা শুনে মনে হোল আমার জীবন ধারণের জন্য সঙ্গীত ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তাই এত বড় আঘাত পেয়েও মনে কোথা থেকে জোর এল জানি না। প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে হোক সঙ্গীতই হবে আমার একমাত্র সাধনা। নিজেকে জানতে হোলে সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমি নিজেকে জানতে পারব এবং নিজের চেয়েও যে বড় তাঁকে জানতে পারব। এই প্রথম কঠোর রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ। এখন শুধু বাঁচার প্রশ্ন, ইজ্জতের প্রশ্ন, প্রয়োজনের প্রশ্ন। এতদিন যে জগতে বাস করেছি সেটা এখন রুদ্ধ দ্বার। এখন অন্য জগতে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু সেই জগৎ আমার কাছে অজ্ঞাত।

মনে হোল এ বড় কঠিন জগৎ। সংসারে অনেকে অনেক কিছুই চায়, কিন্তু পাওয়া? পাওয়াটা বড় বাস্তব সত্য। তাই যদি হয় তাহলে অবাক হই কেন? জীবনে এই প্রথম বড় আঘাত পেলাম। যে ইচ্ছা তিল তিল করে মনের মধ্যে সাজিয়েছিলাম, একটা কথার ফুৎকারে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সবই নিয়তি, ভেবে লাভ নেই। আমরা নিমিত্ত মাত্র। যা হয়ে গেছে তাঁকে ফেরানো যাবে না। সুতরাং এখন ভাবা দরকার কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। একটা নতুন চিন্তা মাথায় ঘোরাঘুরি করছে। সংসার তো সবাই করে, চাকরিও তো সবাই করে। জঙ্গলের একটা জানোয়ারও পেট চালাবার উপায়টা জানে। তা হলে লেখাপড়া শিখে, এত কষ্ট করে বাজনা শিখে অন্য লোকের সঙ্গে তফাৎটা কোথায় রইল? দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে কেউ থাকা মানেই বন্ধন। যার কেউ থাকে না সেটা একটা বড় গুণ। সে তখন থেকে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু এতদিনকার স্বপ্ন যে এমন ভাবে ভেঙ্গে যাবে তা ছিল আমার কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু তখন আমি জানতাম না যে পৃথিবী তলে তলে এক ভূগোল সৃষ্টি করে চলেছে। ভূগোলের রং বদলাতে শুরু করেছে নিঃশব্দে। যা ছিল সবুজ, তা সমস্তই তখন বুঝি লাল হতে শুরু করেছে। শুধু ভূগোলই বা কেন, ইতিহাস কখন মানুষের কলমে নূতন করে লেখা হয়ে চলেছে আর এক নূতন কালিতে। একের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে বহুর। বড়র সঙ্গে ছোটর, ভেতরের সঙ্গে বাইরের, মতবাদের সঙ্গে মতবাদের বিরোধ। এই অবস্থা দেখে আমি হতবাক। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

কোলকাতায় এসে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতা হোল। সে কথাই এবারে বলি। আমার যে সময় মনের এই অবস্থা, আলিআকবর আমাকে বলল, 'আমার এক জায়গায় সকালে বাজনা আছে। যাবে?' সানন্দে সম্মতি জানালাম। কথায় কথায় জানলাম মন্মথনাথ ঘোষের বাড়ীর সামনে এক ঘড়িওয়ালাবাবুর বাড়ীতে বাজনার আয়োজন করেছেন মন্মথনাথ ঘোষ। এই নামটি মৈহার থাকাকালীন শুনেছিলাম বাবার কাছে। মনে পড়ে গেল অলবেঙ্গল কনফারেন্সের কর্ণধার মন্মথনাথ ঘোষ-এর কনফারেন্সে নিজের ভুলের জন্য আলি আকবর

একবার বাজাতে পারে নি। যাই হোক আলি আকবরের কথায় সেই আসরে উপস্থিত হলাম। যে মুহূর্তে গাড়ী থেকে নামলাম, দেখলাম এক ভদ্রলোক আলি আকবরকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর বললেন, 'তোমার বাবার এক শিষ্য এবারে তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনিতে বাজিয়েছে, তাঁকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।' আলিআকবর আমাকে দেখিয়ে আমার পরিচয় দিলেন। আমাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'সামনের বাড়িটা আমার। আগামীকাল সকালে এখানে এসো।' দুটো বাড়ী দেখেই বুঝলাম বাড়ীর মালিক খুব আভিজাত্যপূর্ণ এবং ধনী। আলিআকবরের কাছে জানতে পারলাম, ভদ্রলোকের নাম মন্মথ নাথ ঘোষ। যদিও অল বেঙ্গল বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বহু সঙ্গীত সংস্থানের পৃষ্ঠপোষক উনি। ঘড়িওয়ালাবাবুর বাড়ীতে প্রথমে মীরা ব্যানার্জির গান হবে এবং তারপর আলি আকবরের বাজনা হবে। মীরা ব্যানার্জির গান হোল। গানের পর মীরা আলি আকবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আমার গানের দোষ ত্রুটি কি হোল বলুন?' জবাবে আলি আকবর বলল, 'আমি তো পরের দোষ দেখতে পাই না। নিজের দোষই কেবল দেখতে পাই।' মীরা বলল, 'আপনি তো এড়িয়ে যাচ্ছেন।' আলি আকবর বলল, 'সত্যই বলছি।' এই কথা বলে নিজের সরোদে হাত লাগালেন। আলি আকবরের কথা শুনে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু মনে ভাবলাম এই উত্তরটা বিনয় না আন্তরিক কথা। যদি আন্তরিক কথা হয় তাহলে এই কথার তুলনা নেই। বাবার উপযুক্ত ছেলের মুখেই এ কথা সাজে। আলি আকবরের বাজনা হোল।

বাজনা শুনবার পর বাবার কথা মনে হোল। বাবা বলতেন, কোলকাতার সঙ্গীত রসিকরা রাগের রস বিচার করে, আয়তন বিচার করে না। বিচার করেন তাঁর রসবস্তু। কথাটা যথার্থই মনে হোল। আলি আকবরের সঙ্গে ফিরে এলাম।

পরের দিন মন্মথনাথ ঘোষের বাড়ী গেলাম। বাড়ী দেখে মুগ্ধ হলাম। ভারতবর্ষের সব গুণী প্রাচীন সঙ্গীত শিল্পীদের তৈল চিত্র দেখে ভাল লাগল। বাবারও ছবি দেখলাম। মন্মথ ঘোষের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বললেন, 'আগামী বছর আমার পিতার মৃত্যুতিথিতে বাজনার আয়োজন করবো। তিনদিন সঙ্গীতের আয়োজন আমার বাড়ীতে হবে। তার মধ্যে একদিন তোমাকে বাজাতে হবে।' মন্মথনাথ ঘোষ এত ধনী অথচ এত অমায়িক দেখা যায় না। সানন্দে সম্মতি জানালাম। তাঁর সেই দিনের ভালবাসা আমার সঙ্গে একই প্রকার ছিলো। কাশীতে তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম পাটনা থেকে ফিরে এসে। পরের দিন যখন সুরেশ সঙ্গীত সংসদের হিসাবরক্ষক-এর সাথে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ীর সকলে চলে গেছে। অবশ্য এ অনেক পরের কথা। কাশীতে মন্মথনাথ ঘোষ যখনই নিজের বাড়ীতে যেতেন, আমাকে খবর পাঠাতেন। আমি দেখা করতাম, ঘণ্টা দুই গল্প হ'তো।

কোলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনে অনেকের গান এবং বাজনা শুনলাম। জানি না কেন বাবার কথা মনে হোল। বাবা সারাজীবন শিক্ষা করে বিরাট একটা ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিক হয়েছিলেন। সাবান, তেল, চাল থেকে শুরু করে পান, সুপুরি খয়ের পর্যন্ত ছিলো। এমন কি হ্যারিকেন, টর্চ, ব্যাটারি, কব্জা, পেরেক পর্যন্ত ছিলো। মানুষের যা প্রয়োজনীয় সব জিনিসই তাঁর ভাণ্ডারে ছিলো। এতবড় ভ্যারাইটি স্টোর্স আমার জীবনে আর কোথাও দেখি

নি। বাবার তুলনায় সকলের মধ্যে ছোট একটা মুদির দোকান দেখেছি। অবশ্য এ মুদির দোকানই বা কজনের আছে। এরজন্য যে মূলধন দরকার হয় তা কজনের আছে? আজকাল যাঁরা বড় যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ, তাঁরা বাবার ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে মাল নিয়ে নিজের বাপ দাদার জিনিস বলে বেচে। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এ কার দোকানের মাল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করে না। কিন্তু যাঁরা বোঝবার তাঁরা ঠিকই বোঝে।

এখন আমার কাছে সমস্যার পর সমস্যা। কিন্তু সমস্যা যখন আছে তেমনি তার সমাধানও আছে। কিন্তু সমস্যার পরিণাম মর্মান্তিক। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

কত কিছুই তো দেখলাম কোলকাতায়। কথায় আছে মেয়েমানুষের দুঃখ মেয়েমানুষই বোঝে। কথাটা কিন্তু সত্য নয় সর্বক্ষেত্রে। বহুক্ষেত্রে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার প্রমাণ ঘরেতেই আছে। যাঁরা একজনের কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ তাঁরাই বদনাম করে আনন্দ পায় দেখেছি। কেচ্ছা ছড়াবার লোকের অভাব নাই। যে বাড়ীতে ঠিকে ঝি রাঁধুনির কাজ করে, সে বাড়ীর ভেতরের খবর আর গোপন থাকে না। সত্যই যদি গোপন খবর প্রকাশ পায় তাঁর জন্য দেওয়া চলে না। কিন্তু এখানে ঠিক তার উল্টো। যাঁরা সবচেয়ে ঋণী তাঁরাই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে একটা খবর কতরকমভাবে অতিরঞ্জিত করেছে তা ভাবলেও ঘৃণা হয়। মানুষ এত অকৃতজ্ঞ কেন? সামনে দেখায় ভক্তি আর পিছনে মন্থরার মন্ত্রণা কুটিল। ইতিহাসে যদিও বলে ধাত্রী পান্না নিজের সন্তানকে বলি দিয়ে প্রভু পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন কিন্তু এখন ইতিহাস উল্টো পথে চলেছে।

আর একটা নূতন অভিজ্ঞতা হোল কলকাতায় এসে। আজকাল ভাবপ্রবণতার যুগ নয়। কথায় আছে, 'সেন্টিমেন্টালস আর গ্রেট ফুলস্।' কিন্তু ভাবপ্রবণতা কি খারাপ? ভাবপ্রবণতা না থাকলে সঙ্গীতের মধ্যে রস কি করে আসবে? অবশ্য এ সব সেন্টিমেন্টের আজকাল তথাকথিত যাঁরা বড়, তাঁরা কেউ ধার ধারে না। এ সবের পাট তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বুঝেছে বড় হতে হবে। তার জন্য পিট চুলকানি যাকে বলে সেটাই হোল উপায় অর্থাৎ নিজের মতলব হাসিল করবার জন্য কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। কথায় আছে কাক, বারবণিতা, ব্রাহ্মণ আর সঙ্গীতজ্ঞ এঁরা স্বজাতির শত্রু হয়। বুঝলাম জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না। বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়। কিন্তু বাবার মধ্যে তো কখনও এই ভাব দেখি নি। আজকাল দেখছি শঠতার দ্বারা পরস্পরকে হেয় করার বারবার চেষ্টা করে। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। তখন কি জানতাম আরো কত অভিজ্ঞতা লাভ করা আমার কপালে লেখা আছে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম যেখানে সমাজ, সেখানেই দল। যেখানে লোকের বসতি সেখানেই গোলযোগ, সেখানেই পক্ষ্যাপক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা। যেমন এক হাতে তালি বাজে না, তেমনি দলাদলি না থাকলে কথা ওঠে না। কথা উঠলেই পরিচয়, স্বপক্ষ সহজেই হয়। সে সময়ে কে কোন পথে, কে কোন দলে বোঝা যায় না। কিন্তু সত্যের রাস্তায় চললে নিকৃষ্ট দলাদলি হয় না আমি বিশ্বাস করি। যাক এবার আমার কোলকাতা থেকে কাশী যাওয়ার সময় হয়েছে। বছরের শেষ দিনে কাশী যাত্রা করলাম।

৪৭

নদী যেমন আপন মনে এগিয়ে চলে তখন সে কেবল পেতে চায়। পেতে পেতেই সে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। দু কূলের নতূন নতূন ক্ষেত্রকে পেরিয়ে সে পুলকিত হয়ে ওঠে বলেই কল-কল শব্দ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে যায়। যখন এমনি করে যেতে যেতে সে সমুদ্রকে পেয়ে যায় তখন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

কাশীতে এসে তুলসী মন্দিরে বাজাবার সময় ঘরের থেকে গঙ্গা দেখতে পেতাম। বাবা প্রায় বলতেন, সঙ্গীত সমুদ্রের লহরের মত নিজের আনন্দে চলে যাবে।' যদিও কাশীতে সমুদ্র নেই কিন্তু বাজাবার সময় প্রবাহিনী গঙ্গাকে দেখলেই বাবার কথা মনে পড়ে। কোলকাতা থেকে কাশীতে আসার কিছুদিন পরেই মনে হোল, সঙ্গীত বড় হিংসুক স্ত্রী। সে সতীন সহ্য করতে পারে না। তাই যখন সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলাম, তখন আর কোন দিকে নজর দেবার সময় ছিল না আমার। আমার মন থেকে তখন সঙ্গীতের সব কিছু মুছে গিয়েছে। সত্যি কি মুছে গিয়েছে? এ যন্ত্রণার কথা কে বুঝবে? সামনে শুধু পড়ে আছে অক্লান্ত পরিশ্রম, নিদ্রাহীন রাত, এবং অবিরাম সংগ্রাম। আমি জেনে শুনেই বিষ খেলাম। আমি জানতাম আমার কপালে নিন্দা, শত্রুতা আর অনিশ্চয়তার খাড়া পাহাড় মাথা উঠিয়ে আছে। তবু নিষ্ঠা আর একাগ্রতা দিয়ে আমাকে জয় করতে হবে। জয় করতে যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা জেনেও আমি সেদিন সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেদিন ভালো করেছি কি মন্দ করেছি তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে। নিজের মনে মনেই বলি, মৈহার ছাড়ার আগে বাবা যে আমায় বলেছিলেন, 'মৈহারে তো কিছু বুঝতে পারছো না, বাইরে যখন বাজাতে যাবে দেখবে পার্টি-পার্টি, কেবল পরনিন্দা, আর পরচর্চা।' সত্যই এখন দেখছি মৈহার ছিল যেন স্বর্গলোক। আর মৈহার ছেড়ে এসে মনে হচ্ছে যেন নরকে এসেছি। যাক একদিক থেকে বাঁচোয়া, মহন্তজীর এখানে তুলসী মন্দিরে পরনিন্দা, পরচর্চার বালাই নেই। কিন্তু একদিন শুক্রবারে শহরে গিয়ে কবিরাজ আশুতোষের দোকানে দুপুর এবং রাত্রে গেলেই বুঝতে পারি সঙ্গীতের মধ্যে কত রাজনীতি। কত গায়ক, বাদক দোকানে আসে। তাঁদের কথোপকথন শুনি, আর মনে মনে ভাবি আর অবাক হই। এই প্রথম বুঝতে পারি দুনিয়াটা। যত খোলামেলা রূপ দেখায় তা তো নয়। কত কি চাপা দিয়ে রাখতে হয়।

মৈহার ছাড়বার পর নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি কার আঘাত যেন সজোরে আঁচড় দিয়ে যায়। বুঝে দিক বা না দিক রক্ত ঝরবেই। যাত্রার শুরুতে যে খুশীর পথে পাড়ি জমিয়েছিলাম শেষটুকু যে এমন হবে ভাবিনি। কেন জানি না, ঘুরে-ফিরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কথাই মনে পড়ে। একটা করে দিন যায়, যত আশা ততো আশঙ্কা। যত উদ্দীপনা তত উৎকণ্ঠা। কিন্তু এ কি হোল? কি কথা শুনলাম প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে? ভিতরে যত আগ্রহ বাইরে তত নিস্পৃহতার প্রলেপ। এতদিনের জ্বালান প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভে গেল। অনুশোচনার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য মিতালি। আমার জীবনের সব কিছুই ওলট পালোট হয়ে গেল। এরপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে সংঘর্ষ। নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ, আবার নিজের

সঙ্গে পরের। আসলে এর পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গেই সংঘর্ষ বাঁধবে। নইলে মাঝে মাঝে মনে হলেও সময় যে কি করে ভুলিয়ে দেয় বুঝি না। তাই সব ভোলানো সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। হঠাৎ শুনলাম বাঙালী-দাদা বলে কেউ ডাকছে। বুঝলাম ভোরে স্বপ্ন দেখছিলাম। এ না হলে পুরনো কথা কেন মনে আসবে। মহন্তজীর বাড়ীর সকলেই, এমনকি বাড়ীর চাকরটা পর্যন্ত আমাকে বাঙালীদাদা বলে ডাকে। ধড়মড়িয়ে উঠলাম। মুখ-হাত ধুয়ে বাজাতে হবে। একটা সময় ছিল যখন অনেক স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু পরে অনুভব করেছি এই পৃথিবীটা নাটক নভেল করার জায়গা নয়। স্বপ্ন দেখারও জায়গা নয়। সুতরাং নিত্য নৈমিত্তিকের মত বাজাতে বসলাম। দুপুরে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

১৯ তাং

কল্যানবর,

শ্রী মান বাবা যতীন তুমার পত্র পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমার শরীর অসুস্ত থাকার দরুন উত্তর দিতে পারি নাই।

ঐদ্য ভাল আছি এই জন্য কুন প্রকারে লিখিলাম। বিশেষ চিন্তা করিবার কারণ নাই এক প্রকার তোমার মঙ্গল কামনা করি।

ইতি—

বাবা আলাউদ্দিন

কোলকাতায় বাজাবার পর বাবাকে চিঠি দিয়েছিলাম। বাবা তার উত্তর দিয়েছেন। বাবার চিঠিটা পড়ে বুঝলাম বাবার শরীর খারাপ ছিল।

কাশীর সঙ্গীত মহল উপস্থিত আমাকে মান দিয়েছে। কাশীতে সরোদ বাদক একমাত্র আমিই। কিছুদিনের মধ্যেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের একজন অধ্যক্ষ এসে আমাকে বলল যে সঙ্গীত বিভাগের প্রিন্সিপাল ওঙ্কারনাথ ঠাকুর আমার বাজনা শুনতে চান। তবলায় সহযোগীতার জন্য কিষণকে বললাম। নির্দিষ্ট দিনে মহন্তজী, আশুতোষ, গুল্লুজী এবং কিষণ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগে বাজালাম। ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বাজনা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। জানি প্রশংসার কোন মূল্য নেই তা সত্ত্বেও বললাম, 'আপনার মত গুণীর সামনে বাজান কি সহজ?' ওঙ্কারনাথ ঠাকুর হেসে বললেন, 'কেন, আমি কি বাঘ নাকি?' এ কথা শুনে কিষণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা তো বাঘকে গুলি করে মারি।' ওঙ্কারনাথ এ কথা শুনে কিষণকে বলল, 'তুম বনারসী হো। তুম লোগো কা সব বাত হি নিরালা হ্যায়।' এ কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম। ওঙ্কারনাথ আমাকে বললেন, 'উপস্থিত সঙ্গীত বিভাগে ডিমনস্ট্রেটারের পোষ্ট খালি আছে। পরে লেকচারারের এবং রীডারের পোস্ট হবে। ভবিষ্যৎ এ ডীন হবে। উপস্থিত সঙ্গীত বিভাগে, সরোদের ক্লাস হয় না শিক্ষকের অভাবে। সুতরাং আপনি যোগদান করুন।' উত্তরে আমি বললাম, 'উপস্থিত কলেজে শিক্ষকতা করার ইচ্ছে নেই, কারণ কলেজে শিক্ষকতা করলে সাধনায় বিঘ্ন হবে।' আমার কথা শুনে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা সম্মানের।'

উত্তরে বললাম, 'আপনি প্রবীন। আপনার কোন বাধা নেই। কিন্তু আমি সঙ্গীত জগতে সবে প্রবেশ করেছি। উপস্থিত আমার সাধনার প্রয়োজন। তবে একটা কথা শিক্ষকতা সম্বন্ধে বলছি, আপনি বলছেন শিক্ষকতা করা সম্মানের কিন্তু প্রথমে শিক্ষার্থীকে কোর্স অনুসরণ করে শেখান মানে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া।' মৈহারে আমি যেসময় ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলাম সেখানের কোর্স সম্বন্ধে বিস্তার পূর্বক বলে বললাম, 'বাবার কাছ থেকে চলে এসেছি সাধনা করার জন্য।' আমার কথা শুনে ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুর বললেন, 'ভেবে দেখুন কয়েকদিন। তারপর, আমাকে বলবেন। শিক্ষকতার লাইনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' উত্তরে বললাম, 'ঠিক আছে।' আমার শুভাকাঙ্খী আশুতোষ বার-বার বললেন, 'কলেজের মাসকাবারি নির্দিষ্ট আয় ছেড়ো না। কলেজে তো বিকেল তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত ক্লাস। কেবল ফাঁকির ক্লাস। বাকী সময় সাধনা করো।' কিন্তু আমি রাজী হলাম না। আর ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের কাছেও গেলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেওয়া আমার ঘোরতর আপত্তি। কেননা কলেজে কেমন শিক্ষা দেওয়া হয় সেই প্রসঙ্গে বাবার কাছে আমি অনেক গল্প শুনেছি। বাবা লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে রতনজানকারজীর অনুরোধে পরীক্ষা নিতে গিয়ে যে সব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, সেই সব কথা শুনে বরাবরই স্থির করেছিলাম এ লাইন আমার জন্য নয়। সংঘর্ষই আমার জীবন। তাকেই আমি গ্রহণ করব। কষ্ট পেলে কেষ্ট পাব। কিন্তু তাতে মনে শান্তি পাব। এ যদি না করি, তাহাল এতদিন বাবার মত লোকের কাছ থেকে কি শিখলাম?

কাশীতে এবং বিহারের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কিষণের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমার প্রোগ্রাম হতে লাগল। বাজিয়ে যে টাকা পাই তাতে আমার চলে যায়। ইংরেজী নূতন বছরের প্রথমে বাবাকে চিঠি দিয়েছিলাম আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। সে চিঠির উত্তর এতদিনে এল। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
২৮-১-৫৮

কল্যানবর,

শ্রীমান যতীন তুমার পত্র পাইলাম পবিত্র দিনের আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমার মন যেন পবিত্র থাকে এই আসির্ব্বাদ করি। আমার সব এক প্রকার সান্তী অসান্তী উভয়ই ভূগ করিতেছি, খুদার কৃপা চাই একপ্রকার তুমার কুশল কামনা করি

ইতি—
আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পড়ে বুঝলাম মনের অশান্তির কথা। বাবার কথা ভেবেই মনে হোল প্রয়োজন হলে রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করব। যদিও আলিআকবরকে বলেছি। কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য আছে। দেখা যাক সেদিন কবে আসে। দেখতে দেখতে চারটে মাস যে কোথা দিয়ে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। আমেদাবাদ থেকে আমার দাদার চিঠি পেলাম। দাদার দুই

ছেলের উপনয়ন উপলক্ষে আমাকে মা'কে নিয়ে আমেদাবাদে যাবার জন্য লিখেছে। পড়লাম বিপদে। মনে-মনে স্থির করেছি বাজনা ছাড়া কোন জায়গায় বেড়াতে যাব না। নিজের জীবনে কয়েকটা সিদ্ধান্ত যা নিয়েছিলাম আজও তা পালন করি। বাজনা ছাড়া তখনই যাব যদি কোন আত্মীয় স্বজনের বিপদ হয়। কিন্তু দাদার ছেলের উপনয়নে যাওয়াও প্রয়োজন। স্থির করলাম আমেদাবাদ যখন যেতেই হবে অগত্যা দাদার বাড়ীতে শ্রোতার সামনে বাজাব। মা'কে নিয়ে আমেদাবাদ গেলাম। আমেদাবাদে গিয়ে বাবাকে একটা চিঠি দিলাম। এ ছাড়া দাদার নাম দিয়ে যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছিল সেই নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠালাম। আমেদাবাদে দাদার এক বন্ধু সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন। আমার কথা দাদার কাছে শুনে আমেদাবাদে জনৈক এস.পি.ঝালার বাংলোয় বাজনার ঘরোয়া আসরের আয়োজন করেছিলেন। ঠিক হোল উপনয়নের কাজ শেষ হবার পর বাজাবার দিন নির্দিষ্ট করব। চিঠি পেলেই বাবা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেন। আমার দাদাকে বাবা চিঠি দিয়েছেন। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রিয় মহাশয়

সবিনয় নিবেদন এই আপনার পুত্র অলোক কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীমান অশোক কুমার ভট্টাচার্যের উপনয়ন হবে জেনে অতিসয় আনন্দিত হলাম। প্রার্থনা করি ভগত কৃপায় মঙ্গল মতে উপনয়ন সম্পন্ন হক। ব্রহ্ম জানাতে ব্রাহ্মণপদ লাভ হক, চিরজিবী হক এই আশির্ব্বাদ করি।

ইতি—
আলাউদ্দিন খাঁ

বাবার চিঠিতে তারিখ দেওয়া নেই। তারিখ লিখতে বাবা প্রায় ভুলে যান। মৈহার থাকাকালীন বাবা কখনও তারিখ না লিখলে মনে করিয়ে দিতাম। যদিও বেশীর ভাগ চিঠিতে তারিখ লিখতেন। কিন্তু ভুলও হয়ে যেত। এ চিঠিতেও বাবা তারিখ লিখতে ভুলে গেছেন।

উপনয়ন হয়ে যাবার পরই, সংবাদ পত্রে দেখলাম বম্বেতে দ্বৈত যন্ত্র সঙ্গীত হচ্ছে আলিআকবর এবং বিলায়ৎ খাঁর। এই সংবাদে অবাক হলাম। যদিও সিদ্ধান্ত করেছি বিনা বাজনায় কোথাও যাব না, কিন্তু বম্বে যাওয়াটা ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম দীর্ঘ তিরিশ বছরে চার পাঁচ বার বিশেষ কারণে হয়েছে। উপনয়নের পরের দিনই বম্বে যাত্রা করলাম। স্কুল জীবন থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত প্রতিবছরই গরমের ছুটিতে বম্বে যেতাম। বম্বেতে দাদার একটা ফ্লাট ভাড়া নেওয়া ছিল। দাদা বম্বেতে কাজে গেলে সেই পুরোনো ফ্লাটেই থাকতো। দীর্ঘ এগারো বছর পরে শিবাজী পার্কের সেই পুরোনো ফ্লাটেই গিয়ে উঠলাম। সঙ্গীতের উদ্যোক্তা হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনের ব্রিজনারায়ণকে টেলিফোন করে জানতে পারলাম, আলিআকবর উঠেছে ওয়ালডরফ হোটেলে। খবর নিয়ে হোটেলে পৌঁছলে আলিআকবর আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে জানলে আমি এই হোটেলে আছি।' আলি আকবরকে আমেদাবাদ থেকে আসার সব ঘটনা বললাম। দেখলাম শিপ্রা ব্যানার্জিও এসেছে বাজনা শোনার জন্য। আলি আকবরকে দেখে দুর্বল মনে হোল। শুনলাম একটু জ্বর

হয়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম বেশ গরম। একই দুই ডিগ্রীর উপরেই হবে। আলি আকবর আমাকে বললো, 'বিলায়েৎ-এর ছাত্র অরবিন্দ পারিখের বাড়ি যাব। সেখানে বিলায়েৎ আসবে। দুজনে একটু বাজাব। তুমিও চল আমার সঙ্গে। রবুর ইচ্ছা নয় আমি বিলায়েৎ-এর সঙ্গে বাজাই। তা সত্ত্বেও বাজাচ্ছি। মানে রবুর মনে আঘাত লাগবে।' মৈহার থাকাকালীন শুনেছিলাম দিল্লীতে যখন তিনজনের বাজনার অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন দলবাজী হয়। তাই আলি আকবরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একে আপনার জ্বর তারপর বাজনা বাজিয়ে বৃথা বিপদের সৃষ্টি হবে।' আমার কথা শুনে গম্ভীরভাবে আলি আকবর বলল, 'যন্ত্র নিয়ে যখন বসি সে সময় আমি ভুলে যাই না আমি কার ছেলে?' শিপ্রা ব্যানার্জি হোটেলেই রইল। আমি আলি আকবরের সঙ্গে অরবিন্দ পারিখের বাড়িতে গেলাম। বিলায়েৎ এবং তাঁর ছোট ভাই এমরাতকে কখনও দেখিনি। আলিআকবর আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম তবলায় দুজন সঙ্গত করবে। একজন হোল বম্বের নিজামুদ্দিন দ্বিতীয়জন হোল নিখিল ঘোষ। একটা জিনিস লক্ষ করলাম বিলায়েৎ এবং এমরাত খাঁ আলিআকবরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। অরবিন্দ পারিখ ও তাঁর স্ত্রীর ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। কথা হোল কি রাগ বাজানো হবে? আলিআকবর বিলায়েৎকে বললেন, 'গৌরি মঞ্জুরি' বাজাবে? এই রাগটির স্রষ্টা হোল আলিআকবর। মৈহারে থাকাকালীন শুনেছিলাম, বিলায়েৎ খাঁ যোধপুরে থেকে কিছুদিন আলিআকবরের কাছে শিখেছিল। কথাটা সত্য। এ না হলে আলিআকবর কি করে বলবে 'গৌরিমঞ্জুরি' বাজাবে নাকি? উত্তরে বিলায়েৎ খাঁ আমতা-আমতা করে বলল, 'একবার আপনার তৈরী রাগটা বাজিয়েছিলাম। বড়ে গুলামআলি খাঁ রাগটি শুনে বলেছিলেন, 'মিশ্র রাগ বাজিও না।' কথাটা শুনে আমার হাসি পেলো। বুঝলাম রাগটা সেতারে বাজান কঠিন বলেই বড়ে গুলাম আলির অজুহাত দিল। পরক্ষণেই অরবিন্দ পারিখের গায়িকা স্ত্রী আলিআকবরকে অনুরোধ করে বললো, 'আপনারা যাই বাজান না কেন, ইমন এবং দরবারী বাজাতেই হবে।' এই কথা শুনে আলিআকবর বললো, 'ঠিক আছে।' এবার বিলায়েৎ আলিআকবরকে বলল, 'দাদা তাহলে এক কাজ করা যাক। প্রথমে ইমনে আলাপ বাজিয়ে দেশ রাগে গৎ বাজাব। তারপর দরবারী কাম্বাড়ার আলাপ বাজিয়ে ভৈরবী রাগ দিয়ে শেষ করব।' আলিআকবর মৃদু হেসে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে।' ইমনে আলাপ জোড় হোল। এবার বিলায়েৎ আলিআকবরকে জিজ্ঞেস করল, 'দেশ এ বিলম্বিত কি গৎ বাজাবেন?' উত্তরে আলিআকবর একটি বিলম্বিত গৎ বাজাল। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলেও বিলায়েৎ সেই গৎটি সেতারে তুলতে পারল না। আলিআকবর ব্যাপারটি বুঝে বিলায়েৎকে বলল, 'তোমার নিজের বিলম্বিত গৎ বাজাও। আমি তোমাকে অনুসরণ করবো।' এই কথা শুনে বিলায়েৎ নিজের গৎ বাজাল এবং আলিআকবর তাঁকে অনুসরণ করল। আচমকা হঠাৎ বিলায়েৎ খাঁ দুজন তবলাবাদককে বলল, 'গৎ বাজাবার সময় সুন্দর ঠেকা লাগাবে। অযথা পেটাপেটি করবে না। ইশারা করলে একটু-একটু বাজাবে এবং দ্রুত এর অংশে ঝালার শেষ যখন হবে তখন তারপর যেন ভুলেও একটা ধা বাজাবে না।' এই কথা বলার পর বিলায়েৎ আলিআকবরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা দ্রুত গৎ কি বাজাবেন?' আলিআকবর দ্রুত গৎ

একটা বাজাল, কিন্তু বিলায়েৎ খাঁ দ্রুত গৎটা সেতারে তুলতে পারল না। অবস্থা বুঝে আলিআকবর বিলায়েৎকে বলল, 'তুমি তোমার দ্রুত গৎ বাজাও আমি তোমাকে অনুসরণ করবো।' বিলায়েৎ খাঁ নিজের গৎ বাজাল এবং আলিআকবর তাঁকে অনুসরণ করলো। দুজনেই ঝালা বাজাতেই হঠাৎ বিলায়েৎ আলিআকবরকে বলল, 'দাদা ঝালার শেষ তিহাইটা একসঙ্গে শেষ করতে হবে। তিহাইটা কি রকম বাজিয়ে শেষ করবেন?' আলিআকবর একটা তিহাই বাজাল। কিন্তু বিলায়েৎ তিহাইটা একসঙ্গে চেষ্টা করেও বাজাতে পারল না। এবারও আলিআকবর সেই কথা বললো বিলায়েৎকে, 'তুমি তোমার তিহাই বাজাও আমি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে শেষ করবো।' এরপর দরবারীর আলাপ বাজিয়ে ভৈরবীতে আলিআকবর বিলায়েৎকে অনুসরণ করলো। আমি নির্বাক শ্রোতা হয়ে বসে আছি। অপ্রিয় সত্য হলেও এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মনে হোল বিলায়েৎ-এর ডান হাতের স্ট্রোকের আওয়াজ জোরদার। রিয়াজী হাত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিভার অভাব মনে হোল। বাজনার শেষে বিলায়েৎ নিজের ভাই এমরাতকে বলল, 'দেশের আর একটা গৎ ভুলে যাচ্ছি, কি গৎটা, বাজাও তো?' এ কথা শুনে এমরাত সেতারটা নিয়ে দেশের অন্য একটা গৎ বাজাল। আলিআকবর হঠাৎ তবলাটা নিয়ে ঠেকা দিতে লাগলো এবং সঙ্গত করতে লাগলো। একটি ঘরোয়া পরিবেশে সর্বসাকুল্যে আমাকে নিয়ে আট জনের মধ্যে অভূতপূর্ব ঘটনা। আমি অবাক, স্তম্ভিত। সত্যই বাবার উপযুক্ত পুত্র। আলিআকবর কত বড় নিরভিমানী শিল্পী, নইলে এমরাতের সঙ্গে তবলা বাজাতে গেল? রাত্রে বাজনা হোল অডিটোরিয়মে। বাজাবার আগে লতা মঙ্গেশকর এবং সেই সময়কার নামী অভিনেত্রী নলিনী জয়ন্ত আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করল। বাজনা শুরু হোল। আলিআকবরের সঙ্গে বাঁদিকে তবলা নিয়ে বসল নিখিল ঘোষ এবং বিলায়েৎএর সঙ্গে ডান দিকে বসল নিজামুদ্দীন। আলিআকবর একটু বাজিয়ে নিয়ে বিলায়েৎকে বাজাবার সুযোগ দেয়। কিছুক্ষণ পরে বিলায়েৎ আলিআকবরকে বললো, 'দাদা আপনি বাজান।' এ কথা শুনে আলিআকবর একটু বাজিয়ে বিলায়েৎকে সুযোগ দিল বাজাবার জন্য। এক সময় বাজনা শেষ হোল। দেখলাম বিলায়েৎ আলিআকবরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাজনার তুলনা করলে, আমার মনে হোল আলিআকবর হোল সমুদ্র আর বিলায়েৎ হোল ছোট একটা পুকুর। আলিআকবর আমার গুরুপুত্র বলে একথা বলছি না। বলছি আলিআকবরের শিল্প সমুচিত মানসিকতার জন্য। পরের দিন আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করে আমেদাবাদে চলে গেলাম। আমেদাবাদে একটি ঘরোয়া আসরে জনৈক এস. পি. ঝালা, বাজনার আসরের আয়োজন করেছিল। সেখানে বাজিয়ে কাশী ফিরে গেলাম।

কাশীতে আসার কিছুদিন পর কবিরাজ আশুতোষের সঙ্গে ছাপরায়, বাঙ্গালী কালীবাড়ীর অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে বাজাতে গেলাম। ছাপরার বাঙ্গালী এক প্রফেসর গোপাল দত্ত চৌধুরি এবং কয়েক পুরুষের বাসিন্দা রমেন মিত্র আমার কাছে সরোদ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করল। দুজনকে বললাম, 'সত্যই যদি বাজাবার ইচ্ছে থাকে তাহলে যতই কাজ থাকুক অন্ততঃ চার ঘণ্টা রোজ বাজাতে হবে। দুজনেই রাজী হয়ে বলল, 'কাশী গিয়ে আমরা শিক্ষা করে আসব।' বললাম, 'শিক্ষা তো করবেন, কিন্তু সরোদ দোকানে গেলেই পাওয়া যায় না।

সরোদের জন্য অগ্রিম জানাতে হবে। কম করেও বাজনা তৈরী হতে ছয় মাস লাগবে।' মৈহার যাবার আগে শুনেছিলাম সরোদ তৈরী করে গোপাল এণ্ড সন্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গত বছরে কোলকাতায় গিয়ে শুনেছিলাম গোপাল মারা গিয়েছে। বর্তমানে হেমেন এণ্ড কোম্পানি এবং নস্কর এণ্ড সন্স ভাল সরোদ তৈরী করে। গত বছর যে সময় প্রথম কোলকাতায় যাই, আলিআকবরের কাছে শুনেছিলাম, তাঁর এক ছাত্র হেমেন এণ্ড কোম্পানিতে, তাঁর কলেজের ছাত্রদের জন্য সরোদের অর্ডার দেয়। সেতারের জন্য হীরেন রায়কে অর্ডার দেয়। সে সেতার ভাল তৈরী করে। ছাপরার দুইজন শিক্ষার্থীর জন্য হেমেন এণ্ড কোম্পানিতে অর্ডার দিলাম। খবর পেলাম ছয়মাসের মধ্যে দুটো সরোদ তৈরী করে দেবে। ছাপরার দুই ছাত্রকে লিখে দিলাম সরোদ তৈরী হয়ে গেলে কোলকাতায় গিয়ে সরোদ নিয়ে তারপর যেন কাশীতে আসে।

কিছুদিনের মধ্যেই এ বছরের শেষে কোলকাতার তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বাজাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবলায় সহযোগিতা করবে কাশীর শামতাপ্রসাদ। সানন্দে সম্মতি জানালাম। বাবাকে চিঠিতে কোলকাতায় যাবার কথা এবং কাশীর খবরও জানালাম। বাবা চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছেন। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৩-৭-৫৮

কল্যানবর,

শ্রীমান যতিন তুমার পত্রে কণ্ঠ মহারাজের বিপদ শুনে বড় দুঃখিত হলেম, ভগবান এঁর মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা করি। এখানে ৪-৫ দিন যাবত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কিন্তু মুশল ধারে বৃষ্টি হয় নাই, ছিটা ফুটা পরেই বন্ধ হয়ে যায়। চাসবাস চলতে পারে। পুকুর গুলিতে জল জমা হয় নাই সামান্য জল মাত্র, পরে কি হবে ভগবান জানেন। দেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। জলের কষ্ট দেখে ও গরু মহিষের, বাচ্চাদের কষ্ট দেখে যাওয়া বন্ধ করিলেম। দিল্লীতে আসছে মাসে ১৮-১৯, রেডিওতে প্রগ্রাম রেখেছি। কলিকাতার সব প্রগ্রাম বন্ধ করেছি আর যাব না। অমরেস আমার কাছেই আছে কিন্তু পাচ দিন যাবৎ জ্বর হয়েছে। ঐদ্য ইংজেকসান দিয়েছি ঈশ্বর ইচ্ছায় সেরে যাবে। তুমার মায়ের আশীবর্বাদ জানিবে, তুমাদের কুশল কামনা করি। আমার বাদ্যের কদর দান খুকন বাবুকে দিল্লীর প্রগ্রামের কথা জানিয়ে দেবে।

ইতি—
আলাউদ্দিন

বাবার চিঠি পেয়ে বুঝলাম কোলকাতায় আর যাবেন না। তবে দিল্লীতে রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনে যাবেন। বুঝলাম বাবার মানসিক অবস্থার কথা। দিল্লী থেকে বাজিয়ে আসবার পর চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে চিঠি ছাপলাম না। এ ছাড়া বহু চিঠিই আমার কাছে আছে যা ছাপাব না, কেননা কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে কয়েকটা চিঠি ছাপালাম সে চিঠিগুলো হোল বাবার শিশু সুলভ চরিত্রের একটা দিক। যা পড়লে পাঠক-

পাঠিকা বুঝতে পারবেন। দিল্লী থেকে মৈহার ফিরে চিঠিতে বাবা জানিয়েছিলেন এই প্রথম রেডিওতে বাজাতে যাবার আগে কাউকে জানান নি কোন ট্রেনে যাচ্ছেন। উঠেছিলেন এক ধর্মশালায়। রেডিওতে বাজাবার একদিন আগে রেডিওতে গিয়ে চাপরাশির টুলে বসে মুড়ি খাচ্ছিলেন। রেডিওর পদাধিকারী বাবাকে দেখে অবাক। বাবাকে রেডিওতে বাজাবার জন্য গাড়ী কোথায় পাঠাতে হবে বলাতে বাধ্য হয়েই সরাইখানার ঠিকানা বলেছিলেন। রেডিওর তরফ থেকে থাকবার ব্যবস্থা করতে চাইলেও রাজী হননি। কেবল একটাই কথা বলেছিলেন শিষ্যের পয়সায় খেয়েছি বলে পাপ স্পর্শ করেছে। সকলের অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত কালীবাড়ীতে উঠেছিলেন কিন্তু শিষ্যের হাজার অনুরোধেও তাঁর বাড়িতে ওঠেন নি।

সময় নিজের গতিতে চলে যায়। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। রাত্রিতে গত বছরের মত এবারেও নয়দিন সারা রাত বাজালাম। তুলসী মন্দিরেই দিন রাত কাটালাম। ভীড়ের মধ্যে ঠাকুর দর্শন করতেও গেলাম না। সারারাত বাজিয়ে সকালে বাড়ীর কাছে দুর্গা দেবীকে দর্শন করে এসেই ঘুমিয়ে পড়ি। বিজয়ার চিঠি লিখলাম বাবাকে। বাবার আশীর্বাদ পত্র পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যানবর,

আমার ও তোমার মায়ের বিজয়ার আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। মা ভগবতি তোমাদিগকে চিরসুখে বাচিয়ে রাখুন এই আসির্ব্বাদ করি। মায়ের শ্রীচরন কৃপায় আমরা দুইজন খুব সুখ আনন্দে আছি। কোনরূপ কষ্ট নাই। আমরা দুই জনেই তুমাদের চিরসুখে বাচিয়ে রাখুন এই আসীবর্বাদ মায়ের শ্রী চরনে প্রার্থনা করি। আমরা ভাল আছি সদা সবর্বদা আমরা তুমাদের মঙ্‌গলকাঙ্ক্ষী, বেচে থাক চিরসুখে মা তুমাধিগকে বাচিয়ে রাখুন এই প্রার্থনা করি

ইতি—
বাবা আলাউদ্দিন, মা মদনমুন্ধরী

বাবা এবারের চিঠিতে তারিখ লিখতে ভুলে গেছেন। এবারের চিঠিতে বাবা, আলাউদ্দিন লিখেছেন। মায়ের হয়ে মা মদনমঞ্জুরি না লিখে মদনমুন্ধরি লিখেছেন।

বাবার এই চিঠি পেয়ে নিজের মনে নিজেকেই বলি মানুষের মন যখন সবুজ থাকে, নিষ্কলঙ্ক থাকে, তখন শুধু চোখ দিয়ে যা দেখে, মনে যা দেখবে তাই বিশ্বাস করে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে অভিজ্ঞতার পলিমাটি জমতে থাকে। তখন শুধু চোখ দিয়েই দেখে না, কান দিয়েই শোনে না, মন দিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখতে শুরু করে। কে যেন বলেছিলেন 'এভরিম্যান ইস এ ভলিউম, ইফ ইউ নো হাউ টু রিড হিম।'

কিছুদিন পরে বাংলা সংবাদপত্রে দেখলাম তানসেন কনফারেন্সে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের নাম বেরিয়েছে। গত বছর রবিশঙ্কর বাজায় নি, কিন্তু এবার নাম দেখলাম। সংবাদপত্রে সব গুণীশিল্পীদের সঙ্গে নিজের নাম দেখে মনে হোল যেন বাবার সুনাম রাখতে পারি। যাক এবারে কোলকাতায় গিয়েই বুঝব আলিআকবর কোন সুরাহা করতে পারে কিনা? একথা ঠিক যে রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করবে। ইতিমধ্যে

পথের পাঁচালি সিনেমা হয়েছে। রবিশঙ্কর আবহসঙ্গীত দিয়েছে। সংবাদপত্রে সত্যজিত রায়ের পথের পাঁচালির ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবহ সঙ্গীতের প্রশংসা ছড়িয়েছে। এ কথা বোঝায় তাঁর বৃহস্পতি তুঙ্গে।

যথা সময়ে কোলকাতায় গেলাম। কোলকাতায় গিয়ে আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করলাম। আলিআকবরের কথায় জানলাম এবারে রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলবে, যাতে আপোষ হয়ে যায়। দুজনে একসঙ্গে বাজাবে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা হোল। বাবার আশীর্বাদে আমার বাজনার সমালোচনা সংবাদপত্রে ভালই বেরিয়েছে। যদিও রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কিন্তু বাজনা শুনতে গেলাম। রবিশঙ্কর বাজানোর আগে গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গলের গানের সময় প্রথম সারিতে আমার জায়গা করে দিয়েছিলেন কনফারেন্সের সেক্রেটারি। গান চলছে। হল অন্ধকার। নিজের আসনে গিয়ে চুপচাপ বসলাম। হঠাৎ আমার পাশের সীটের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো?' অবাক হলাম প্রশ্ন শুনে। মনে হোল কিছুই যেন হয়নি। সুতরাং সরাসরি প্রশ্ন। অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে পারি রবিশঙ্করকে। উত্তরে বলি, 'ভালো।' রবিশঙ্কর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, 'বাবাকে যে চিঠি লিখেছিলাম সেটা পড়েছো কিনা?' বললাম, 'পড়েছি।' রবিশঙ্কর ভাবতে পারেনি যে বাবা আমাকে তাঁর লেখা চিঠি পড়িয়েছেন। মনে হোল, ছাড়া পশুকে খাঁচার দিকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে। বুঝতে পারলাম থ হয়ে তাকিয়ে আছে। মনে হোল অঘটন ঘটেই যদি জোরালো রকমেরই ঘটুক না। ভাঙ্গন যদি ধরেই হুড়মুড়িয়ে ভাঙ্গবে না হয় সব। আদর্শের ভরাডুবি যদি হয় তাহলেও পেছন ফিরে পালানটা ঠিক নয়। অন্যের মুখে রাজভোগ তুলে দিয়ে যাবার আগে সব ঝাঁঝরা করে দিয়ে যেতে হবে। না, রাগটা সংযত করলাম দুটো কারণে। প্রথম কারণ অন্নপূর্ণাদেবী। বাবার কথাই মনে হোল। যদি দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায় বাবা প্রাণ খুঁজে পাবেন। দ্বিতীয়তঃ এখন বাজাবে, মেজাজ খারাপ করবো না। এই চিঠি পড়ার প্রশ্ন দীর্ঘ বারো বছর ধরে নানা প্রসঙ্গের পরে জিজ্ঞেস করেছে এবং আমি একটাই উত্তর দিয়েছি, 'পড়েছি।' হঠাৎ রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'এই গানের পর বাজাব তাই যাচ্ছি যন্ত্র মেলাতে। বাজনা বসে শোনো এবং আগামীকাল আমার সঙ্গে ডি.সি. এমের গেস্ট হাউসে দেখা কোরো।' এই কথা বলেই রবিশঙ্কর উঠে গেল। গান শেষ হবার পর রবিশঙ্করের বাজনা শুনলাম। রবিশঙ্করের বলা সত্ত্বেও আমি স্থির করলাম দেখা করবো না, কারণ এর আগে বহু নাটক দেখেছি। নাটক দেখার আর ইচ্ছা নাই। কিছুদিন যাক তারপর দেখা যাবে।

তানসেনে বাজাবার পরই ডোভার লেনের সেক্রেটারি এসে দুটি সম্মেলনের জন্য আমায় টাকা দিয়ে গেলেন। একটি বাজাবো ডোভার লেনে আর একটি নতুন সংস্থায় বাজাতে হবে তাঁর জন্য। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সিনেমা অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা ভারতনাট্যম নাচবে। কয়েকদিন পর দুটি সম্মেলনের সমস্ত গায়ক বাদকের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত দেখে নিজের মনে আনন্দ হোল। যে দিন আমার ডোভার লেনে বাজনা, সেদিন দুপুর বেলায় তাড়াতাড়ি খেয়ে শোবার আগে আবার সংবাদ পত্রে নিজের নামটা দেখেছি। ইতিমধ্যে ডোভার লেনের সেক্রেটারি এসে বলল, 'দেখুন আপনার ঘরের লোকই চাইছে না আপনি

বাজান। বাধ্য হয়ে তাঁদের কথায় সম্মত হয়ে গতকাল রাত্রে সম্মেলনে আজকের কার্যক্রম সম্বন্ধে ঘোষণা করে দিয়েছি, আপনার জায়গায় নিখিল ব্যানার্জি বাজাবেন। আপনার দুটো প্রোগ্রামই নাকচ করার জন্য দুঃখিত। 'অবশ্য আগাম যে অর্থ দিয়েছি তা ফেরৎ নেবো না।' এই কথা শুনে, হঠাৎ আমার সব উৎসাহ ক্ষণিকের জন্য যেন ফোলা বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে ছোট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিকে বললাম, 'ঠিক আছে। এরজন্য আপনার সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নেই।' নত মস্তকে সেক্রেটারি চলে গেল। এই ঘটনার পর সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। মনে হোল যতক্ষণ মানুষ কাজ করতে পারে ততক্ষণই মানুষের কদর। যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণই আলোর কদর। অন্ধকার কেটে গেলে যখন সকাল হয় তখন আলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সকলের কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

উপরোক্ত ঘটনার পর থেকেই শুরু হোল আমার সংঘর্ষ। নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ। আবার নিজের সঙ্গে পরের। আসলে এরপর থেকেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেঁধে গেল এবং এখনও চলছে। এই সব হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজের মনে নিজের কাজ করে গেছি। কারো কাছ থেকে কোনও দয়া বা করুণা ভিক্ষা করতে বিবেকে বেধেছে। বরাবরই মনে হয়েছে দয়া ভিক্ষা করার মধ্যে একটা মানসিক নীচতা আছে। সাধারণ মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যাঁরা মিথ্যাকে অস্বীকার করে চলতে চায় তাঁদেরই হয় যত বিপদ। কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েই আমি সেদিন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সেই দিনই বুঝেছিলাম, ঈর্ষায় কাউকে উঁচুতে উঠতে দেখলেই তাঁকে নামাবার জন্য চেষ্টা করে এবং আনন্দ অনুভব করে। আমার মনের জোর আছে। শত্রুকে ভয় পাই না। কিন্তু সুযোগধারী মিত্রের থেকে রক্ষা পাওয়া অতি আবশ্যক। বাইরের শত্রুর থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ কিন্তু ঘরের শত্রুর থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তাঁর থেকে রক্ষা পাওয়া আরও কঠিন। আর হোলও তাই। সকলে নিজের দলবাজি করছে। আমার মনে হোল আজকাল অধিকাংশ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদেরই দেখি কুকাজে উৎসাহ এবং কুরুচিতে উল্লাস। নিজের মনের মধ্যে যে সময় এই সব চিন্তা করছি সেই সময় আমার কাছে এলেন এক বয়োবৃদ্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী। সব কথা শুনে বললেন, 'হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে গেলে যেমন আর হাইড্রোজেনও থাকে না, অক্সিজেনও থাকে না, জল হয়ে ওঠে, তেমনি সত্য মিথ্যে মিলে আর একটা তৃতীয় জিনিস হয়ে উঠেছে, তাঁর নাম টাক্‌ট্‌।

কিন্তু এ জিনিষ আমার জানা ছিলো না। বাবার কাছে বরাবর বলতে শুনেছি, 'সদা সত্য কথা বলবে। সত্যের কোন জাতিভেদ নাই। সত্যের কোন প্রথাভেদ নাই। সত্য চিরকালই সত্য।' কিন্তু এতদিনে নূতন অভিজ্ঞতা হোল, টাক্‌ট্‌ হোল আজকের যুগে সত্য। জীবনে উন্নতির আদি মন্ত্র গুপ্তই হোল টাক্‌ট্‌। যে তা জানে না সারাজীবন সে ব্যর্থ, আর যে জানে সে হয় সাকসেসফুল।

আমার কথা শুনে হেসে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বললেন, 'তোমার গুরুদেব হলেন নমস্য। তিনি যা বলেছেন তাই সত্য। যাঁরা এই টাক্‌ট্‌ করে বড় হয় তার শেষ পরিণতি ভাল হয় না। মনু সংহিতায় লেখা আছে, নিন্দাটাকে অমৃত আর স্তুতিকে বিষ বলে জানবে। নিজেকে

নিন্দা আর অপবাদের ঊর্দ্ধে রেখে নিজের কাজ করে যাওয়া উচিৎ। সঙ্গীতই একমাত্র পরকে আপন করে, দূরকে কাছে। যে জগৎ-এ থেকেও, জগতের অন্যান্য সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে সেই সঙ্গীতে প্রবেশ করতে পারে। যাঁরা বিপদের দিনে কখনও সাহায্য করে না, তাঁরাই শেষকালে উপদেশ দিয়ে উপকার করতে আসে। কেবল মুখের কথা দিয়ে উপকার। এই সব লোকের কথা মনে স্থান দেবে না।'

এই কথা বলে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী চলে গেলেন। তখন কি জানতাম ছাবিবশ বছর পরে এই কুকীর্তির ফল পাবে। সে যে কত বড় পীড়াদায়ক, মনে মনে বুঝেছি দীর্ঘদিন পরে। পাপের মাশুল মানুষকে একদিন না একদিন দিতেই হবে।

যে সময় আমার দুটো প্রোগ্রাম নাকচ হলো, ঠিক সেই সময় তবলাবাদক বিশ্বনাথ বোস আমার হোটেলে এসে দুইটি প্রোগ্রামে বাজাবার অনুরোধ করল। প্রথম প্রোগ্রামটি তাঁর নিজের বাড়ীর সঙ্গীত ভক্তদের সামনে ঠিক করেছে। অপর একটি প্রোগ্রাম সকালের অধিবেশনে ঠিক হয়েছে। সোনারপুরে আমার বাজনা এবং তারাপদ চক্রবর্তীর গান হবে। বিশ্বনাথ বোসের বাড়ীতে বাজাবার পর রামেশ্বরমের বৈশিষ্ট্য, শঙ্খের মত ঝিনুকে আমার একটা ফটো অঙ্কিত করে একটি বেডল্যাম্প উপহার দিল। জয়নগর সিনেমা হলে তারাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হোল। তারাপদ চক্রবর্তী নিজের ছেলে মানসকে নিয়ে গাইলেন। খুব ভালো লাগল। তারাপদবাবুর ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। আমার বাজনা শুনে বললেন, 'উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।' উত্তরে বললাম, 'এমন বলবেন না, আশীর্বাদ করুন যাতে গুরুর মত এক কণাও বাজাতে পারি।' সোনারপুরে বাজনা শুনে দমদমে এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে প্রোগ্রাম ঠিক হোল। সময় নির্দ্ধারিত হোল রাত্রি নটা থেকে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত। রাজী হলাম। নির্দিষ্ট দিনে দমদমে যেদিন বাজনা শেষ হোল রাত্রি একটার সময়, সব শ্রোতারা বলল, 'এই সময় ট্রেন, বাস পাওয়া যাবে না। কোথায় যাবো? সুতরাং দয়া করে সকাল অবধি বাজান। বাধ্য হয়ে ভোর পাঁচটায় বাজনা শেষ করলাম। বাজনা শেষ করে হাজরার হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরে আলিআকবরের বাড়ী গেলাম। দু পাঁচজনের কথা যখন দু'পাঁচশো বার ছড়ায় তখন রটনার পর্য্যায়ে দাঁড়ায়। প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক জনতা রটনার উত্তেজনা ভালোবাসে। সব জায়গায় একটু গুঞ্জন উঠেছে। আমাকে সব জায়গায় জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আলিআকবরকে গিয়ে বললাম, 'আপনদের তো কেউ কিছু বলে না কিন্তু সর্বসাধারণ তো আমাকে জিজ্ঞেস করে সেই এক কথা। অন্নপূর্ণা দেবী কেন আলিআকবর কলেজ অফ মিউজিকে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে আছেন? রবিশঙ্করের সঙ্গে কেন থাকে না?' চুপ করে আলিআকবর আমার সব কথা শুনে বলল, 'রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটমাট হয়ে গেছে। উপস্থিত কিছুদিন অন্নপূর্ণা কোলকাতার একটা ফ্লাটে শুভকে নিয়ে থাকে। বর্ত্তমানে আমার কলেজে যথারীতি শিক্ষকতা করবে। কিছুদিন পরে অন্নপূর্ণা এবং শুভর জন্য বম্বেতে একটা ফ্ল্যাট কিনে রবু তাদের সেখানে রেখে দেবে।' যাক, মিটমাট হয়ে গিয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আর একটা খবরও শুনলাম যে আলিআকবর নিখিলকে

সব আসরে নিয়ে বাজাতে সুযোগ দিচ্ছে। এবং সব জায়গায় যাতে প্রোগ্রাম হয় তার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তার একমাত্র কারণ আলিআকবর কলেজ অফ মিউজিক—এর নামও প্রচার হবে। একজনের পৌষ মাস আর একজনের সর্বনাশ। যাঁরা সুযোগ সন্ধানী তাঁরা ঠিক সুযোগ নিয়ে নেয়, আর যাঁদের বিবেক আছে, তাঁদের পক্ষে যোগাযোগ রাখাই সম্ভব নয়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলে রাখি, যদি রবিশঙ্করের সঙ্গে মনোমালিন্য না হ'তো তাহলে নিখিলকে কেউ চিনতে পারত না। আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর শিক্ষার গুণে নিখিলের নাম হোল। আলিআকবর নিখিলের ভারতবর্ষের সব শহরে বাজনার সুযোগ করে দিল। এ ছাড়া বিদেশেতে সে সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় কলেজ খুলল। নিখিলকে বিদেশের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিলো।

এবারেও অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শিক্ষা করতে বিবেক বাধা দিল। মনে হোল, এই মানসিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা করে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। যদিও খবর পেলাম নিখিল রোজ রাত্রে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে নিয়মিত শিখছে।

৪৮

দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে নতুন বছর পড়বার আগে তানসেন কলা কেন্দ্রের সেক্রেটারি তাঁর নিজের সঙ্গীত ভবনে আমার সরোদের প্রোগ্রাম রাখলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গত করল বিশ্বনাথ বোস। বাজানোর পর আমাকে একটা মানপত্র দেওয়া হোল। এই আসরে আমার একটি পরিচিত ছেলেকে দেখলাম যার সঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্বে কাশীতে আলাপ হয়েছিল। সে একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। কোলকাতার ছেলে, নাম নাদু চ্যাটার্জী। নাদু দুই বছর তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে আমার বাজনা শুনেছে। নাদুর একান্ত ইচ্ছে পরের বার কোলকাতায় এলে মহিম হালদার স্ট্রীটে তার বাড়ীতে যেন উঠি। নিচের তলার একটা ঘরে আমায় রাখবে এবং আমার সঙ্গে তবলা বাজাবে এবং শিখবে। নাদু বর্তমানে আধুনিক গানের সঙ্গে তবলা বাজায়। নাদু জোর করে পরের দিন তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেল। নাদুর আন্তরিকতা দেখে বললাম, 'পরের বার কোলকাতায় এলে তোমার এখানেই উঠব।'

এবার আলিআকবর, অন্নপূর্ণাদেবী এবং বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করে কাশী চলে এলাম। কাশীতে এসেই দেখি এলাহাবাদ রেডিও থেকে প্রোগ্রাম দিয়েছে। বাবাকে কোলকাতার সমস্ত ঘটনা জানিয়ে লিখলাম, 'দয়া করে আমার রেডিওর বাজনা শুনে ভুল ত্রূটি জানাবেন।'

মৈহার ছেড়ে কাশীতে দুই বছরের উপর এসে তুলসী মন্দিরেই আছি। ঘরে বসে গঙ্গা দেখতে দেখতে এক এক সময় মনে হয়, এ যুগে সাধুতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং কর্মনিষ্ঠার কোন দাম নেই। অসাধুতা, মিথ্যাচারণ এবং সেই সঙ্গে চাটুকারের মত তোষামোদ যাঁরা করতে পারে, তাঁদেরই জয়জয়কার। ধাপে ধাপে তারাই উঠে যায়। নিজের মনে মনে বলি, মিথ্যাচারণ, চাটুকারিতা ইত্যাদি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিকটজন ভুল বুঝলে তার চাইতে দুঃখের আর কিছুই থাকে না। তখন মনে হয়, যে দূরকে হারাতে নিকটকে আশ্রয় করলাম সেটা আশ্রয় নয়, বনস্থল। কেন আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটলো? মৈহারে যতদিন ছিলাম ততদিন

অনেককে চিনতে পারিনি, কিন্তু মৈহার ছাড়ার পর অনেকের স্বরূপ আমার চোখে ধরা পড়ল। ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল এলো তো এলো, গেলো তো গেল। কিন্তু যাঁরা কেরামতি দেখাতে পারে ভেড়ার মত তাঁর দিকে সকলেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। এ শিক্ষা তো বাবার কাছে পাই নি। মৈহারের চিন্তাধারা এবং এখানকার চিন্তাধারার কত প্রভেদ। জুয়া, মদ, মেয়ে নিয়েই আজকাল অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞদের কারবার। এই সব অন্যায় দেখে যদি কেউ প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'যুধিষ্ঠির জুয়া খেলেছিলেন তাতে দোষ নেই, আমাদের মুনিঋষিরা সুরা খেত তাঁদের বেলায় দোষ নেই, স্বয়ং ইন্দ্রদেবতা রমনী নিয়ে সব কিছুই করেছেন তাতে দোষ নেই, যে হেতু তাঁরা দেবতা। দোষ কেবল আমাদের বেলায়। আমরা তো সাধারণ মানুষ। আমাদের তো হতেই পারে। আসলে সত্য হোল, এই সব করলেই সঙ্গীতের ভেতরে প্রবেশ করা যায়।' এই সব কথা শুনে মনে মনে ভাবি, এক-একজনের মতে, মেয়ে-পুরুষের ভালবাসার ব্যাপারে মানুষে আর জানোয়ারের কোন তফাৎ নেই।

সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্য বাবাকে কখনও দরাদরি করতে দেখিনি। কিন্তু মৈহার ছেড়ে দেখলাম, অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞ টাকার গোলাম হয়ে পড়েছে। এমনিতে অনেককে দেখেছি খুব ভালোমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লেই একেবারে কেউটে সাপ। ঈর্ষার মত এমন নীচ প্রকৃতি আর নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষড়রিপুর মধ্যে অধম হচ্ছে মাৎসর্য্য। আমি ত জ্ঞানতঃ কারো কোন অনিষ্ট করিনি, কিন্তু যে মুহূর্তে বাজাতে লাগলাম, আমার পেছনে শুরু হোল চক্রান্ত।

মৈহারে বাবার কাছে সঙ্গীতে সাধনা কি করে করতে হয় দেখেছি, কিন্তু তা নিয়ে অহংকার দেখিনি। মৈহার ছাড়ার পর দেখলাম, অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে অহংকার কিন্তু বিদ্যার নামে দেখলাম বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

রাগ আর চণ্ডাল দুই এক জিনিষ। রাগ করলে ব্যবসা করা চলে না। এই নীতিবাক্য দেখেছি প্রায় সকলেই রপ্ত করেছে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা আমার নীতি বিরুদ্ধ। বাবার রাগটা আমি পেয়েছি। এর জন্য আমাকে অনেক কিছু হারাতে হয়েছে কিন্তু তার জন্য মনে কোন ক্ষোভ জন্মায়নি। কাশীর মাস্টার মশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, জগৎ সংসারের সঙ্গে, তালে তাল দিয়ে চলার নাম ক্লীবত্ব। যে সত্যকারের মানুষ সে বিদ্রোহ করবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আপোষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এক কথায় অভিব্যক্তিই জীবন এবং সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। মনে মনে ভাবি, তাহলে আমি কি করব? অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোষ করিনি। কোনদিন করতেও পারবো না।

হঠাৎ মহন্ত অমর নাথ মিশ্রের সম্বোধনে নিজেকে ফিরে পেলাম। মহন্তজী আমার মনের খবর জানতেন। বললেন, 'বৃথা বাজে চিন্তা না করে বাজনার মধ্যে চিন্তা দিলে কাজের কাজ হবে।' মহন্তজী এই কথা বলে মৃদঙ্গ নিয়ে বসলেন। কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেলো বুঝতে পারলাম না। বাজাবার পর মনটা অনেকটা হাল্কা লাগছে। দুপুরের খাবার পর একটা কথাই বারবার মনে হতে লাগলো। কোলকাতায় এ ধরনের প্রোগ্রাম নাকচ করা হোল কেন? বুঝলাম বাইরের কেউ আমার শত্রু নয়। শত্রু ঘরের ভেতরে আড়ালে লুকিয়ে আছে। এ

কি জঘন্য মনোবৃত্তি। সঙ্গীত জগতে এখন এমন একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করছি। বাবার কাছে এই উপদেশ পেয়েছি, 'সঙ্গীত হোল মা জননী, তাঁর কখনও অনাদর কোরো না।' অথচ এখন দেখছি, সঙ্গীত ধীরে ধীরে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, যা কিনা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি না। মানুষ নিজের প্রোগ্রামের জন্য, অর্থের জন্য এত নীচে নামতে পারে ভাবা যায় না। দীর্ঘদিন বাবার কাছে থেকে বুঝেছি সঙ্গীত হোল একাগ্র মনের প্রার্থনার ফসল। এর জন্য ভিক্ষা চাইতে হবে না, প্রভু সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু এখন দেখলাম ঠিক উল্টো। শাস্ত্রে বলে, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' কিন্তু আজকাল এই নীতিকথা বদলে গেছে। বর্ত্তমানে দেখছি যেনতেন প্রকারেন 'ভিক্ষায়াং' লক্ষ্মী প্রাপ্তির জন্য সব কিছু করা হচ্ছে। বাবা আমার ভেতর যে শিকড় গেড়ে দিয়েছেন, চরিত্র গঠনের, শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে আমার পক্ষে সঙ্গীতকে ব্যবসা করে নিতে পারিনি এবং আজও পারলাম না। অবশ্য তাঁর জন্য দুঃখ নেই। ভগবানের আশীর্বাদ বলেই আমি গ্রহণ করেছি। অনেকে আমাকে বলেছে আজকের দিনে ফাইট এনড সারভাইভ। অনেককে বঞ্চিত না করলে নিজের প্রাধান্য কায়েম করা যায় না সেখানে।

বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে কখন তন্দ্রা এসেছিল টের পাই নি। মানসিক ক্লান্তিই শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে বেশী ক্ষতিকর। ভাবলাম এ কি হোল? এ রকম কেন হোল?

আমার জীবনের তেত্রিশটা বসন্ত পার হবার পর সকলেই প্রকারান্তরে বলতে লাগল, এই বয়সে চাকরি করে সকলেই কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত নিয়ে অর্থ উপার্জন করার সীমিত কয়েকটা রাস্তা আছে। প্রথমে কলেজে অধ্যাপক হওয়া। দ্বিতীয় রেডিওতে ডিরেক্টার অফ মিউজিক কিংবা স্টাফ আরটিস্ট হয়ে চাকরি করা। এ ছাড়া অনেককে দেখেছি সিনেমায় আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে বাজায়। আর সর্বশেষ হোল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টিউশান করা। অর্থ উপার্জনের জন্য উপরোক্ত রাস্তা গ্রহণ করা বিবেকের থেকে সাড়া পাই নি। মনে মনে ভাবি একান্তে সাধনা করব এবং আকাশবৃত্তি অর্থাৎ প্রোগ্রাম বাজিয়ে যা উপার্জন করব তাতেই চলে যাবে। আমার সঙ্গীত জীবনের শুরু খুব ভাল ভবেই হোল কিন্তু পরের বছর সঙ্গীতের মধ্যে যে নোংরামী দেখলাম, তখনই বুঝলাম এই পবিত্র সঙ্গীতকে কিছু লোকে কত নীচে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা কত বড় ভুক্তভোগী এবং দূরদর্শী ছিলেন যার জন্য মৈহার ছাড়ার আগে সতর্ক করে দিয়েছিলেন দলবাজী সম্পর্কে। এখন আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। যাক তার জন্য আমার কোন দুঃখ অভিযোগ নেই। আমার সান্ত্বনা, আমি অতি ভাগ্যবান কারণ গঙ্গা নদীর তীরে বাস করছি যেখানে তুলসীদাস বসে রামায়ণ লিখেছিলেন। জীবনে এই প্রথম অনুভব করছি বাঁচতে হলে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, টাকা মানুষের শক্তি খানিকটা বাড়াতে পারে ঠিকই কিন্তু জীবনে শান্তি এনে দিতে পারে না। আর শান্তিই যদি না আসবে তবে সঙ্গীত হবে কি করে? বাবার সেই গল্পটিই আমাকে সান্ত্বনা দেয়। গুরু শিষ্যকে বিদায়ের সময় আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন, 'সারা জীবন কষ্ট পাও কেননা কষ্ট পেলেই সেই কষ্ট সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কান্না হয়ে বেরোবে।' 'এটাই হবে প্রকৃত সঙ্গীত।'

কথায় বলে, 'ধান ভানতে শিবের গীত।' সৈয়দ মুস্তবা আলি বলতেন, 'রাম গেল বনে বেহুলা হোল রাঢ়।' অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকতার অভাব। বাবার সম্বন্ধে লিখতে লিখতে যদি লিখি যে ক্রমাগত আমি যে কটা প্রোগ্রাম এই অল্প সময়ে বাজিয়েছি, তার থেকে বহু বেশী প্রোগ্রাম বাজাবার আগেই অনেকে শ্রী থেকে চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে। এর সাথে বাবার প্রাসঙ্গিকতা কি? আমার বক্তব্য আছে। বাবা সঙ্গীতের ভদ্রলোক, তাই অনস্টেজ ব্যাপারটা তো ভালই শিখিয়েছেন, কিন্তু অফ দি স্টেজ অর্থাৎ নাটকের ভাষায় বিহাইণ্ড দি কারটেন কিছুই শেখান নি। ফল হয়েছে, আমি তো যন্ত্র বাজিয়েছি স্টেজে আর আমার স্বজন যন্ত্রদানবরা, অর্থাৎ শয়তান বন্ধুর বেশে আমার সোনার ফসলে আগুন লাগিয়েছে। এই পাটিগণিত যাদববাবুর বইতে নেই। এই পাটিগণিতের যাঁরা মহান শিক্ষক তাঁরাই প্রচার আকাশে রবি, শশী, তারা।

পণ্ডিত অধ্যাপকের ছেলে বলে অর্থটাকে মূল্য দিই না কিন্তু পরমার্থিক চরিতার্থকে পেতে গেলে ধোপে টিকে থাকতে হবে তো। আর ধোপে টিকে থাকতে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ চাই। 'স্বস্তী বৃহষ্পতির' মতো কয়েকজন ছাত্রকে বিনা পয়সায় সঙ্গীতের শান্তির জল ছিটিয়ে, না আমার ইহলোক রক্ষা হচ্ছে, না আমার পরলোকই সুরক্ষিত হচ্ছে। আচমকা ব্যাপারটা বোধ হয় বোধগম্য হবে না পাঠকের, তাই একটা ব্যাপারে খোলসা করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। আমার নিজের লোকেরা কেউ বাজনার ব্যবস্থা করে দেয় নি। আমার বাজনা শুনেই এক একজনে আমার প্রোগ্রাম রেখেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের কেউ যদি আমার অবস্থায় পড়ে তাহলে যাতে মনে জোর পায় সেই ভেবেই আমার বাজনার সম্বন্ধে অসাধারণ ইঙ্গিত করছি। নানা মিথ্যার বেসাতি করে আমার নিজের লোকেরা চক্রান্ত করে বাজনা করতে দেয় নি। এ ছাড়া নিজের লোকেরা কিন্তু সঙ্গীতকারকে দলে টেনে এনে আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত অপপ্রচার করেছে।

উপস্থিত মাঝে মাঝে আমার বাজনা হয়। বর্তমানে তিনজন আমার কাছে সরোদ শেখে। কাশীর রাজেশ মৈত্র সপ্তাহে একদিন শেখে। এ ছাড়া ছাপরা থেকে গোপাল দত্ত চৌধুরি এবং রমেন মিত্র, কোলকাতা থেকে সরোদ তৈরী করিয়ে হাজির হয়েছে শিক্ষার জন্য। গোপাল দত্ত আমাকে প্রস্তাব দিলো, ছাপরায় সাত আটজন সঙ্গীতপ্রেমী আমার কাছে শিখতে চায়। প্রতি মাসে দুই দিনের জন্য যদি যাই তাহলে তারা শিখতে পারবে। শিক্ষার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা দেখে বললাম, 'ঠিক আছে কিছুদিন পরে ছাপরা যাব। উপস্থিত প্রতি মাসে দুইদিন কাশীতে এসে আপনারা শিখুন।' আমার কাশীর শুভাকাঙ্খীরা মাঝে মাঝেই বলে, 'ভবিষ্যৎ-এর জন্য টাকার দরকার। বয়স হচ্ছে সুতরাং চিন্তা করা উচিত।' এক এক সময় যখন দেখি আমার সব বন্ধুরা চাকরি কিংবা বিভিন্ন রকমের ব্যবসা নিয়ে আছে তখন ভাবতে বাধ্য হই, আবার পর মুহূর্তেই ভাবি যা হবার তা হবে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমি করবার কে? আমার উপস্থিত সঙ্গীত সাধনা ছাড়া কিছুই করবার নাই। বাড়ীতে মায়ের জন্য কোন চিন্তা নাই। আমার তিন বড় ভাই বাইরে চাকরি করে। দাদারা মাসে টাকা পাঠায়। আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই। বাজনার কার্যক্রম করে আমার যাবতীয় খরচ চলে যায়। বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা প্রায় বলতেন, 'কাশীর লাংড়া আমের গাছ লাগিয়েছ সুতরাং ফল ধীরে ধীরে হবে। তুমি তো

দেরীতে গাছ লাগিয়েছ সুতরাং ফল পেতে দেরী হবে।' চিন্তা করে লাভ নেই। তাই বুঝতে পারি নি কোলকাতায় দুই বছর বাজিয়ে যে সাফল্য এসেছে, তার জন্য আমার নিজের লোকেরাই গাছের গুঁড়ি কাটবার চেষ্টা করছে। যাক তার জন্য আমার কোন উদ্বেগ নাই, কেননা কথায় আছে 'শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ গিরি লঙ্ঘনম।'

শনৈঃ বিত্ত, শনৈ বিদ্যা, ইহ পঞ্চ শনৈই শনৈই। অর্থাৎ পাঁচটা জিনিষ খুব ধীরে ধীরে করতে হয়। কাঁথা সেলাই, পথে চলা, পাহাড়ে চড়া, অর্থ এবং বিদ্যা তাড়াতাড়ি হয় না। সুতরাং ভাববার কি আছে? মনে মনে ওমর খৈয়ামের দর্শন মনে মনে আওড়াই।

দি মুভিং ফিনগার রাইটস; এনড, হ্যাভিং রিট,
মুভস অন ঃ নর অল দাই পিটি নর উইট
স্যাল লিয়োর ইট ব্যাক টু ক্যানসেল হাফ এ লাইন,
নর অল দাই টিয়ার্স ওয়াস আউট এ ওয়ারড অফ ইট।

বাবার কথাও মনে পড়ে যায়। বাবা প্রায় বলতেন,

আমি তোমার পোষা পাখী
ওহে দয়াময়
যা করাও তা করি আমি
আমি কিছু নয়।

এই কথাগুলো মনে করে কারও প্রতি অভিযোগ থাকে না। কেননা আমার মনে হয় সবজিনিষই পূর্ব কল্পিত এবং সুনিয়োজিত হয়ে রয়েছে। তবে একটা কথা আছে উপলক্ষ্য। যেমন লেখা ছিল বাবাকে শেখাতেই হবে। বাবা ছিলেন উপলক্ষ্য। ভাল কাজ হলে এই উপলক্ষ্য, যাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি এবং যে খারাপ কাজ করে সেও উপলক্ষ্য, তাঁদের প্রতি রাগ বা ঘৃণা হয়। যাঁরা ভ্রষ্টা তাঁদের এ সব কিছু ভাবায় না কিন্তু আমি তো অত ঊর্দ্ধে পৌঁছই নি, তাই এ সব জেনেও মাঝে মাঝে দুঃখ পাই।

কোলকাতা থেকে এসেই বাবাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তর পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
৮-২-৫৯

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তুমার পত্র পেয়েছি। তুমার প্রগ্রাম সবগুলি শুনতে পাই নাই। সকাল বেলায় রেডিও লাগিয়েছিলাম ও বিকালেও লাগিয়ে ছিলাম এলাহাবাদ ও লক্ষ্মৌ ষ্টেসনে কুথাও সুনতে পাই নাই। রাত্রে শুনতে পেয়েছি ঝিঁঝিট রাগ বাজিয়েছিলে। বেস বাজিয়েছ আমার খুব ভাল লেগেছে ঠিক আলিআকবরের অনুকরণে বাজিয়েছ বিবেক ভাব নিয়ে। এই হল দুঃখ্যের বাজনা অতি দুঃখ্য পেলে ও প্রানে আঘাত পেলে, এইরূপ বাজনা আসে। এর নাম হল বিরহ বেদনা। আরেক বাদ্য হল পণ্ডিতাই বাদ্য। এতে সুর কি বিস্তার নিত্ত্ব নতুন তান, হয়ে থাকে, রসভরা হওয়া চাই, এক ২ তানে শ্রুতারা আনন্দে মাতুহারা হয়ে পরে। আরেক প্রকার

বাদ্য আছে, শ্রুতারা তনময় হয়ে শুনে, আর এক প্রকার বাদ্য আছে লয়ের সঙ্গে কারুকার্য মিশ্রিত, বিবেক আনন্দ, ভয়ানক মিশ্রিত। আরেক বাদ্য আছে নবরস নিয়ে, এটা হল বহুদর্শিতা হলে গুনিজ্ঞানি হলে বাজাতেই পারে। এখন তুমিই বুঝে নিবে, তুমার মধ্যে কুন ২ বিষয় লাভ করেছ, তাহলেই তুমি বুঝিতে পারবে। তুমার মধ্যে কি ২ অভাব। সেটা বুঝে সাধনা করে ঐ অভাব দূর করিবে। স্থির চিন্তে সাধনা কর তবেই সেই সেই জিনিস লাভ হবে। গুনিজনের গান বাদ্য শুনিবে, তাতেও অনেক শিক্ষা হবে। আমি কিছু করতে পারি নাই তুমরা কর। তাহলেই আমার করা হল আর কি জানাব এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি

ইতি—
বাবা

বাবা আমার একটা বাজনা শুনেছেন। বাবাকে লিখছিলাম আমার রেডিওতে বাজনা শুনে দোষ ত্রুটি লিখতে। বাবার এই চিঠি আমার কাছে অমূল্য।

সবে কোলকাতা থেকে বাজিয়ে এসেছি ইতিমধ্যে কাশীর ডি.এম. একজন দারোগার সঙ্গে আমার কাছে এসে জানালেন যে কোলকাতার টালিগঞ্জ থানার ও.সি. আমার একটা প্রোগ্রাম করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গত করবে সামতা প্রসাদ। বাজাবার সম্মতি জানাতে ডি.এম. বললেন, 'টেলিফোন করে কোলকাতায় জানিয়ে দেবো।'

কোলকাতায় যাত্রা করলাম। নাদুকে কোলকাতায় টেলিফোন করে দেওয়ায় স্টেশনে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। টালিগঞ্জ থানার ও.সি.-কে টেলিফোন করে আমার আসার কথা বললাম। কিছুক্ষণ পরেই ও.সি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বললেন, 'তানসেনে বাজনা শুনেই ঠিক করেছিলাম একটা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করব। মেনকা সিনেমা হলে আপনার বাজনা এবং রোশন কুমারির নৃত্য সন্ধ্যা সাতটার সময় হবে। প্রথমে নাচ হবে তারপর আপনার বাজনা হবে।' সব কথা শুনে যাওয়ার পর ও.সি. চলে গেলেন। আমি আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করলাম। আলিআকবর আমার এত তাড়াতাড়ি আবার কোলকাতায় বাজনা হবে শুনে আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'খুব ভাল-নাম হয়েছে তাই ডেকেছে, উত্তরে বললাম, 'কিসের নাম হয়েছে?' আলিআকবর আমাকে সংবাদপত্রে প্রোগ্রামের বিষয়ে বেরিয়েছে দেখালেন। বাজনার সাতদিন আগেই কোলকাতায় গিয়েছি। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে।

পরের দিনই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম চণ্ডী ব্যানার্জি। আমি অমৃতবাজার পত্রিকার মিউজিক ক্রিটিক। কোলকাতায় উত্তর কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনের কর্তা মন্মথ নাথ ঘোষ আমাকে একটা জরুরী সংবাদ দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সংবাদটি হোল এই যে উত্তর কোলকাতায় প্রতি মাসে যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় সেটা এবারে পাঁচদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানটিতে আপনাকে বাজানোর জন্য আমাকে মন্মথনাথ ঘোষ পাঠিয়েছেন।' বুঝলাম মেনকা সিনেমায় বাজানর দুই দিন আগে এই অনুষ্ঠানটি হবে। সানন্দে সম্মতি জানালাম। কথায় বুঝলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কানাই দত্ত। সম্প্রতি কানাই দত্ত রবিশঙ্করের সঙ্গে কয়েকজায়গায় বাজিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। শ্যামবাজারের সুন্দর হলে নির্দিষ্ট দিনে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাজনা হোল। আলাপের পর অতি বিলম্বিত লয়ে গৎ বাজালাম। পরে অতি দ্রুত লয়ে বাজিয়ে শেষ করলাম। কানাই দত্ত আমার সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে কয়েকজায়গায় হোঁচট খেল। মন্মথনাথ ঘোষ আমার বাজনার খুব সুখ্যাতি করলেন। বললেন, 'সাতদিন পরে আমার বাবার মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাজাতে হবে।' শুনলাম সে আসরে আলিআকবর, রবিশঙ্কর, নিখিল, ভীমসেন যোশী এবং আরোও অনেকে চারদিনের অনুষ্ঠানে ভাগ নেবে। উত্তরে বললাম, 'আপনার এখানে বাজানর সুযোগ পাওয়া, ভাগ্যের কথা, কারণ আপনার বাড়ীতে ভারতের সব গুণী উস্তাদরা এসে বাজিয়েছেন।'

নির্দিষ্ট দিনে মেনকা সিনেমা হলে সামতাপ্রসাদের সঙ্গে বাজনা হোল। আমার বাজনা শুনে রোশন কুমারীর বাবা ফকির মোহম্মদ তাঁর মেয়ে রোশনকুমারীর নৃত্যের সঙ্গে সরোদ বাজাতে অনুরোধ করলেন। বললেন, 'আপনি যদি আমার মেয়ের নৃত্যের সঙ্গে সরোদ বাজান এবং আমি যদি মৃদঙ্গ বাজাই, তাহলে সে অনুষ্ঠান দর্শককে আকৃষ্ট করবে।' আমি স্পষ্ট বলে দিলাম, 'নাচের সঙ্গে সরোদ বাজাই না।' ফকির মোহম্মদ অনেক টাকার প্রলোভন দিলেন, তবু নাচের সঙ্গে সরোদ বাজাতে আমার রুচিতে বাধল। তাই তাঁর প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলাম। এরপর মন্মথনাথ ঘোষের বাবার মৃত্যু বার্ষিকীর আসরে বাজাতে গেলাম। এত সুন্দর পরিবেশে কোলকাতার সব নাম করা গায়ক বাদক উপস্থিত। মন্মথনাথ ঘোষ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে এই প্রথম থেকে তবলা বাজালেন কেরামত খাঁ। এত ভাল সঙ্গত করলেন যার তুলনা নাই। কোলকাতা থেকে বাবাকে সঙ্গীতের সব কার্যক্রম জানিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখলাম। কোলকাতার সব অনুষ্ঠান শেষ করে কাশী চলে গেলাম। কাশীতে আসবার কয়েক দিনের মধ্যেই বাবার চিঠি পেলাম। বাবা চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৬-২-৫৯

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তুমার পত্র এইমাত্র পাইলাম। তুমার সব বিষয় জেনে সুখি হলেম। আসিবর্বাদ করি তুমার জস, গুন, জগতের চন্দ্রের যৌতির মত আলো দান করুক শ্রেষ্ঠ বাদক হও। এলাহাবাদে ৫-৬ মার্চ্চে, প্রগ্রাম আছে আকাশবানিতে।

১৮ তাং তুমার প্রগ্রাম শুনিবার ইচ্ছা আছে ও শুনিব। কুন ২ সময় বাজাবে জানা নেই চেষ্টা করে দেখব। তুমার মায়ের আশিবর্বাদ জানিবে এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি।

ইতি বাবা
আলাউদ্দিন আলম

বাবার আশীর্বাদ আমার জীবনে বিশেষ সম্পদ। বাবার চিঠি পেলেই বাজনা বাজাতে নূতন করে উৎসাহ পাই।

কোলকাতা থেকে কাশী আসার কিছুদিন পরেই মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরি অঞ্চলে লাহিড়ি কলেজে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। তবলার সহযোগীতার জন্য আমার সঙ্গে কবিরাজ আশুতোষ গেলেন। মোগলসরাই স্টেশনে গিয়ে দেখি আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরাতে প্রসিদ্ধ গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী বম্বে যাচ্ছেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। যদিও নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এবং রেডিওতে বহুবার গান শুনেছিলাম। আশুতোষ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাবার ছাত্র শুনে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বাবার সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অনেক গল্প করলেন। মোগলসরাই থেকে কাটনি পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে গল্প করতে করতে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা কি ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। কাটনি স্টেশনে আমাদের নামতে হবে। চিরিমিরিতে বাজাবার পরের দিনই এলাহাবাদে রেডিওতে বাজিয়ে কাশী ফিরে এলাম।

মৈহারে বাবাকে অবসরসময়ে, বরাবরই বই পড়তে দেখেছি। এলাহাবাদে প্রত্যেক মাসে রেডিওতে বাজিয়ে মৈহারে আসবার সময় হিন্দিতে রহস্য এবং তিলিস্মি বই কিনে আনতেন। মৈহার থেকে আমি যে সময় কাশীতে চলে আসি, তারপর কাশী থেকে আমি রহস্য এবং তিলিস্মি অর্থাৎ রূপকথার বই পাঠাতাম। বাবা দিব্যি দিয়েছিলেন আমি যেন নিজের পয়সায় বই কিনে না পাঠাই, তাই বাধ্য হয়ে ভিপি করে বরাবর, বাবা লিখলেই পাঠিয়ে দিতাম। বাবার দিব্যি দেবার কারণ ছিলো। বাবা লিখেছিলেন, 'উপস্থিত তুমি উপার্জন করো না, সেই জন্য নিজের টাকায় বই পাঠাবে না।' কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে বাবার কাছে যখন গিয়েছি, বই নিয়ে গিয়েছি এবং পড়ে শুনিয়েছি।

কোলকাতা থেকে কিছুদিন হোল সবে এসেছি। ইতিমধ্যে কোলকাতা থেকে আমাদের ঘরের একজনের চিঠি পেলাম। লিখেছে চোদ্দ থেকে আঠারো আগষ্ট অরবিন্দ জয়ন্তী মিউজিক কনফারেন্স হবে। এই কনফারেন্সে শিল্পী নির্বাচন করবার ভার তাঁর উপর। এই কনফারেন্সে বাবাও যাবেন। এ ছাড়া ভারতের বহু শিল্পী ভাগ নেবেন। আমাকেও এই কনফারেন্সে বাজাবার জন্য লিখেছে। মৈহার ছাড়ার পর বাবার সঙ্গে পত্রালাপ আছে কিন্তু বাবার সঙ্গে ইচ্ছা থাকলেও দেখা করি নি। বাবার সঙ্গে দেখা না করার কারণ ছিলো। মনে মনে স্থির করেছিলাম, যে দিন বাবার মনের কষ্ট দূর করতে পারব সেইদিনই দেখা করব। জানি না সে দিন কবে আসবে?

কিছুদিন পর এলাহাবাদে রেডিওর প্রোগ্রামে গেলাম। বর্তমানে যেমন আগেই রেকর্ড হয়ে যায়, সেই সময় তা হ'তো না। সকালের বাজনা সোজা প্রচার হ'তো। রাত্রের প্রোগ্রাম রেকর্ড করে রাখত। সকালে বাজনা বাজিয়ে রাত্রের জন্য যে মুহুর্তে রেকর্ডিং করছি, সেই সময় এসিস্টেন্ট ডিরেকটার সুনীল বোস এসে আমাকে বললেন, 'দুপুরবেলায় তোমার উস্তাদের রেকর্ডিং হবে। তুমি তোমার উস্তাদ বাবার সঙ্গে এসো এবং বাবার মেজাজ যাতে খুশী থাকে, তার চেষ্টা কোরো।'

সুনীল বোসের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। প্রথম যে সময় দিল্লীতে চাকরির জন্য গিয়েছিলাম সেই সময় তাঁকে দিল্লীতে দেখি। তারপর এলাহাবাদে বদলী হয়ে এসেছেন। সুনীল বোস জানতেন আমি মৈহারে বাবার কাছে দীর্ঘদিন ছিলাম। রেডিওতে বাবার মেজাজ প্রায় খারাপ হয়ে যেত কেননা তানপুরা ছাড়বার লোক ভাল পেতেন না। বাবার রেকর্ডের সময় সকলেই সন্ত্রস্থ থাকত। আমি এসেছি বলে সুনীল বোস আমাকে বললেন উপস্থিত থাকতে। বাবার আসার কথা শুনেই আমার মানসিক চাঞ্চল্য হতে লাগলো। রেকর্ড করেই বাবার কাছে কৈলাস হোটেলে গেলাম। মৈহার ছাড়ার পর বাবার সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হবে। হোটেলে ঢুকে দেখি বাবা সরোদ মেলাচ্ছেন। হাত জোড় করে ঢুকলাম। বাবা আমাকে দেখেই বললেন, 'আরে কে? কে?' বললাম, 'আমি'। এই কথা বলে বাবাকে প্রণাম করতেই কোথা থেকে দুচোখে কান্না নেমে এল। পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদছি দেখে বাবা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'শান্ত হও।' কিছুক্ষণ সামলাতে সময় লাগলো। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এলাহাবাদে কেন এসেছো।' আসার কারণ বলে বললাম, 'সুনীল বোসের কথায় জানতে পারলাম আপনি এসেছেন। আপনার দুপুরে রেকর্ডিং হবে, সেইজন্য রেডিও থেকে এখুনি গাড়ী আসবে। আপনার সঙ্গে রেডিওতে যাব।' এ কথা শুনে বাবা খুশী হলেন। এ সময় অন্য প্রসঙ্গ বলা ঠিক হবে না ভেবে চুপ করে রইলাম। বাবার সঙ্গে রেডিও স্টেশনে গেলাম। বাবার রেকর্ডিং হয়ে যাবার পর গাড়ী করে হোটেলে এলাম। চা খাবার পর বাবাকে বললাম, 'রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর সব মনোমালিন্য মিটমাট হয়ে গিয়েছে।' এ কথা শুনে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে একটা মোটা খাতা দিয়ে বললেন, 'আজই লেখাটা শেষ করেছি। পড়ো। খাতাটা খুলে দেখি বাবার নিজের হাতের লেখায় বড় বড় হরফে লেখা 'আমার জীবনী'। বাবা বললেন, 'আমার জীবনী' নাম দিয়ে আমার জীবনের সমস্ত স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করে আজকেই শেষ করেছি। এই লেখায় নিজের জীবনী ছাড়া সকলের 'ভেদ' খুলে দিয়েছি।' এই ভেদ খুলেছেন কথাটি বাবার একটা নিজস্ব বাচন ভঙ্গী। বাবার ভাষায় ভেদ খোলার অর্থ মুখোস খুলে দেওয়া। প্রায় দুবছর ধরে বাবা 'আমার জীবনী' নিয়ে আজ শেষ করেছেন। দুই ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে পেরিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। বাবা নিজের জীবনী এবং এ যাবৎ যা যা হয়েছে সবই লিখেছেন। বাবার লেখা পড়ে আমি অবাক। লেখাটা পড়ে তাকাতেই দেখি বাবা চুরুট হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, 'কিরকম পড়লে? আমি তো লেখাপড়া জানি না। যা মনে এসেছে লিখেছি।' বাবার লেখা পড়ে আমি বিস্মিত। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। সত্যই বাবা সকলের ভেদ খুলে দিয়েছেন। বাবা যে এইভাবে লিখতে পারেন আমার কাছে অকল্পনীয়। বাবার নিজের কষ্টের জীবনী তো লিখেছেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে বর্তমানে যে মানসিক কষ্ট পেয়েছেন সে কথাও হুবহু লিখেছেন। আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?' বাবার কথায় উত্তর দিলাম, 'খুব ভাল হয়েছে।' কথায় কথায় অরবিন্দ জয়ন্তী কনফারেন্স-এর কথা উঠল। বাবা বললেন, 'কোলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আদৌই নাই। যদি শরীর ঠিক থাকে তাহলে যাব। এবারে কোলকাতায় তুমি আমার

সঙ্গে বাজাবে।' বাবার কথায় বললাম, 'আমি কি বাজাব?' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে না না তুমি আমার সঙ্গে বাজাবে।' আমি চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

বাবার সঙ্গে রেওয়াতে যে রকম বাজিয়েছিলাম কোলকাতাতেও যদি তাঁর পুনরাবৃত্তি হয় তা হলে তো রাতারাতি আমি বিখ্যাত হয়ে যাব। সেবার না হয় মেজাজ ভাল ছিলো তাই সুখ্যাতি হয়েছিল কিন্তু কোলকাতায় যদি মেজাজ খারাপ হলে বলেন, 'হলো না', তাহলে যেটুকু নাম হয়েছে তাও ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

যাক বাবার সঙ্গে আর একদিন রেডিওতে রেকর্ডিং-এর সময় গেলাম। তারপর বাবাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিলাম। ট্রেনে উঠে বাবা বললেন, 'কিছু বই কাশী থেকে ভি.পি করে পাঠিয়ে দিও।' পাঠিয়ে দেব বলে কাশী চলে এলাম। কাশীতে এসে তুলসী মন্দিরে মন দিয়ে বাজাতে লাগলাম। বাবার কথামত কিছু বই বাবাকে পাঠিয়ে দিলাম।

কাশীতে মৈহারের রায় লাইম কোম্পানির মালিক অর্থাৎ আমার ছাত্রী মুন্নির বাবা মাঝে মাঝে কাশীতে আসেন। কাশীতে একটা বাড়ী কিনেছেন। মৈহার থেকে এলে আমার সঙ্গে দেখা করেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ মুন্নির বাবা আমার কাছে এসে বললেন, 'এবারে যে বইগুলি আপনি পাঠিয়েছেন সে বইগুলি ভাল নয় বাবা বলছিলেন।' এ কথা শুনে বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম, 'বইগুলি ভাল না হলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। তার বদলে অন্য বই পাঠিয়ে দেব।' মুন্নির বাবার হাতে চিঠি দিয়ে সব বুঝিয়ে বললাম, 'বইগুলি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বই-এর দোকানে গিয়ে নিজে কিছু রহস্য এবং রূপকথার বই পাঠিয়ে দিতে বললাম। পুস্তক বিক্রেতাকে বললাম, 'আগের বার ভাল বই পাঠান নি। সেই বইগুলি ফেরৎ নিতে হবে।' পুস্তক বিক্রেতা আমার পরিচিত ছিলো। আমার কথায় রাজী হয়ে গেল। কিছুদিন পরেই বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৩-৭-৫৯

কল্যানবর,

শ্রী মান বাবা যতীন তুমার পত্র পাইলাম খুদা তোমাকে কুশলে রাখুন এই প্রার্থনা করি। বুক সেলারকে জানিয়ে দিবে, আমি ফরমাস না দিলে যেন বহি না পাঠায়। ঐদ্য ৪২৲ ৪৫৲ পয়সার বহি পাঠিয়েছে পূবের্ব যতগুলি বহি পাঠিয়েছে তার মদ্ধে ৪-৫ খানা বহি পরবার মতন পেয়েছি, আর সব বহি বাজে বহি, ছেলে খেলার মত কবিদের লিখা বহি। তুমি লিখেছ বাজে বহিগুলি ফেরৎ দিতে, বাজে বহিগুলি ভুকার মতন, পরে ফেলেছি, সে গুলি কি করে ফেরৎ দিব। বহি বিক্রেতাকে বলে দিবে, বাজে বহি যেন না পাঠায়। যে সব বহি পাঠিয়েছে তাহা আর ফেরৎ দেব না, ভবিস্বতে যেন দুকানদারি আমার সঙ্গে না করে। এই বারের বহিগুলি পরে দেখি, কেমন পাঠিয়েছে, তার পর তুমাকে জানাব। এরা হচ্ছে দুকানদার, ব্যবসাই, দুই একখানা ভাল লিখকের বহির সঙ্গে বাজে বহি দিয়ে দুকানদারি করে, আর যেন বহি না পাঠায়। আমার শরীর বিশেষ, ভাল নয়, চলছে জুরাতালির অবস্থায় চিন্তার কুন

কারণ নেই ভগবান খুদা যা করেন তাহা মাথা পেতে বহন করিব, একপ্রকার তুমার কুশল কামনা করি।

ইতি
বাবা আলাউদ্দিন

পুনঃ এই মাত্র ৫ খানা বহি পাঠিয়েছে ৪২৲ সাৎ আনা ডাক খানায় দিয়েছি। হিন্দি বহি আর আনব না, ৪২ টাকা স্যাৎ আনার বহি পরে দেখি। হিন্দি লিখা বহি ভাল নেই। এখন বাংলা বহি আনাব কলিকাতা হতে। এদেরে মানা করে দিবে আর জেন বহি না পাঠায়

আলাউদ্দিন

বাবা লিখেছেন, 'পড়া বই ফেরৎ দেবেন না। এবারে যে বই পাঠিয়েছি সেগুলি পড়বেন। না বলা পর্যন্ত আর যেন না পাঠাই। এবারে কোলকাতা থেকে বাংলা বই আনাবেন।'

৪৯

দেখতে দেখতে সময় যে কি করে চলে যায় বুঝতে পারি না। কোলকাতা যাবার সময় হয়ে গেল। প্রোগ্রামের দুই দিন আগেই কোলকাতায় পৌঁছে আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে দেখি বাবা এসে গেছেন। বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে কনফারেন্সে বাজাতে বললেন। বাবার কখন কি মেজাজ থাকবে ভেবে বললাম, 'আশিসকে নিয়ে আপনি বাজান।' বাবা কিন্তু বারবার জেদ করতে, আমি চুপ করে রইলাম। বাবার কাছে জানতে পারলাম চোদ্দ আগস্ট রাত্রে এবং পনেরো আগস্ট সকালে বাবার বাজনা হবে। পাঁচদিনের কনফারেন্সে প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন বাবার বাজনা আছে। আমার প্রোগ্রাম হবে সতেরো আগস্ট এবং শেষ দিনে আলিআকবরের বাজনা হবে। বাবার কাছে কিছুক্ষণ বসে হোটেলে চলে গেলাম। বাবার প্রথম দিনের বাজনার দিন অরবিন্দ জয়ন্তী সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারি এসে আমাকে বলল, 'খাঁ সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে বলবার জন্য যে আজ রাত্রে আপনি তাঁর সঙ্গে বাজাবেন।' সেক্রেটারিকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম, 'আমি চতুর্থ দিনেই বাজাব।' বাবার সঙ্গে কনফারেন্সে গেলাম। বাবার সঙ্গে কেরামৎ খাঁ সঙ্গত করল। পরের দিন সকালে বাবা আমার কথামত আশিসকে নিয়ে বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গত করল কিষণ। আলাপের পর গৎ বাজাবার সময় সাথ সঙ্গতে, বাবার বাজনার তার যে মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কিষণের বায়াটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগলেন। সকলেই খুব আনন্দ পেলো। বাবা এবারে জনতার দিকে সম্বোধন করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার নাতি আশিস। মতলব করে আমার সরোদে খারাপ তার লাগিয়ে দিয়েছে তাই বাজাবার সময় তার ছিঁড়ে গেল। আপনারাই এর বিচার করুন। বাবার এই বালক সুলভ কথা শুনে শ্রোতারা হাসতে লাগল। তারপর তার লাগিয়ে বাবা বীর রসের অবতারণা করে শেষ করলেন।

বাবার বাজনা শুনে মনে হোল যৌবন বয়সের বাজনা। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না আটাত্তর বয়স বয়সে এই ধরনের বাজনা কেউ বাজাতে পারে। কোলকাতায় এই বাজনাই বাবার জীবনে শেষ বাজনা। এরপর বাবা কোলকাতায় আর কখনও বাজান নি।

সকালে বাজিয়ে রাত্রেই বাবা মৈহার যাত্রা করলেন। স্টেশনে সকলেই গিয়েছে বাবাকে

পৌঁছতে। বাবা আমাকে দেখে বললেন, 'আলিআকবরের খুব ইচ্ছা যে তুমি তাঁর কলেজের প্রসপেকটাস তৈরী করে দাও যেমন মৈহারে করেছিলে।' এ আবার কি নূতন পরীক্ষা। হাত জোড় করে বললাম, 'আমি কি করবার উপযুক্ত?' বললেন, 'আরে না, না, আলিআকবর আশিসকে দিয়ে বলেছে যে তুমি আলিআকবরের কলেজের প্রসপেকটাসটা যেন করে দিয়ে যেও। এই কাজটা করে দিয়ে কাশীতে যেও।' দূরে দেখলাম আলিআকবর হাত জোড় করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা রাজী হলাম। কারো মুখে কোন কথা নাই। সময়ে গাড়ী এলো। বাবা মৈহার যাত্রা করলেন। ট্রেন ছাড়ার পর আলিআকবরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলেছেন বাবাকে আশিসকে দিয়ে?' আলিআকবর বলল, 'আমার কলেজের প্রসপেকটাসটা তৈরী করে দাও এবং থিওরিটা বাংলাতে লিখে দাও যাতে কলেজে একদিন থিওরির ক্লাসে কেউ পড়াতে পারে।' এ কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, 'এই দুটো কাজ করতে তো বহু দিনের ব্যাপার। কম করেও চারটে মাস লাগবে। আপনি তো আমার অবস্থা জানেন?' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আলিআকবর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'প্রথম কথা পাম এভিন্যুতে আমার একটা ফ্লাট আছে। সেই ফ্লাটে বাহাদুর থাকে। ফ্লাটের একটা ঘরে তুমি থাকবে। দুবেলা আমার বাড়ী খাবে। তোমার দৈনন্দিন হাত খরচা সব আমি দেব। এছাড়া বল এই কাজের জন্য উপরি কত টাকা তোমাকে দিতে হবে?' উত্তরে বললাম, 'আপনার কাজের জন্য উপরি টাকা নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে উপরি দেওয়ার বদলে আমাকে একটা ভাল সরোদ তৈরী করিয়ে দিন কারণ আমার বাজনাতে কোন রেশই থাকে না।' আলিআকবর বলল, 'ঠিক আছে সরোদ করিয়ে দেব। কনফারেন্সের পর কলেজের ব্যাপার নিয়ে বাড়ীতে কথা বলব।'

পরের দিন আমার বন্ধু রঞ্জিৎ কুণ্ডুর সঙ্গে কনফারেন্স দেখতে গেলাম। কোলকাতায় আমি কিছুই চিনতাম না, সেইজন্য যখনই কোলকাতায় যেতাম বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সব জায়গায় যেতাম কারণ আমার বন্ধু ছিল সব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমার বন্ধুর সঙ্গে আলিআকবর, আশিস, সকলের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাই হোক, আমার বন্ধুকে নিয়ে পার্ক সারকাসে গিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। গান চলছে। গানের পর নিখিলের সেতার এবং সর্বশেষে রোশন কুমারির নৃত্য। দুজনের সঙ্গে দেখা করে গান শুনতে গেলাম। গান শেষ হোল কিন্তু তারপর পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা হচ্ছে না। লোকে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। সাজঘরে গিয়ে দেখলাম নিখিল ও রোশনকুমারি আগাম টাকা চাইছে। টাকা না পেলে তাঁরা অনুষ্ঠান শুরু করবে না। সেক্রেটারি বলছে, 'আগে বাজান, বাজনার শেষে টাকা দেব।' আসল ঘটনা হোল একটা গুজব উঠে গেছে যে বাজাবার পর টাকা দেবে না, কারণ যে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সব ভার নিয়েছে সে নিজে অনুপস্থিত। হঠাৎ দেখি চেয়ার ভাঙ্গাভাঙ্গি চলছে। যা সব ব্যাপারে সব জায়গাই হয়ে থাকে। নিখিল ও রোশন কুমারি চলে গেল। তারপর চিৎকার বাড়তেই, আমার বন্ধু রণজিৎ কুণ্ডু আমায় নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে দেখি, দর্শকদের মধ্যে কিছু লোক মাইক্রোফোন ধরে হৈ হৈ করে সিনেমার গান জুড়ে দিয়েছে। হোটেলে ফিরে গেলাম।

মনে মনে বলি আজকাল সকলেই গান, বাজনা বা নৃত্যের জন্য যে অর্থে রাজী হয় অর্থাৎ হকের টাকার থেকেও উপরি চায় নানা দিক থেকে। এই উপরি পাওনাটার একটা আলাদা রোমাঞ্চ। তাঁর স্বাদ, গন্ধই আলাদা। কয়েকজন শিল্পীর জন্যই সঙ্গীতের বদনাম হয়ে যায়।

পরের দিন আমার বন্ধুর পরামর্শে নাদুর বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তারপর আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আলিআকবরকে গিয়ে গত রাত্রের কথা বলায় খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, 'অব্যবস্থার জন্য এই কাণ্ড হোল। আমাকে যদি কেউ খবর দিতো তাহলে আমি নিজে গিয়ে বাজাতাম।' যাক যা হবার তাই হোল। বুঝলাম টাকার জন্যই সঙ্গীত, এখানে ভালবাসার কোন মূল্য নাই। এত সুন্দর আয়োজন যে এ ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা কল্পনার অতীত।

কিছুক্ষণ পরেই কলেজের প্রসপেকটাস নিয়ে আলিআকবরের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। বর্তমান কলেজে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ার পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। ঠিক হোল দশ বছরের কোর্স করতে হবে। মৈহারে যেমন করেছিলাম সেই ভাবেই প্রসপেকটাস তৈরী করব ঠিক করলাম। যে হেতু ইংরেজীতে প্রসপেকটাস তৈরী করতে হবে, সেইজন্য প্রথম ছয় মাসের কোর্সের নাম দিলাম প্রিপেরিটিওরি। যদিও দুই তিন পাতার একটা প্রসপেকটাস ছিল কিন্তু সেটা কিছুই নয়। প্রসপেকটাসে প্রিন্সিপালের জায়গায় নাম ছিল আলিআকবর। ভাইস প্রিন্সিপালের জায়গায় নাম ছিল অন্নপূর্ণাদেবী। শিক্ষকদের মধ্যে নাম ছিল বাহাদুর, নিখিল, আশিস, ধ্যানেশ এবং আলিআকবরের দুই তিনজন ছাত্রের নাম। এ্যাডমিশন ফি এবং প্রথম বর্ষ থেকে দশম বর্ষ পর্যন্ত ফি কত হবে এই সব নিয়ে আলোচনা হোল। আলিআকবরকে বললাম, 'আমাকে একজন সহকারী দিন যে রোজ টাইপ করবে।' আলিআকবর একজন সহকারী দিলো। সেইদিন থেকে কাজ শুরু করলাম।

আলিআকবর আমাকে বলল, 'হেমেন এণ্ড কোম্পানীতে' গিয়ে আমার নাম করে একটা সরোদের জন্য বলে এসো। হেমেন কুমিল্লার লোক। কলেজের ছাত্রদের সরোদ সেই তৈরি করে। আমার নাম করে বোলো, খুব ভাল করে যেন একটা সরোদ তোমার জন্য তৈরী করে। তৈরী হয়ে গেলেই আমি টাকা দিয়ে দেব।' আশিসকে নিয়ে গিয়ে সরোদের অর্ডার দিলাম। আমার সরোদের জন্য কয়েকটি নূতন জিনিষের ফরমাইস দিলাম যা অন্যের সরোদে থাকে না। অনুরোধ করলাম যথাশীঘ্র সরোদ তৈরি করে দিতে। দিনরাত পরিশ্রম করে যথাসময়ে প্রসপেকটাস তৈরী হয়ে যাবার পর, আলিআকবরকে গিয়ে বললাম, 'প্রথম পর্ব তো শেষ হোল। এবারে থিওরি লিখতে হবে।'

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সিনেমার এক পরিচালক তখুনি এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁর নূতন ছবির 'সুরের পিয়াসির' জন্য আলিআকবরকে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বললেন, 'একটা তারিখ দিন, যে তারিখে আপনি আপনার দলবল নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে, এ. কানন এবং লক্ষ্মীশঙ্করের দ্বৈত সঙ্গীতের একটি গান পরিচালনা করবেন।' আলিআকবর তাঁর কথাতে একটা তারিখ দিলেন। পরিচালক চলে যাওয়ার পরে আলিআকবর আমাকে বললেন, 'তুমি যদি এই ছবির আবহ সঙ্গীতের মধ্যে সরোদ বাজাও, তাহলে তোমাকে দিন প্রতি তিনশত টাকা দক্ষিণা দেব। তাতে তোমার কিছু বাড়তি আয় হবে।'

মনে মনে ভাবলাম পুরো ফিল্মের আবহ সঙ্গীতের জন্য যতদিন যাব, শেষ হওয়া পর্যন্ত দৈনিক তিনশত টাকা প্রাপ্তি, আমার কাছে বিরাট প্রলোভন কিন্তু সে প্রলোভন আমি জয় করলাম বাবার কথা ভেবে। আমার মৈহারের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। মৈহার থাকাকালীন আলিআকবর যোধপুরের চাকরি ছাড়ার পর বম্বেতে একটা সিনেমা কোম্পানীর অধীনে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে চাকরি নিয়েছিলেন। বাবা সেই কথা শুনে খুব রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি কি মেয়েদের পিছনে বাজনা বাজাবার জন্য সরোদ শিখিয়েছি।' বাবাকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝানো সত্ত্বেও অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'টাকাটাই কি সব?' বাবার সেই অগ্নি মূর্তি স্মরণ করে বললাম, 'আমি বাজাব না।' আমার কথা শুনে আলিআকবর বলল, 'নিখিল, আশিস এবং অন্যদের দিন প্রতি একশত টাকা করে দেবো। তুমি আমার কলেজের জন্য এতবড় কাজ করে দিচ্ছ বলে তোমাকে দিন প্রতি তিনশত টাকা দিচ্ছি। এতে তুমি মোটা টাকা পাবে।' আলিআকবর পাছে ভাবে আমি অসম্মান করছি তাই বললাম, 'ঠিক আছে দেখা যাবে।' কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি বাজাব না। আশিস এ কথা শুনে আমাকে বারবার যেতে বললো, আমি চুপ করে রইলাম। নির্দিষ্ট দিনে, আলিআকবর স্টুডিওতে যাবার আগে বলল, 'আশিসের সঙ্গে স্টুডিওতে সরোদ নিয়ে এসো।' আশিসের সঙ্গে স্টুডিওতে যেতেই আলি আকবর আমাকে বলল, 'সরোদ আনো নি?' উত্তরে বললাম, 'না। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।' দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গানের রিহার্সাল চলল, তারপর রেকর্ডিং শেষ হোল। এই প্রথম দিন কেবল গিয়েছিলাম তারপর আর যাই নি।

আমি কোলকাতায় আছি খবর পেয়ে, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারী শৈলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি লোক মারফৎ ডেকে পাঠালেন। লোকটির সঙ্গে গিয়ে জানতে পারলাম যে ডিসেম্বারে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনিতে আমাকে বাজাতে হবে। স্বীকৃতি জানিয়ে বাড়ী চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আলিআকবরের কলেজের কাজ শেষ করে তানসেনে বাজিয়েই তবে কাশী যাব।

এখন আমার আলিআকবর কলেজ অফ মিউজিক এর প্রসপেকটাস শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার থিওরি লেখা শুরু হবার কথা। ভাতখণ্ডেজীর বই দেখে হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ শুরু করলাম। প্রসপেকটাস ছাপান হোল।

আলিআকবর প্রসপেকটাস দেখে আমাকে বলল, 'শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তোমার নামটা লেখো নি কেন?' বললাম 'শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আমার নাম কেন থাকবে? আমি তো শেখাই না।' এ কথা শুনে আলিআকবর বলল, 'শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তোমার নামটা থাকলে ভালই হবে।' এই কথা বলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষকতা করতে আমাকে অনুরোধ করলেন। আলিআকবরের জিদে পড়ে কলেজে যোগ দিতে হোল। উপস্থিত প্রথম শ্রেণীর থেকে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হয়। অন্নপূর্ণাদেবী পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে শেখান। আলিআকবর তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাসে আমাকে নিয়ে গিয়ে, আমার পরিচয় ছাত্র ছাত্রীদের বলল, 'উপস্থিত এঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে।' আলিআকবর চলে গেল। ঘরে ঢুকবার আগেই বাজনা

শুনে বুঝেছিলাম জয়জয়বন্তী ছাত্র-ছাত্রীরা বাজাচ্ছিল। ক্লাসে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ক্লাসে কে শিক্ষা দেন?' একজন বলল, 'মাঝে মাঝে দাদা অর্থাৎ আলিআকবর শেখান, কিন্তু নিয়মিত নিখিলদা এবং আশিসদা শেখান।' ছাত্র ছাত্রীদের বললাম, 'যা শিক্ষা করেছেন বাজান।' সকলেই জয়জয়বন্তীর দুনী গৎ বাজিয়ে কয়েকটা তান শোনাল। একটা পাল্টা অর্থাৎ অলংকার বললাম বাজাতে। কেউ বাজাতে পারল না। সকলেই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। অন্য পালটা এবং একটা বোল বললাম বাজাতে। বাজাতে না পেরে ছাত্র ছাত্রীরা বলল, 'এ সব আমরা শিখিনি।' এ কথা শুনে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম, যা বাবার কাছে বরাবর শুনে এসেছি। বললাম, 'বাড়ীর ভিত মজবুত হলে তবে পঞ্চাশ তলা বানানো যায়, কিন্তু ভিতই যদি মজবুত না হয় তাহলে দু তলা বাড়ী তৈরী করলে বাড়ী পড়ে যায়। ভিত ঠিক থাকলে, যে কোন পালটা বা বোল না শিখলেও বাজান যায়।' যে সময় এই সব কথা বলছি, দেখলাম আশিস, ধ্যানেশ এবং নিখিল একবার উঁকি দিয়ে দেখে চলে গেল। ছাত্র ছাত্রীদের বললাম, 'উপস্থিত গৎ বাজাতে হবে না।' কয়েকটা পাল্টা এবং বোল বাজাতে বললাম। ছাত্র ছাত্রীরা ধীরে ধীরে বাজাতে লাগল। ক্লাসের সময় শেষ হোল। ক্লাস শেষ হবার পর বাইরে আসতেই, আশিস জিজ্ঞাসা করল, 'ছাত্র-ছাত্রীরা কি কোন দুষ্টুমি করেছে?' এ প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হলাম। কেন এই প্রশ্ন? বললাম, 'দুষ্টুমি কেন করবে?' আশিস বলল, 'একমাত্র বাবা ছাড়া আর সকল শিক্ষকদেরই এরা নাস্তানাবুদ করে।' আমি কথা শুনে অবাক। এই জন্যই কি আলিআকবর আমাকে এই ক্লাসে শেখাবার জন্য দিয়েছেন? যাক আমি এরপর অন্নপূর্ণাদেবীর পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস দেখতে গেলাম। আগেই শুনেছিলাম এই ক্লাস ছাড়া আর অন্য ক্লাসে শেখান না। এ ছাড়া শুনেছিলাম শেখানর সময় ছাত্র ছাত্রী ছাড়া আর কাউকেই ঘরে ঢুকতে দেন না। কিন্তু আমার বেলায় একটা ব্যতিক্রম হোল। ক্লাসে ঢুকতেই আমাকে বসিয়ে একটা ছাত্র এবং একটা ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ক্লাসের ছেলে মেয়ের বাজনা শুনে বুঝলাম, এরা যদি দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে লেগে থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ-এ ভাল বাজিয়ে হবে। ক্লাস শেষ হবার পর বললাম, 'দীর্ঘদিন হয়ে গিয়েছে শিক্ষা করি নি একদিন বাড়ি গিয়ে শিখব।' অন্নপূর্ণাদেবী রাজী হলেন। বুঝলাম বাড়ীতে শুভ ছাড়া আরো কয়েকজনে শিখতে যায়।

একদিন রবিবার সকালে শিখতে গেলাম অন্নপূর্ণাদেবীর নূতন ফ্লাটে। কোলকাতায় বালিগঞ্জে কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের উল্টো ফুটপাতে 'প্রেসিডেন্সি কোর্ট'-এর দুটো ফ্লাট নিয়ে থাকবার জন্য রবিশঙ্কর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ কথা জানা ছিলো বিমান ঘোষ বরাবরই প্রেসিডেন্সি কোর্টে থাকত। অবাক হয়ে ভাবি, এত অঘটন ঘটাবার পরও রবিশঙ্কর কি করে প্রেসিডেন্সি কোর্টে অন্নপূর্ণাদেবী এবং শুভর থাকার ব্যবস্থা করল। ব্যাপারটা আমার বোধগম্যর বাইরে।

প্রেসিডেন্সি কোর্টে এই প্রথম গেলাম। বিরাট বাড়ীতে বহু ঘর আছে। গিয়ে দেখলাম একজন ছাত্রী শিখছে। আমি কখনও কারো সামনে শিখি না। ব্যাপারটা অন্নপূর্ণাদেবী জানতেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'এই ছাত্রীটি চলে যাবে তারপর আপনাকে শেখাব।'

কিছুক্ষণ পরে ছাত্রীটি চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বাড়ীতেই কি বিমান ঘোষ থাকে?' উত্তরে বললেন, 'বিরাট বাড়ীর এক প্রান্তে থাকে।' শিখবার আগে কথা না বলে বাজনা নিয়ে বসলাম, ঘণ্টাখানেক শিক্ষা করে বাড়ী চলে আসবার পথে 'হেমেন এন্ড কোম্পানীতে' তাড়া দিলাম, যাতে তাড়াতাড়ি আমার সরোদ তৈরী করে দেয়। আমার কথায় হেমেন বলল, 'এত তাড়াহুড়ো করবেন না, কেননা ভাল করে সরোদ তৈরী করতে হলে আর একটু সময় দিতে হবে।' আগেই শুনেছিলাম একটা সরোদ তৈরী করতে একটা বছর লেগে যায়। তাই অপেক্ষা করাই ভালো।

উপস্থিত দিনরাত থিওরি লিখছি।

এই থিওরি লেখা, আলিআকবরের কলেজে শেখান, তারপর নিজের বাজনা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হোল। কিন্তু কি করব? বাবা যদি আদেশ না দিতেন তাহলে কখনই আমি এ কাজের ভার নিতাম না। কোলকাতার পরিবেশ আমার কাছে অসহ্য। কাশীর তুলসী মন্দিরের একান্ত পরিবেশ আমাকে বারবার টানতে লাগলো। কিন্তু উপায় নাই। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। পুজোর আগেই আলিআকবরের কাছে জানতে পারলাম বাবা লিখেছেন শরীর খারাপ। আলিআকবরের কাছে জানতে পারলাম বাবার শরীর খারাপ শুনে নিজের স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েকে মৈহারে পাঠয়ে দিয়েছেন কিছুদিনের জন্য।

বাবাকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
১৭-১০-৫৯

কল্যানবর,

শ্রী মান বাবা যতীন তুমার ঁবিজয়ার প্রণাম উভয়ে গ্রহণ করিলাম। আমাদের উভয়ের আসিবর্বাদ গ্রহণ করিবে। মা তুমাকে চিরসুখে রাখুন, চিরজীবি করুন এই আসির্ব্বাদ মায়ের কাছে প্রার্থনা করি।

বৌমা ও নাতি মাতিন এরা মঙ্গলমতে ১৬ তাং পৌঁছিয়াছে। আমার শরীর বিসেষ ভাল চলছে না, ঔষধ সেবন করি, এখন খুদার যা ইচ্ছা তাই মাথা পেতে গ্রহণ করিব। তুমার মায়ের শরীরও একরকম চলছে এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি

ইতি—
আলাউদ্দিন।

বাবা আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। বাবার বৌমা এবং নাতি নাতিন ভাল ভাবে মৈহারে পৌঁচেছে লিখেছেন। আলিআকবরকে চিঠি দেখালাম।

আলিআকবরের কলেজের ছাত্র ছাত্রীর জন্য থিওরি লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এখনও দুই মাস লাগবে। ভেবেছিলাম কাজ শেষ হয়ে গেলে নূতন সরোদ নিয়ে কাশীতে গিয়ে খুব বাজাব। নূতন সরোদ নিয়ে এবারে তানসেন কনফারেন্সে বাজাব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, নূতন

সরোদ তানসেন কনফারেন্সে বাজাবার আগে পাব না এবং থিওরি লেখা শেষ করতে বছর পেরিয়ে যাবে। আমার কাছে এখন কঠিন পরীক্ষা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রুটিন মাফিক কাজ করে যাই। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় বুঝতে পারি না। দেখতে দেখতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। বাবাকে একটা চিঠি লিখে জানালাম এবারে তানসেন কনফারেন্সে বাজাবার দিন এসে যাচ্ছে। আমার সব পরিস্থিতি জানিয়ে বাবার আশীর্বাদ কাম্য বলে প্রার্থনা জানালাম। কিছুদিন পরেই বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
৩-১১-৫৯

কল্যানবর,

শ্রী মান বাবা যতীন তুমার পত্র পাইলাম, সব অবগত হলেম। তানসেন কনফ্রেন্সে যাবে সেখানে খুব ভালভাবে বাজাও তুমার জস লাভ হক আসিবর্বাদ করি। তুমার দাদাকে বলিবে, তুমার মাকে ও অমরেশকে নিয়ে জাবার জন্য। প্রানেষ অমরেষকে নিয়ে গিয়ে মুসলমানি যত সিঘ্র হয়, সিতের সময় করাবার জন্য। সিঘ্র এসে যেন তাদের নিয়ে যায়। কলিকাতায় মুসলমানি করাতে হবে এখানে হাজ্জাম ভাল নেই। তুমার মায়ের আসিবর্বাদ নিবে, এক প্রকার তুমার কামনা করি।

ইতি—
বাবা

বাবা আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে কথা আলিআকবরকে জানাতে লিখেছেন তা তো বলব। জানি না প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠায় কি না? চিঠি পেয়েই আলিআকবরের কাছে গেলাম। বাবার চিঠি পড়ে শোনালাম। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর বলল, 'উপস্থিত কোলকাতায় এত কাজ ছেড়ে কি করে মৈহারে যাব? মৈহারে ছেলেদের মুসলমানী করালে কি অসুবিধা?' উত্তরে বললাম, 'ধ্যানেশের মুসলমানী করার সময় কত অসুবিধা হয়েছিলো। সেই কথা ভেবেই বাবা কোলকাতায় প্রাণেশ, অমরেশের মুসলমানী করাতে চান।' আমার কথা শুনে বললো, 'বাবাকে আমার পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দাও। এই সময়ে কি করে যাবো?'

বুঝলাম আলিআকবর যাবে না। কিন্তু বাবা কি অপেক্ষা করবেন? বাবার মনে যখন এসেছে তখন শীতকালেই মুসলমানী করাবেন।

বাবার এই চিঠি পেয়ে আলিআকবরের কথা মত চিঠি দিয়ে অন্তর থেকে সাড়া পেলাম না। কিছুদিন যাক, তারপর পরিস্থিতি বুঝে চিঠি দিলেই চলবে। দৈনন্দিন কাজ ঠিক মত চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পর তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সেক্রেটারি আমাকে লোক মারফৎ ডেকে বললেন, 'তানসেনে বাজাবার জন্য আপনার উস্তাদ বাবাকে নিমন্ত্রণ করেছি কিন্তু কোন উত্তর এখনও পেলাম না। এরকম তো কখনও হয় না। আপনি একটা চিঠি লিখুন আমার তরফ থেকে।' সম্মতি জানিয়ে বাড়ী এসেই বাবাকে চিঠি লিখলাম। কোলকাতার পরিস্থিতি জানালাম।

এক একটা দিন কি ভাবে কেটে চলে যায় বুঝি না। নিজের কাজ নিয়েই থাকি। সঙ্গীত

নিয়ে নানা লোকে নানা আলোচনা করেন। এর মধ্যে একদিন একজন অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ আমাকে বললেন, 'সঙ্গীতটা আজকাল ব্যবসার মত। সকলের সঙ্গে মিশুন। লোকের সঙ্গে কমার্শিয়াল হাসি হেসে নিজের কাজ গুছোন।' উত্তরে বলি, 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ আমার সঙ্গে মিশলে কারো ভালো হয় না। অপরের দুর্ভাগ্যকে আমি কেন ডেকে আনবো। আমি তাই নিজের ম'তো করে থাকতে চাই।' আমার কথা শুনে অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ বললেন, 'আজকের যুগটা হচ্ছে ডিপ্লোমাসির যুগ অর্থাৎ কূটনীতির যুগ। এখানে যে সকলকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে সেই জিতে যাবে। আপনার উস্তাদের যুগের জগৎ আর এ যুগের জগৎ আলাদা। আজকের যুগে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে বিখ্যাত হতে গেলে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তাতে ইজ্জত ডবল হয়ে যায়।' একসঙ্গে এত কথা বলে বললেন, 'আপনি লেখাপড়া করেছেন। কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপকের পদ আমি ব্যবস্থা করে দেবো। আলিআকবর কলেজে কাজ করে কি হবে?' অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ গুরু স্থানীয় লোক। হেসে বললাম, 'এ কথা আপনাকে কে বলল যে আমি আলিআকবরের কলেজে চাকরি করছি? আমি তো বাবার আদেশে আলিআকবরের কলেজের প্রসপেটকাস তৈরী করে থিওরি লিখছি। থিওরি লেখা শেষ হলেই আমি কাশী চলে যাব।' আমার কথা শুনে গুরু স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ বললেন, 'আলিআকবরের কলেজে চাকরি না করলে প্রসপেকটাসে শিক্ষকদের মধ্যে আপনার নাম কেন লেখা আছে?' এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম। সঙ্গীতজ্ঞ অনেক খবর রাখেন। বললাম, 'নামটা আলিআকবরের কথায় বাধ্য হয়ে লিখেছি। আপনার সৎ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তবে আপনাকে এ কথাও বলে রাখি আপনার প্রস্তাব মত ইসলামিয়া কলেজে চাকরি করবো না।' অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞের কথাগুলো নাড়া দিল মনে। বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

মাইহার
২৪-৭-৫৯

কল্যানবর,

শ্রীমান বাবা যতীন তোমার পত্রে সব বিসয় অবগত হলেম। কলিকাতা আমি যাব না, তার কারণ আমার দুই নাতিকে মুসলমানি করিয়েছি। প্রানেসের মুসলমানি করার পর তার পুরূসঙ্গ ফুলে, পেকে গেছে ও পুঁজ বের হয়, এখন ডাক্তারের চিকিৎস্বা আরম্ভ হয়েছে, পরে কি হবে ভগবান জানেন। এ সব কারণে আমি খুব দুঃখিত জানিবে, এদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে যাতে এদের শুস্ত শরীর লাভ হয়। তুমার মায়ের আসিবর্বাদ নিবে এক প্রকার তুমার কুশল কামনা করি।

ইতি—
বাবা আলাউদ্দিন

যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। বাবা দুই নাতির মুসলমানী মৈহারে করিয়ে দিয়েছেন। বাবা ঘাবড়েছেন। ধ্যানেশের সময় যে রকম হয়েছিল প্রাণেশের সময় তাই হয়েছে। যদিও চিন্তার

কোন কারণ নাই কিন্তু বাবাকে তো জানি। সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন। এই কারণেই কোলকাতায় আসবেন না। শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যাপারটা টেলিফোন করে বললাম কেন বাবা আসছেন না। আলিআকবরকে চিঠিটা পড়ালাম। আলিআকবর নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সত্যই আলিআকবরের তুলনা নাই।

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলে রাখি। আমার জীবনে আমার গুরুবংশের মধ্যে আলিআকবর বা রবিশঙ্কর সম্বন্ধে কেউ বিরূপ মন্তব্য করলেই আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে যেত। এঁর জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তাঁর কারণ আলিআকবরের বা রবিশঙ্করের বাজনা সম্বন্ধে যদি কেউ বাজে কথা বলতো তখনই রাগে ফেটে পড়তাম। তাঁর জন্য অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে যেতাম। এমন কি অনেক সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ণধারদেরও অযৌক্তিক কথায়, আমি প্রতিবাদ করার ফলে পরের বারে শিল্পী তালিকার মধ্যে থেকে আমার নাম কেটে বাদ দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও আমি কর্তব্য ভ্রষ্ট হই নি। শ্রোতাদের কাছ থেকে যদিও আমি বরাবর অকৃপণ সমাদর পেয়েছি তবু আমার এই স্বভাবের জন্য সঙ্গীতের কর্ণধারদের কাছ থেকে নানা সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমি সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি কিন্তু যাঁদের জন্য আমি এই শাস্তি পেয়েছি, তাঁদের কাছে এই সব ঘটনা প্রকাশ করে বলি নি। তবে মজার কথা এই যে, তাঁরা কিন্তু সেই সব কর্ণধারদের সঙ্গে বরাবর আপোষ করে নিয়েছেন। ফলে আমারই ক্ষতি হয়েছে।

এ কালের একজন সঙ্গীতজ্ঞ একবার আমাকে বললেন 'যদি বড় সঙ্গীতজ্ঞ হতে চাও, তবে দুটো কথা মনে রেখো। প্রথম কথাটা হোল যখন কোন শিল্পীর গান বাজনা শুনবে, তাঁর সঙ্গে চোখাচুখি হলেই হাত, চোখ, মুখ নেড়ে সমঝদার বা রসিকের ভূমিকায় অভিনয় করবে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ণধার, যা বলবেন তার হাঁ এ হাঁ এবং না এ না বলবে। কেননা প্রত্যেক লোকেই, কারোর না কারোর ভক্ত হতে পারেন। তোমার কাউকে ভাল লাগুক বা না লাগুক তবুও যাঁর বিষয়ে সঙ্গীতের কর্ণধাররা প্রশংসা করবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 'আরে আপনি তো জহুরি। আপনার চেয়ে বেশী আর কে বোঝে।' উপরোক্ত দুটি উপদেশই আমার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। এই স্বভাবের জন্য সঙ্গীত সম্মেলনের বহু কর্ণধাররা আমাকে সব রকমের সুযোগ, সুবিধা এবং সমাদর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন।

অনেকে শিল্পীই যা সহজে পারে আমি তা পারি নি। বাজনাতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যদের মত দ্রুত উন্নতি করতে পারি নি। আজকাল যাঁকে সপ্রতিভতা বলে সেই অর্থে সপ্রতিভ হতে পারি নি। এক কথায় উচ্চাকাঙ্খাহীন সাধারণ এবং অল্পেই সন্তুষ্ট থেকেছি। এইভাবে চলছে দিন। অনেক দিন কেটেও গেল আর কতদিন যাবে বিধাতাই জানেন। যদি দীর্ঘায়ু পাই, তাহলেও হয়ত এই ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত হবে। তবুও বাবা আমাকে যে গুরুদায়িত্ব পালন করতে বলেছেন, সেই গুরুভার নিয়েই যেন জীবন কাটাতে পারি, এটা আমার অন্তিম কামনা।

যাক যে কথা বলছিলাম, আমার গুরু বংশের কারোর নামে কেউ যদি কিছু অপবাদ দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে অত্যন্ত ব্যথা বাজে। কিছুদিনের মধ্যে যে দুইজন

আমার অত্যন্ত অনুরাগী ছিল, যাঁরা সব জায়গায় আমার বাজনার অনুষ্ঠানের সাহায্য করত, অকারণ বাকবিতণ্ডার ফলে তাঁরা দুজনেই আমার প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। এর একমাত্র কারণ হোল যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না, যে সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে সাংস্কৃতিক লক্ষণ এবং আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভ। সে দম্ভ কখনও অর্থের, কখনও বিদ্যার, কখনও বা প্রতিপত্তির।

তাই যখনই কারো মিথ্যা অহংকার দেখতাম বা মিথ্যা ভাষণ শুনতাম, তখনই বাবার কথাগুলো মনে পড়তো। অথচ অবাক হয়েছি, যাঁরা আমার সামনে আমার গুরু বংশের নিন্দা করছে, তাঁরাই গুরুবংশের লোকেদের সামনে তাঁদের অম্লানবদনে প্রশংসা করছে। মানুষের এই বিপরীত আচরণ দেখে আমি বড় ক্ষুব্ধ হয়েছি। আজকাল বাইরে ও ভেতরের আচরণের বৈপরিত্যই জনপ্রিয়তার একমাত্র নিরিখ। অথচ সে কালের বড় বড় গুণী উস্তাদদের দেখেছি, তাঁরা হয়ত টিপ সই করে টাকা নিচ্ছেন কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁরা ছিলো আরো অনেক উদার।

আমার দুজন শুভাকাঙ্খীকে আমি কিছুদিনের জন্য হারালাম। আমার মনের তাগিদে সত্য কথাই লিখছি। তাতে যদি কেউ আমার সত্য লেখায় কষ্ট পান তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার শুভাকাঙ্খী দুজনের নাম লিখলাম না, কেননা দুনিয়ায় ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসার একবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াতো। কোথাও রসের বাষ্পটুকুও জমবার ঠাঁই পেতো না। যে হেতু তাঁরা দুজনেই তাঁদের ভুল বুঝেছে তাই তাদের নাম লিখলাম না, নইলে নিশ্চয়ই তাঁদের নাম লিখতাম। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আমার খুবই ভাল সম্বন্ধ হয়েছে বহুদিন পর। উপরোক্ত দুজনই আমার নামে বহু অপবাদ প্রচার করেছে অভিমানী, অহঙ্কারী বলে। যার জন্য আমার বহু অনুষ্ঠান নাকচ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তার জন্য আমার দুঃখ নাই।

এবারে একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করি। একদিন কোলকাতায়, আমার এক বন্ধু যে আলিআকবরের অত্যন্ত অনুরাগী তাঁকে নিয়ে ভারতের এক বিখ্যাত তবলা বাদকের নিমন্ত্রণে গিয়েছি তাঁর বাড়িতে। তিনি এককালে আমার অনুরাগী ছিলেন। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তিনি তাঁর এক পরমাত্মীয়ের সঙ্গে বসে নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য হিসাবে মদ্যপান করছেন। নিজের সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে তিনি আত্মপ্রচার শুরু করলেন। নেশার ঝোঁকে বলে বসলেন, 'আরে রবিশঙ্কর ও আলিআকবর কি বাজায়? তাঁরা যা বাজায় তাঁর প্রত্যেকটার জবাব আমি দিতে পারি, অথচ আমি যদি একটা বাজাই একটারও জবাব তাঁরা দিতে পারবে না।' এ কথা শুনে বড় অসন্তুষ্ট হলাম। অথচ এই তবলা বাদককে একদিন রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরের সামনে খুব প্রশংসা করতে দেখেছি। তবলা বাদকের কথার জবাবে আমি বললাম, 'আপনার জবাব তাঁরা কেন দেবে? আপনি তো সঙ্গত করবেন, জবাব তো আপনিই দেবেন। তবলাবাদকেরই তো জবাব দেওয়ার নিয়ম।' আমার কথায় একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আসলে শিল্পীরা তবলাবাদককে মানুষ বলেই মনে করে না। আমি সে রকম তবলা বাদক নই। আমি ওদের উপর চড়ে বাজাই।' এই কথা শুনে আমি আর

নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বললাম, আপনি যে বললেন তাঁরা তবলা বাদককে মানুষ বলে মনে করে না, ঠিকই করে। আগে তবলা বাদকরা বরাবর মাটিতে বসত এবং গায়ক বাদকেরা বসত মঞ্চের উপরে। এ কথা কি আপনি ভুলে গেছেন? বাঈজীদের গানের এবং নাচের সঙ্গে, বিয়ে বাড়ীর উৎসবে তো তবলা বাদকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে তবলা বেঁধে বাজাত। তখন আর এখন? তখনকার দিনে বাঈজীরা গান, নাচ জানত। নাচ না জানলেও গান জানত। অনেকে আবার দুই জানত। এক রাত্রে গান গেয়ে এবং নেচে বহু টাকা পেত। এই গান নাচের জন্য সারেঙ্গীবাদকেরা দুই আনা, মঞ্জিরা বাদকেরা এক আনা পেত। তবলচীর দুই আনা, আর হারমোনিয়াম বাদকেরা ছয় পয়সা বাদ দেবার পর যা পেত, তাতেই মাসীকে টাকা দিয়ে মহারাণীর মত দিন কাটাত। আরো অনেক ছিলো। বখসিসের টাকা দিলে তাঁরও ভাগ হ'তো। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা রেড লাইট এরিয়াতে চিরকাল এই করেই জীবন কাটিয়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছেন। ছোট থেকে আপনারা তা দেখে নিজের ভেতরেও তার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সময় পালটেছে যাঁর ফলে আজ আপনারা তবলা বাদকরা যে সম্মান পাচ্ছেন, তার জন্য রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরকে আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। এখন মঞ্চের পেছনে, তবলা বাদকরা গায়ক বাদকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেন, তবে আসরে এসে বাজান, পাছে জলসায় অসম্মান না হয়। আগে ছিল সত্যকারের বিদ্যার পরীক্ষা। এখন গায়ক বাদকের সঙ্গে তবলা বাদকের সহযোগিতার জন্য সম্মান পান।'

আমি আরও বললাম, 'আমি তো এঁদের তুলনায় কিছুই নই। এবারে যখন কোলকাতাতে খুব শীঘ্রই আপনার সঙ্গে বাজনা হবে, তখন আপনি যা ইচ্ছা বাজাবেন, তাঁর জবাব আমি দেব এবং আমি যা বাজাব তাঁর যদি একটারও জবাব দিতে পারেন, তাহলে সরেদ বাজনা ছেড়ে দেব। ভুলে যাবেন না এ শিক্ষা আমি পেয়েছি। ভুলে যাবেন না আমি কার ছাত্র?' এ কথায় ঘৃতে আহুতি পড়ল। এমন কথা আমার কাছে আশা করে নি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নেশা ছুটে গেছে। আমাকে বলল, 'তোমাকে আমি এত ভালবাসি আর তুমি এমন কথা বললে? আসলে রবিশঙ্কর ও আলিআকবর তোমার বিরুদ্ধে কি বলে জান?' উত্তরে বললাম, 'তাঁরা আমার সম্বন্ধে কি বলে জানতে চাই না। ভুলে যাবেন না আলিআকবর আমার গুরুপুত্র এবং রবিশঙ্কর আমার গুরুর জামাই।' এই বলেই আলিআকবরের অনুরাগীকে নিয়েই স্থান ত্যাগ করলাম। এই তবলা বাদক বিভিন্ন জায়গায় আমার অনুষ্ঠানের আয়োজন করত কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর সে আমার উপর বিরূপ হয়ে, সমস্ত সহযোগিতার সম্পর্ক ত্যাগ করল।

উপরোক্ত ঘটনার পর দিনই আলিআকবরের বাড়ী গেলাম দেখা করতে। গিয়ে দেখি, আমার গত দিনের আলিআকবরের অনুরাগী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। আমার আলিআকবরের বাড়ীতে এই যাওয়াটা বরাবরের রীতি, কেননা কোলকাতাতে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আগে আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসি। আমি যেতেই আলিআকবর বললো, 'গতকাল তোমার কি হয়েছিল?' বুঝলাম আলিআকবরের অনুরাগী সেই লোকটা গত কালের ঘটনার সবই বিবরণ দিয়েছে। বললাম, 'সবই তো শুনেছেন নূতন করে আর কি

বলব?' আলিআকবর বলল, 'এই সব লোকের সঙ্গে মুখে কিছু বোলো না, কেননা এঁরা কথায় কথায় যাতা গালাগালি করতে পারে। তুমি লেখাপড়া করেছ। তুমি এঁদের কথায় উত্তর না দিয়ে বাজিয়ে জবাব দেবে।' দাদার মতই শিক্ষা দিলেন। এ কথা শুনে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলতেন, 'মন তুমি বুঝ বড়, নিজের ছিদ্রের নাই পারাবার। পরের ছিদ্র তালাশ কর।' সেই কথাটি আমি সর্বদাই পালন করেছি। একঘণ্টা আলিআকবরের বাড়ীতে কাটিয়ে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম। রাস্তায় আলিআকবরের অনুরাগী বলল, 'আলিদা বলছে, 'যতীন ঠিকই বলেছে। ও যেমন বলেছে সেই রকম করতে পারে কেননা বাবার কাছে সে শিক্ষা পেয়েছে।' এত বড় সার্টিফিকেট আমার জীবনে এই প্রথম।

কয়েক দিন পরে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে আমার বাজনা ছিল। তবলা বাদকের সঙ্গে দেখা হোল কেননা সেই বাজাবে। মঞ্চের পেছনে তিনি আমাকে অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে এক খিলি পান এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা বেনারসী পান।' আমি পানটি প্রত্যাখ্যান করে বললাম, 'আমার নিজের কাছে বেনারসী পান আছে।' বাজনার কিছু আগে তবলা বাদকের আত্মীয়, যে ঘটনাস্থলে ছিলো তাঁর সঙ্গে দেখা হোল। তাঁর আত্মীয়টি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'ভাইয়া সে দিনের কথা মনে রাখবেন না। সে সব কথা নেশার ঝোঁকে বলেছিলো। খুব মিলে মিশে বাজান। আমাকে বলেছে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলতে। উনি আপনাকে দারুণ ভালোবাসেন।' এই কথা শুনে আমার রাগ কমে গেল। ভাবলাম রাগ করে বাজালে, সুরের কাজ হবে না, কেবল লড়ন্তই হবে। সেটা ঠিক নয়, তা সত্ত্বেও বাবার শেখান সাথ সঙ্গতে তিনচারবার এমন বেকায়দায় ফেললাম যে সে পারল না। শ্রোতারা টিটকিরির ভঙ্গিতে হেসে উঠল। বাজনা শেষ করে চলে এলাম। এইখানে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, যে যত বড়ই তবলা বা মৃদঙ্গ বাদক হোক না কেন, যদি অভিমান দেখায় তাঁর হাত বন্ধ করার কায়দা গুরুর কৃপায় জানা আছে। কিন্তু যে বিনয়ী, সে যদি অতি সাধারণ তবলা বাদকও হয়, তার মত করে বাজাই। কেননা জলসাতে বসে তার সম্মান হানি করি না। এ আমার গুরুর শিক্ষা এবং আদেশ। যে কথা আমি আগেই লিখেছি, যখন বাবার কাছে কঠিন গৎ, নানা তাল, অর্দ্ধমাত্রার তাল এবং নানা রকম প্যাঁচ তবলা বাদককে জব্দ করার জন্য শিখেছিলাম, সেই সময় বাবা বলেছিলেন, 'কেউ যদি তোমাকে ছোট করে দেখে তখন এই সব কঠিন লয় এবং নানাবিধ জিনিষ বাজাবে। এই সব বাজালে সঙ্গে সঙ্গে তবলা বাদক জব্দ হয়ে যাবে।' এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে একটা কথা বলি, রবিশঙ্কর এবারে কোলকাতায় এসে সব কথা শুনেছে, তা সত্ত্বেও রবিশঙ্কর আলিআকবরকে নিয়ে জোর করে তবলাবাদকের বাড়ী গিয়ে ডালভাত খেয়েছে। এঁরা দুনিয়াদারী জানে। এঁরা এইজন্য গেছে যাতে এই ধরনের কথা অন্য জায়গায় না বলে। এই দুনিয়াদারী আমি জীবনে করতে পারলাম না। তাই তো আমার আজ এই অবস্থা। রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরের জন্য আমি বহু জায়গায় এই ধরনের প্রতিবাদ করে নিজের সর্বনাশ করেছি।

আর একটা উদাহরণ দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব। সঙ্গীত সম্মেলনের একজন কর্ণধার আমাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। একদিন তাঁর কাছে গিয়েছি। কিছু লোক আরো সেখানে

ছিলেন। ভদ্রলোক কথায় কথায় বললেন, 'রবিশঙ্করের বাজনা আজকাল খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেবল আলাপটাই ভাল বাজায়।' এই কথার উত্তরে যদি বলতাম, 'আপনি জহুরি, আপনাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?' তা হোলে তিনি খুশী হতেন। কিন্তু এই মিথ্যা স্তুতিবাদ না করে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে আমার গলার আওয়াজ তার সপ্তকে গেল। বললাম, 'আপনি সঙ্গীতের কি বোঝেন? যদি সে খারাপই বাজায় তাহলে তাকে প্রত্যেক বছর ডাকেন কেন? কনফারেন্সের কর্ণধার বলে আপনি কি সঙ্গীতে নিজেকে বড় সমঝদার মনে করেন।' এই একটা কথাতে আমি চিরকালের মত তাঁর বিরাগভাজন হয়ে গেলাম। এ কথাটা রবিশঙ্করের কানে কি করে গেল জানি না, কিন্তু তিনি লোকমুখে সবই শুনতে পেলেন। এর কিছুদিন পরেই রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'হঠাৎ এই লোকটার উপর রাগ করতে গেলে কেন?' তিনি এই কথা মুখে বললেও মনে মনে বুঝলাম তিনি আমার কথায় খুশী হয়েছেন। কেননা তাঁর চাউনি দেখলেই আমি তাঁর মনোভাব বুঝতে পারি। উত্তরে আমি বাবার একটা কথা বললাম। বাবা প্রায় বলতেন, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান আর সব গরু। জান না যে যারে ঠকাতে যায় সে তাঁর গুরু।' কিন্তু আশ্চর্য। এই ঘটনার পর আমার সঙ্গে সেই কর্ণধারের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হলেও, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটল। এর জন্য আমি মোটেই অনুতপ্ত নই। কেননা সঙ্গীতটাকে কখনও আমি বানিজ্য হিসেবে দেখি নি। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার শিক্ষা আমি পাই নি। মাথা তুলে চলাই আমার পথ। ব্যর্থ যদি কোথাও হই দুঃখ করবো না। বারে বারে সম্মানের সঙ্গে সাফল্যের চেষ্টাই করবো। আর কিছু না হোক মাথা হেঁট করে কাঁদতে বসবো না।

যাক তিনবছর পর কোলকাতায় আবার আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের দ্বৈত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে। সঙ্গে সঙ্গীতে আল্লারাক্‌খা। সেই একই আসরে, দ্বৈত অনুষ্ঠানের পর বিলায়েৎ খাঁর বাজনা হবে শামতা প্রসাদের সঙ্গে।

এ কথা শুনে তানসেন সম্মেলনের সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি ধরনের প্রোগ্রাম রেখেছেন? বাজনার পর বাজনা।' বললেন, 'বিলায়েৎ খাঁর একটা সর্ত আছে। যে সম্মেলনে রবিশঙ্কর বাজাবে, সে সম্মেলনে বিলায়েৎ খাঁ সর্বশেষ প্রোগ্রাম করবে। যেহেতু কোন গায়ক নাই, সেইজন্যই পর পর যন্ত্রের প্রোগ্রাম রেখেছি।'

যাক দ্বৈত অনুষ্ঠানের সুন্দর কার্যক্রমের পর আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করলাম। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই বলল, 'চলো।' রবিশঙ্করকে বললাম, 'বিলায়েৎ খাঁর বাজনা শুনব, কারণ এ যাবৎ একক বাজনা শুনবার সুযোগ হয় নি।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'নিশ্চয়ই শোনো, তবে বাজনা শেষ হবার পর দুপুর বেলায় ডি.সি.এম.-এর গেষ্ট হাউসে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।'

কথা শুনে আমি আলিআকবরের দিকে তাকালাম। আলিআকবর, স্বভাব অনুযায়ী নির্বাক। যাক রবিশঙ্করের কথায় সম্মত হয়ে নিজের আসনে বসলাম। অবাক হলাম রবিশঙ্কর কেন দীর্ঘদিন অদর্শনের পর আমাকে ডাকল? গত বছর ডেকেছিলো, কিন্তু আমি যাই নি। কিন্তু স্থির করলাম এবারে যাব, কেননা অন্নপূর্ণা দেবীর কথা ভেবে সামনাসামনি কথা বলা

দরকার। যদিও আলিআকবরের কাছে শুনেছি মিটমাট হয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও আমি নিজে কথা বলব। ইতিমধ্যে মঞ্চে বিলায়েৎ খাঁ এল।

দাঁড়িয়ে একটা বিনয় ভাষণ দিলেন। বললেন, 'আমি আপনাদের পায়ের ধূল। ভুল কিছু হলে ক্ষমা করবেন ইত্যাদি।' এই বিনয় ভাষণে করতালিতে জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠল। অবাক হলাম। বাজাবার আগে এ কোন বিনয়? যাক, তারপর আলাপ শুরু হয়েছে কি না হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে একসঙ্গে বাহবা, ক্যা বাত, রব উঠল। এ যেন গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমি যা বুঝবার তা বুঝলাম। তিনি একটা ম্যাজিক দেখালেন। বাজনার পর বিলায়েৎ খাঁ ঘোষণা করলেন যে তিনি একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে, সেই গানটি বাজনাতে শোনাবেন। সমস্ত হল শুদ্ধ লোক আবেগে সোচ্চার হয়ে উঠল। তিনি এক লাইন করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গান আর সেই লাইনটা সেতারে বাজান। তিনি পুরো গানটা একবার বাজিয়ে সমস্ত শ্রোতাকে মুগ্ধ করে দিলেন। বাবার কাছে জোড় শেখবার সময়, মাঝে মাঝে, লয়ে সীতারাম সীতারাম, রামরাম সীতারাম বলে বাজিয়ে দেখাতেন। এ ছাড়া শেখবার সময় ধ্রুপদ, ধামারে গান গেয়ে বাবাকে বাজনায় বাজাতে দেখেছি। কিন্তু এখানে যা দেখলাম, তা অকল্পনীয়। ছোট বেলায় সিনেমার গান হারমোনিয়ামে বাজালে বাড়ীতে যে দুধ দিতো তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেছি। গানটা সে বুঝেছে। নিজেকে সমঝদার মনে করেছে। বাবা বলতেন, 'কনফারেন্সে যখন সাথসঙ্গতের সময় হাততালি পড়ে, তখনই বুঝি কত মুর্খ শ্রোতা। বাজনা শুনে লোক মোহিত হবে। একটু আওয়াজ হলে লোকে বিরক্ত হবে।' কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় পরে বুঝেছি, কিন্তু শিল্পী নিজের ভাড়াটে লোক রেখে হাততালি দেওয়ায়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, নিজের সম্বন্ধে অকপটে বলতে পারি, দীর্ঘ তিরিশ বছরে কখনও নিজের লোককে দিয়ে তালির ব্যবস্থা করি নি। আমার সঙ্গে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাই, এবং বাজাবার পর নিজ স্থানে যাত্রা করি। এখন বুঝি বাবা কেন বলতেন 'পার্টি পার্টি'। সঙ্গীতটা আজ বুঝলাম ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের ঢাক যে নিজেকে পিটোতে হয়, এ শিক্ষা তো বাবার কাছ থেকে পাইনি। এখন বুঝছি সঙ্গীত জগতে কত রকমের দলাদলি।

রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন বাজালো শুনলে?' আমি আসরের সমস্ত বিবরণ দেবার পর রবিশঙ্কর বললো, 'বুঝলে, আজকাল সঙ্গীতের মধ্যে এই সব হয়েছে। সঙ্গীত ছেড়ে এখন সবাই ম্যাজিক দেখাচ্ছে।'

হঠাৎ দেখলাম বিমান ঘোষ ঘরে ঢুকল। যাঁকে নিয়ে এককালে কত ষড়যন্ত্র, চাকরি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য কত তোড়জোড়, তার সঙ্গে আবার এই স্বাভাবিক সম্পর্ক দেখে আমার খুব বিস্ময় বোধ হোল। রবিশঙ্কর বলল, 'কয়েক মাস পরে অন্নপূর্ণা এবং শুভ বম্বেতে যাবে। আমি ঠিক করেছি, এরপর থেকে বম্বেতেই স্থায়ী ভাবে বাস করব। উপস্থিত অন্নপূর্ণা এবং শুভ কোলকাতায় থাকবে।' চুপ করে শুনলাম। রবিশঙ্করের সামনে বিমান ঘোষকে কিছু ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। বিমান ঘোষকে একটি কথাই জিজ্ঞেস করলাম, 'উপস্থিত এখন কোথায় আছেন?' বিমান ঘোষ বলল, 'দিল্লী রেডিও থেকে বদলী হয়ে উপস্থিত কোলকাতায় আকাশবাণীতেই এসেছি। প্যাম এভিন্যুর কাছে,

প্রেসিডেন্সি কোর্টে যেখানে ভাইডু ফটোগ্রাফারের দোকান, তার উপর তলাতেই থাকি। বিরাট বাড়ী। বহু ফ্ল্যাট আছে। বাড়ীটা একটা বিরাট লজ। সেই বাড়ীতে অন্নপূর্ণা এবং শুভ আছে।' বিমান ঘোষ রবিশঙ্করের সামনে এইরকম বন্ধুর মত কথা বলছে কি করে এইটা ভেবে আমি তখন অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রবিশঙ্কর আমায় বলল, 'মৈহারে বাবার কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তা কি তুমি পড়েছিলে?' এই নিয়ে এক প্রশ্ন কয়েকবার শুনেছি। আমি বরাবর উত্তর দিয়েছি 'হুঁ'। সেকথা শুনে, রবিশঙ্করের মুখের চেহারাটা ঈষৎ বদলে গেল, কেননা তাতে রবিশঙ্কর বাবাকে লিখেছিল, 'যতীনকে মৈহার থেকে তাড়িয়ে দেবেন।' রবিশঙ্কর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিল। একলা থাকলে রবিশঙ্কর এবং বিমান ঘোষের সঙ্গে নানা আলোচনা করতে পারতাম কিন্তু তা সম্ভব নয়। সেই জন্য বললাম, 'এখন যাই।' রবিশঙ্কর আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য কয়েক পা এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে বলল, 'এবারে তুমি একটা বিয়ে কর। বিয়ের তো বয়স হোল।' উত্তরে বললাম, 'বিয়ে করব না বহু দিন আগের থেকে ঠিক করে নিয়েছি।' রবিশঙ্কর বলল, 'না, না, বিয়ের দরকার।'

দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় বসে কলেজের জন্য থিওরি লেখা শুরু করলাম। পরের দিন কলেজে গিয়ে ক্লাস নিলাম। কলেজে শেখাবার পর হেমেনের দোকানে গিয়ে বললাম, 'দেখুন আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলিআকবর কলেজের মাসিক অধিবেশনে, আমার বাজনার ব্যবস্থা করেছেন আল্লারাক্খার সঙ্গে বছরের শেষে। সরোদটা পেলে কয়েকদিন বাজিয়ে যাচাই করে নিয়ে তবেই আমি কাশী যাব। যথাসময়ে সরোদ পেলাম। সরোদটা কয়েকদিন বাজালাম। খুব ভাল সরোদ হয়েছে। যে মীড় বাজাতে চারটে টোকা লাগাতে হ'তো, সেটা এক টোকাতেই বাজাতে পারছি। বাবার কথা মনে হোল। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'যন্ত্র ভাল হলে কথা বলে।' এতদিন আমি কি করে বাজিয়েছি বুঝি না। কয়েকদিন বাজাবার পর অন্নপূর্ণাদেবীকে গিয়ে সরোদটা দেখালাম। বাজালাম কিছুক্ষণ। বাজনা শুনে বললেন, 'হেমেনকে গিয়ে বলুন ভেতরটা আরো একটু খোদাই করতে, তাহলে আওয়াজটা আরো খোলা হবে।' হেমেনের দোকানে গিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর নির্দেশটা বললাম। এ কথা শুনে হেমেন চামড়াটা বাটালি দিয়ে ছিঁড়ে দিলেন। বললেন, 'আটদিন পর সরোদটা তৈরী করে দেবো। ঠিক আটদিন পরেই সরোদ পেলাম। কয়েকদিন বাজিয়ে আবার অন্নপূর্ণাদেবীকে গিয়ে বাজনা দেখালাম। কিছুক্ষণ বাজনা শুনবার পর বললেন, 'এবারে ঠিক হয়েছে।' এখনও মাঝে মাঝে যন্ত্রের কথা উঠলেই, ভাবি কি করে অন্নপূর্ণা দেবী বুঝেছিলেন, সরোদের ভেতরটা আর একটু খোদাই করলে খোলা আওয়াজ বেরোবে। আমার কাছে এ এক বিস্ময়।

ঠিক চার মাস কোলকাতায় থেকে আলিআকবরের কলেজের প্রসপেকটাস এবং থিওরি লেখা শেষ করলাম। বাবাকে একটা চিঠি দিলাম। বাবাকে সব সংবাদ জানিয়ে লিখলাম, কোন চিন্তা না করতে। বছর শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। কলেজের কাজ শেষ হবার পর, আলিআকবর কলেজের তরফ থেকে আমার প্রোগ্রাম রাখা হোল কলেজের ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সামনে বাজাবার জন্য। এই প্রথম আল্লারাক্খা আমার সঙ্গে তবলায়

সঙ্গত করলেন। আলিআকবরের সেক্রেটারি অত্যন্ত সঙ্গীতের ভক্ত, সুদক্ষ এবং শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, 'আজ আমরা সম্মান যতীনবাবুকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি বাবাকে। কেননা, যার কাছে উনি দীর্ঘ সাত বছর ধরে শিক্ষানবিশি করেছেন। যতীনবাবুর বাজনা শুনে যদি শ্রোতারা খুশী হন, তা হলে তা বাবারই গৌরব।' আমি এই ভাষণ শুনে আরো সচেতন হয়ে গেলাম। ভাবলাম, আমি যদি আজকে ভাল করে বাজাতে না পারি, তা হলে শুধু আমার নয়, বাবার শিক্ষা দানের উপরেও কলঙ্ক লাগবে। তাই বাবার নাম স্মরণ করে চোখ বুজে বাজাতে লাগলাম। আমার সামনে আলিআকবর, বাহাদুর, আশিস, নিখিল, ধ্যানেশ এবং সব শিক্ষক ছাড়াও কলেজের ছাত্র, ছাত্রী এবং অন্যান্য দর্শক বসেছিল। মনে আছে বাজিয়েছিলাম ইমন। আলাপ বাজিয়ে অতি বিলম্বিতে যা আজকাল সচরাচর কেউ বাজায় না, তাই বাজিয়েছিলাম। এই অতি বিলম্বিত গৎ এ উঠান ওঠালে তার মধ্যে মজা থাকে না। সুন্দর ঠেকা লাগান ছাড়া উপায় নাই। যাই হোক তারপর একটু লয় বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লারাক্‌খা খুব তেহাই দিয়ে বাজাতে লাগলেন। আমিও বাজালাম। এর পর যখন দেখলাম, সে বাজিয়েই চলেছে তখন তাঁর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা বিরাট লম্বা চক্রদার নানা ছন্দে বাজিয়ে দিয়ে তিহাই শেষ করলাম। সকলেই প্রশংসা করলো। আল্লারাক্‌খা একটু থতমত খেয়ে, এর জবাব দিতে গিয়ে ছোট একটা চক্রদার বাজিয়ে শেষ করলেন। এতে সকলেই মুচকি হাসল। আমিও তাকালাম হেসে। সাথ সঙ্গতও খুব হোল। শেষ হবার পর সকলের অনুরোধে জিলা কাফী বাজিয়ে শেষ করলাম। আলিআকবরের সেক্রেটারি বাজাবার পর যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য বলে আমাকে অভিনন্দন করলেন।

পরের দিন অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা করে নানা বিষয়ে কথা হোল। চুপচাপ শুনলেন। নির্বাক শ্রোতা। যতটা পারি বোঝালাম। ভবিষ্যৎ-এ বাবার মুখ চেয়ে সব সহ্য করতে বললাম। অবাক লাগে। তাঁর মুখে কোন প্রতিবাদ নাই। যেন কিছুই হয় নি। সর্বদা কাজ নিয়েই আছেন। কী কাজ, কেমন কাজ, কোথাকার কাজ, নিজের না পরের কাজ তাও বলেন না। যা ভালো বোঝেন তাই করেন। মৈহারে প্রথম সাক্ষাৎ-এ যা দেখেছিলাম এখনও সেই দেখছি। তাঁর আত্মবিস্মৃত রূপটা আমার কাছে বিস্ময়। তাঁর সৌন্দর্য কখনও সচেতনতা দেখি নি। চিরকালই দেখেছি ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিকটাই বরাবার দেখেছি। তাঁর মধ্যে ভালো মানুষই দেখেছি। যে স্পষ্ট ভাষী, সরল কিন্তু চতুর না হলেও অবুঝ নন। আসলে তাঁর সঙ্গীতের রুচি আছে, রসবোধ আছে, সর্বদা মনে হয় সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে আছেন। তবে বাইরে প্রকাশ না হলেও, সবচেয়ে বড় কথা নিঃস্বার্থ মানসিক বেদনা আছে। প্রণাম করে বললাম, 'আজ যাচ্ছি।' বললেন, 'খুব মন দিয়ে বাজাবেন।' রাত্রে কাশী যাত্রা করলাম। নূতন বছরে নূতন সরোদ দিয়েই বাজাব।

এতক্ষণ ধরে যা কিছু লিখেছি তা আমার নিজের জন্য নয়। আজকের যুগের ছেলে মেয়েরা যাঁরা এখন নূতন গান বাজনার শিক্ষানবিশি করছেন, তাঁদের যুগের দিকে চেয়েই এত কথা বলা। জীবনে সুযোগ রোজ রোজ আসে না। বন্যার মত সে আসে। যদি তাঁর জল সময়মতো ধরে রাখতে পারা যায় তবেই ভালো, নচেৎ ফসল ফলাবার ক্ষেত্রের ভাগ শূন্যই

পড়ে। আমি চিরকালই পূজা করেছি, প্রসাদ চাই নি। হয়ত পাবার লোভ মনে মনে ছিলো। যদি না পেয়ে থাকি, দুর্ভাগ্য, কিন্তু সর্বস্বান্ত হতে পেরেছি এই তো আনন্দ।

ট্রেনে চড়েছি, গাড়ী ছাড়ল। বার্থের তিনজন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার মন কখন মৈহারে পৌঁছে গেছে বুঝতে পারিনি। ভাবলাম বাবা, মা কেমন আছেন? মৈহার ছাড়ার আগে থেকে আজ পর্যন্ত টুকরো টুকরো এক একটা ঘটনা মনে পড়তে লাগল। মৈহারে একদিন বজ্রাঘাত হোল। তার পরিণাম আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যের জীবন নষ্ট করে দিয়ে নিজের আরাম ভোগের মধ্যে যে নীচতা, তা যেন আমাকে কখনও স্পর্শ না করে। সকলেই আমাকে বলেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কি সত্যই অন্যায়? কি জানি। যে যাই বলুক, আমি বিশ্বাস করি, শত্রু সৃষ্টি শক্তির লক্ষণ। মৈহার ছাড়ার কিছুদিন পরই যত দেখতে লাগলাম ততই মনটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। দেখলাম, এ পৃথিবীতে যে সৎ হবার চেষ্টা করবে তারই যত দুর্ভোগ। পৃথিবীতে যাঁরা একটা বাঁধা ধরা পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে, তাদের কেউ পাগল বলে, কেউ বলে প্রতিভাধর। কিন্তু আমি পাগল নই, প্রতিভাও নাই। আমি একজন অতি সাধারণ। কিন্তু কেমন করে যেন সাধারণ সংসারে সাধারণ নিয়মগুলোর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসলাম। কিন্তু আপোষ করে চললে কোন দুঃখ ছিলো না। বেশ আরামে সংসারের একজন হয়ে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা না করে কি পথ বেছে নিলাম?

মানুষের অপরাধ আমি কখনও বড় করে দেখি না। নিজের মানুষই আমার সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগল, রাতারাতি নাম করবার পর। আমি বিশ্বাস করি, যে মানুষ দোষ করে সে মানুষ আবার ভালোওবাসে। যে মানুষ অপরাধ করে সে মানুষ আবার অন্যকে ক্ষমা করে। কিন্তু এরা কোন ধাতুতে গড়া। এদের কি বিবেক নেই? যতই দেখছি তত অবাক হচ্ছি। সংসারে এক একজন মানুষ এক এক স্বভাবের হয়। কেউ খাদ্য-বিলাসী, কেউ পোশাক-বিলাসী, কেউ সাহিত্য-বিলাসী, কেউ সঙ্গীত-বিলাসী আবার কেউ নারী-বিলাসী কিন্তু এ কি দেখছি আজকাল?

৫০

সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাঁদের মুখটা আয়নার মত। তাঁদের মনের ছবিটা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে মানুষ বলে সহজে বোঝা যায়। কিন্তু আবার এমন অনেক লোকও আছে যাঁদের এক কথায় বলা যায় বর্ণচোরা। তাঁদের বাইরের চেহারাটা দেখে বিচার করলে ভুল হয়। গায়ে গেরুয়া বসন থাকলেই যেমন কেউ সাধু পুরুষ হয় না, তেমনি দামী কাপড়, জামা, প্যান্ট, টাই পরলেই কেউ ভদ্রলোক হয় না। যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। সর্বসাধারণের ধারণা, টাকা হোল মানুষের কলজে। কলজে যদি মজবুত থাকে তো মানুষের জীবনও মজবুত হয়। কিন্তু এঁর ব্যতিক্রমও তো দেখেছি। কেন এঁরা বুঝতে পারে না, সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ, যে পাওয়ার মধ্যে কিছু না পাওয়া থেকে যায়। বেশী টাকা হলে দুঃখ বাড়ে। টাকা যার বেশী হয় তাকে মেলানকোলিয়া রোগে ধরে। টাকা, টাকা করে বাবাকে কখনও তো নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে দেখি নি।

আমার গুরুভক্তি দেখে কি করে বর্ণচোরাটি বলল, ‘গুরু ভক্তি খারাপ নয়। গুরুদেব প্রণাম করবে, শ্রদ্ধা করবে। মাথা নীচু করে কথা বলবে। কথার প্রতিবাদ করবে না। তা বলে তাঁর অবর্তমানে নিজের সাধ আহ্লাদ মেটাবে না? চরিত্র? এ সব ছেদো কথা। আজকের যুগে চরিত্রের থেকে সব চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে কেরিয়ার। বাবা হলেন ব্যাকডেটেড অবসলেট। তাঁর যুগে আর আমাদের যুগে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গিয়েছে। আমার লোকেরা বলত, পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। কিন্তু দিন পালটাচ্ছে। এখন টাকা থাকলে সব বদগুণই চাপা পড়ে যায়। আজকের দিনে সকলের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হবে। সংসারে নাম আর টাকাটাই হোল আসল জিনিষ।’ এই সব কথা বলে বর্ণচোরাটি যে নীচ প্রলোভন আমাকে দিলো ভাবতেও অবাক লাগে। মানুষ এত নীচে কি করে নামতে পারে? আসলে হীনমন্যতায় যে চিরটাকাল ভুগছে, তাঁর এই নীচতার প্রলোভন দেখাতে লজ্জা করবে কেন? টাকা, মদ আর মেয়ে মানুষই সব হিসেবে গোলমাল করে দিয়েছে। এক একজনের জীবনে দেখেছি, টাকা যেমন অনায়াসে আসছে, নারীও তেমনি এসেছে অনায়াসে। অনায়াসে সব জিনিষই পেয়ে পেয়ে এমন হয়ে গেছে যে সে নিজেই বোঝে না, কোন জিনিষটা পেলে তার আনন্দ হয়। টাকা, মদ না নারী। হয়ত এটা বাস্তব জগতের একটা অনিবার্য নিয়ম। যা সহজে পাওয়া যায়, মানুষ বোধ হয় সেটা পেলেও তা সহজেই হারিয়ে ফেলে। এ না হলে কি বলতে পারত, ‘বাবার কথা আলাদা। এখন যুগ পাল্টেছে। আকস্মিকতায় যে আনন্দ আছে নিত্য নৈমিত্তিকতার মধ্যে তা আসে না।’ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছি, ‘আকস্মিকতায় যে আনন্দ আছে তা হোল মোহ এবং নিত্য নৈমিত্তার মধ্যে আছে ভালবাসার বন্ধন।’ আমার কথা শুনে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলো। মনে হোল এদের বুঝিয়ে কোন লাভ নাই। এঁদের ভিত তৈরী হয়েছে যে ভাবে তাঁদের কাছে এই কথা শোনা আশ্চর্যের কিছু নয়।

সকলেরই এক ধারণা, বড় হয়ে নিজেকে উন্নতি করতে হবে। উন্নতি কথাটার অনেক রকম অর্থ ভেদ হতে পারে। কেউ উন্নতি করতে চায় অর্থে, কেউ ক্ষমতায়, কেউ স্বাস্থ্যে, কেউ আরো নানা ভাবে। বাবা উন্নতি অর্থে একমাত্র সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বর্ণচোরা আমাকে কি বলছে? বলছে, ‘স্লো লাইফে আমার আকর্ষণ নাই। ফাস্ট লাইফ না হলে মজা কোথায়? অর্থাৎ পৃথিবীতে তোলপাড় করে বেঁচে থাকতে চাই। আজ মাদ্রাজ, কাল ব্যাঙ্গালোর, পরের দিন বম্বে। তারপর কোলকাতা, দিল্লী, কাশী হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য আমেরিকা যাওয়া, আবার ছয় মাস কাটিয়ে ভারতে এসে সকলকে বোঝাব কত ব্যস্ত শিল্পী আমি?

আমি বললাম, ‘এতক্ষণ বড় বড় কথা বললে, ভাবছ না জানি কি হয়ে গিয়েছ? টাকা, সম্মান হয়ত পেয়েছো, কিন্তু জীবন? মানুষের জীবনেরও তো অডিট রিপোর্ট আছে। মানুষের জীবনেরও তো একটা ব্যালেন্স সীট আছে। মানুষের জীবনেরও তো একটা ডিভিডেণ্ড ওয়ারেন্ট অফএ্যারেষ্ট আছে। সেই জমা খরচের হিসেব নিকেশ যে অডিটর জেনারেল তৈরী করেন তাঁর হিসাবের সঙ্গে কি এই পৃথিবীর অডিটার জেনারেলের জমা খরচের হিসেব নিকেশের অঙ্ক মেলে?’

শেষে একটা কথা বলি, ‘নিজেকে মস্ত বড় তালমর্মজ্ঞ মনে কর? তোমার তো সমস্ত আগাগোড়া বাঁধা। সেই দেখিয়ে বাজিমাৎ করতে চাও। বাবা গৎ বা তান বাজাবার সময় পায়ে তালি দিয়ে বাজাতেন। কত কঠিন বন্দিসের গৎ কিংবা বিভিন্ন লয়ে তান তৈরী করেছেন শেখাবার সময়। যখন নিজে নোটেশন করেছি, ভেবে অবাক হয়েছি কি অদ্ভুত জায়গা থেকে শুরু হয়েছে। তবে বাবাকে এ কথাও বলতে শুনেছি, যখন সাথ সঙ্গতে নানা ছন্দে বাজাবে, তখন যেন মনে হবে লহর, অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ এঁর মত চলতে থাকবে। তখন কেউ যদি তাল দেয়, তাহলে কি বিকট ভাবে সমে আসতেন ভাবা যায় না। কিন্তু তুমি? সে দিন যখন হামবড়াই করছিলে লয় নিয়ে, থাকতে না পেরে বলেই দিয়েছিলাম, বাবার এক তান কখনও দুবার শুনতে পাই নি। কিন্তু তোমার সব বাঁধা।’ বাবার কাছে যা দেখেছি, সে সব দিনের কথা এখনকার কোন ছেলেমেয়েই কল্পনাও করতে পারবে না। এখন তো সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার এ সব ভড়ং দেখে ভুলব না।’

হঠাৎ চা, পান, বিড়ি, সিগারেটের আওয়াজে অবাক হয়ে দেখি মোগলসরাই স্টেশনে এসেছি। উফ, এতক্ষণ কি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পাশের ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি মশায়, ঘুমোবার সময় কি আপনার কথা বলার রোগ আছে না কি?’ অবাক হয়ে তাকালাম। আমি কি তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছিলাম? হেসে বললাম, ‘এ যাবৎ তো ট্রেনে ভ্রমণকালে কেউ বলে নি তবে গতকাল হয়ত নিশ্চয় কথা বলেছি।’

কোলকাতা থেকে ফিরে কাশীতে তুলসী মন্দিরে গিয়ে যেন প্রাণ খুঁজে পেলাম। দরজা খুলতেই দেখলাম, গঙ্গা কলকল শব্দ করে আনন্দে মুখরিত হয়ে আপন মনে এগিয়ে চলছে। সকলেই এগিয়ে চলছে এবং চলবেও। প্রকৃত শিল্পীকে এগিয়ে চলতে হবে।

কোলকাতা থেকে এসে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। মৈহার থাকাকালীন বাবা বলতেন, ‘বাইরে কোথাও যেও না, গেলেই কেবল পরনিন্দা আর পরচর্চা, ওই পরনিন্দা আর পরচর্চা করো নিজের বাজনার সঙ্গে। এতে তোমার ভাল হবে।’ এঁর জন্য আমি অন্তরমুখী হয়ে গেলাম। কোলকাতা থেকে আসবার কিছুদিন পর, আমার দাদা হীরেন ভট্টাচার্য যে শিশুকাল থেকেই আমাকে সঙ্গীতের প্রেরণা দিয়েছে, যে আমার কাছে একাধারে বন্ধু, শুভাকাঙ্খী এবং পথপ্রদর্শক সে দিল্লী থেকে কাশীতে বদলী হয়ে এল। তাতে আমার পক্ষে জীবন যাত্রা খুব সহজ হয়ে এল। সেই সময় আমি তুলসী মন্দিরেই থাকি এবং সপ্তাহে শুক্রবার একদিন বাড়ি যাই।

কোলকাতা থেকে এসে বাবাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম। নূতন বছর সবে শুরু হয়েছে। বাবার সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যানবরেষু,

আমি ও তোমার মা আমরা মায়ের কৃপায় ভাল আছি, তোমরা সকলে আমার মায়ের আসির্ব্বাদ গ্রহন কর সকলে চিরজিবী হও। মায়ের কৃপা চিরস্মরনীয় হও এই আসির্ব্বাদ করি।

ইতি

আলাউদ্দিন

ভুল করে বাবা তারিখ লেখেন নি। ইতিমধ্যে মাসের শেষে কোলকাতা থেকে মধ্য কোলকাতা সঙ্গীত সম্মেলন থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। যথাসময়ে কোলকাতা গিয়ে আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করে শুনলাম, অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে নিয়ে বম্বে চলে গিয়েছেন। বম্বেতে নূতন ফ্লাট কিনে রবিশঙ্কর স্ত্রী পুত্র নিয়ে বসবাস করছেন। এ কথা শুনে খুবই আনন্দ হোল। কোলকাতায় কেরামৎ খাঁর সঙ্গে বাজালাম। ঘরোয়া আসরেও সম্মিলিত হলাম। এই বাজনার সময় আমি একটা টেপ রেকর্ডিং মেসিন এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। কেননা বরাবরই আমার সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করবার বাসনা ছিল, কেননা নিজের বাজনা টেপ করে শুনলে নিজের দোষ বোঝা যায়। এ কথা আমি বন্ধু রণজিৎ কুণ্ডুকে বলায় সে আমার দাদাকে বলে। আমার দাদা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটি বিদেশী ফিলিপ্স টেপ রেকর্ডিং মেসিন উপহার দিলেন। তখন থেকেই আমার কাজ হয়ে দাঁড়ালো, রোজ যা বাজাই তা টেপ করি এবং পরে তা শুনি। এতে আমার গবেষণায় যে কি উপকার হয়েছে ভাবা যায় না। এটাই আমার গুরুর কাজ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা ভাল। দীর্ঘ নয় বছর আমার যন্ত্রে নিজের বাজনা ছাড়া অন্য কারোর বাজনা টেপ করি নি। না করার কারণ এই, পাছে নিজের বাজনার উপরে পরের বাজনার প্রভাব পড়ে। দীর্ঘ নয় বছর গবেষণা করার পর মেসিনটা সারাতে দেওয়ার ফলে খারাপ হয়ে যায়। তারপর আর কেনাও হয় নি এবং প্রয়োজনবোধ করি নি। তবে রেডিওতে সকলের গান এবং বাজনা শুনেছি। তবে কনফারেন্সে নিজের ঘরের দুইজনের ছাড়া অন্যের কমই শুনেছি। আর আজও বারাণসীর সংকট মোচন মন্দিরে যে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান হয় সমস্তই আমাকে শুনতে হয় কারণ এই সঙ্কট মোচনের সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে আমার পারিবারিক এবং আত্মিক সম্পর্ক।

কোলকাতা থেকে বাজিয়ে এই প্রথম আমি গৌহাটিতে গেলাম একটা সঙ্গীত সম্মেলনে। গৌহাটিতে আমার বাজনা শুনে দুইজন শিক্ষার্থী এল। একজন সেতার বাদক, এবং একজন সরোদ নূতন শিখতে চায়। মনে মনে বুঝি, শিখবার আগ্রহ অনেকের আছে কিন্তু শিক্ষকের অভাব। এ ভাবে তো শিক্ষা হয় না। কোলকাতায় গিয়ে কারো কাছে শিখতে পারে। কিন্তু তাঁরা অমার কাছেই শিখতে চায়। শুনলাম কোলকাতার চিন্ময় লাহিড়ী প্রতি মাসে একবার গৌহাটিতে এসে তিনজন ছাত্র ছাত্রীকে শেখান। কিন্তু আমার তা সম্ভব নয়। যদি গৌহাটিতে আবার আসি তাহলে শেখাতে পারি।

গৌহাটি থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করলাম। আলিআকবর বলল, 'আগামী কাল আমার লেক মার্কেটের কাছে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বাজনা আছে সন্ধ্যা সাতটায়।' আমি সমস্যায় পড়লাম। পরের দিন রাত্রি নয়টার সময় কথা দিয়েছি আমার এক বন্ধুকে। বন্ধুর মায়ের অপারেশন হয়েছে। সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হবে। সেই সময় আমি কালীঘাটে থাকি। রাত্রে আমি গেলে বন্ধু বাড়ী যাবে এবং আমার খাবার নিয়ে আসবে। সমস্যা হলেও আলিআকবরকে বললাম, 'পরের দিন বাজনা শুনতে যাব।' বাজনা শুনতে গেলাম। ঘর ভর্ত্তি লোক। আলিআকবরের সঙ্গে তানপুরা নিয়ে বসল নিখিল। জুবেদা বেগম, আশিস এবং ধ্যানেশও রয়েছে। আলিআকবর সকলের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি কিন্তু দরজার কাছে বসলাম, যাতে কিছুটা শুনবার পর সকলের অজান্তে চলে যেতে পারি। আলিআকবরকে আগে বলি নি কেননা মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ আলিআকবরের বাজাবার আগে, দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। ইসারায় বলল, ঘরের ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে বসি, কিন্তু ইসারায় বললাম এই স্থানে ঠিকই আছি। বাজনা একটা শেষ হবার পর চুপ করে বন্ধুর কাছে চলে গেলাম।

পরের দিন আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শুনলাম আলিআকবরের চামচেরা বলেছে, আমি বাজনা পুরো না শুনে চলে গেছি কেননা নিজেকে খুব বড় মনে করি। আলিআকবরও সে কথা বিশ্বাস করেছে। যখন আমার পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বললাম, আলিআকবর চুপ করে রইল। জানি আলি আকবর কানপাতলা, সুতরাং তাঁর মনে চামচেরা বদ্ধমূল ধারণা করিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে জুবেদা বেগম আলিআকবরের সামনে এসে বললেন, 'এখন নাম হয়ে গিয়েছে, বড় হয়ে গিয়েছেন—এই বাজনা আর কি শুনবেন?' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বোঝাবার পর চুপ করে গেলেন।

পরের দিন কোলকাতায় একটা স্থানীয় নাম করা সঙ্গীত সংস্থার কর্ণধার আমাকে কোলকাতায় স্থায়ী বসবাস করবার পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'আমাদের সংস্থায় সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা দেবে এবং কোলকাতায় থাকলে বহু ছাত্র শিখবে। তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। মাসিক আয় ভালই হবে এবং কোলকাতায় থাকলে সারা বছর প্রোগ্রাম করেও বহু টাকা উপায় হবে এবং নামও হবে।' যদিও যে অর্থের কথা বললেন তা আমার কাছে অকল্পনীয়, তা সত্ত্বেও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। শিক্ষার নামে ছাত্রদের প্রতারিত করে অর্থ উপার্জন কি করে সকলে করছে তা আমি এই কয় বছরে দেখেছি। তা ছাড়া বাবা আমার আদর্শ। ছাত্রের কাছে টাকা নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত কার্যক্রম লেখার একটা কারণ আছে। কারণটা হোল এই যে, বাজনা বাজিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে কথা শুনে আজকাল যে এই শিল্পে আসছে তাঁদের যদি কিছু লাভ হয় তাহলে আমার এই লেখা সার্থক হবে বলেই মনে করি।

এর পরই কোলকাতা থেকে কাশী এসেই তুলসী মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। কাশীতে এসে হাথরস থেকে লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গের চিঠি পেলাম। 'সঙ্গীত পত্রিকা'র রজত জয়ন্তী সম্মেলন উপলক্ষে সারা ভারতের গায়ক বাদক অংশ নেবে। আমাকেও যোগদান করবার জন্য লিখেছে। কিছুদিন পরই কবিরাজ আশুতোষকে নিয়ে হাথরস গেলাম। গিয়ে দেখলাম শিল্পীদের বিরাট এক ধর্মশালায় থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। লল্লা আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল এবং প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক কবি কাকা হাথরসি তাঁর বাড়ীতে আমাকে থাকতে বললেন। বললাম, 'উপস্থিত হাস্যরসিক ধর্মশালায় থাকি, কেননা কাশী থেকে আশুতোষকে নিয়ে এসেছি।' পরিস্থিতি বুঝলেন দুজনেই। লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ এর বাড়ীতে উঠেছিলেন এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। ভদ্রলোকের নাম আচার্য বৃহস্পতি। শুনলাম, তিনি কানপুরের একটা কলেজের হিন্দির অধ্যাপক। সংস্কৃত এবং

সঙ্গীতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। দেখতে অনেকটা ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের মত। তফাৎ এর মধ্যে ইনি বেশ লম্বা। আমি বাবার শিষ্য শুনে বললেন, 'রামপুরের দরবারে আমার পূর্বপুরুষরা পুরোহিত ছিলেন। ছোটবেলায় আমার রামপুরেই অতিবাহিত হয়েছে। রামপুর থাকাকালীন বহু উস্তাদ এবং সঙ্গীতজ্ঞর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। আমি নিজে সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করতে পারতাম কিন্তু গলার স্বর সুশ্রাব্য নয় বলেই গায়ক হতে পারি নি।' এ কথা শুনে বৃহস্পতিকে বললাম, 'এখানকার অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আপনার কাছে এসে রামপুর দরবারের গল্প শুনব।' অল্প সময়েই বন্ধুর মত সম্বন্ধ হয়ে গেল। লল্লার কাছে শুনলাম, প্রথম দিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হবে এবং দ্বিতীয় দিন সিতারার নৃত্য এবং তলত মহম্মদ-এর গান হবে। সম্মেলনের জন্য যে স্থান নির্বাচন হয়েছে, সেই মঞ্চটাও দেখলাম। এত বড় মাঠে স্টেজ যা সাজান হয়েছে কল্পনা করা যায় না। শুনলাম মুস্তাক হুসেন খাঁ এসেছেন। দিল্লী থেকে আজই রবিশঙ্কর আসছে। এ ছাড়া বহু গায়ক বাদক আসছেন। বৃহস্পতি সঙ্গীতের কার্যক্রম নির্দ্ধারিত করেছেন। সম্মেলন শুরু হবে সন্ধ্যায় এবং রবিশঙ্করেরও কার্যক্রম আছে।

গর্গ এর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেখানেই যাই দেখি পোষ্টার মারা, কিন্তু কোন শিল্পীর নাম উল্লেখ তাতে নেই। শুধু তলত মহম্মদ এবং সিতারার ছবি। আমি ভাবলাম এ-কি? গর্গ বলল, 'হাথরসে সঙ্গীত কার্যালয় আছে, কিন্তু বলতে গেলে কেউ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কখনও শোনে নি। তাই রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এই আয়োজন করেছি। সিনেমার কৃপায় তলত মহম্মদ এবং সিতারাকে সকলেই চেনে বলে তাঁদের নাম এবং ছবি ছাপান হয়েছে।' আমার পরিচিত একজন বিখ্যাত বেহালা বাদকের কার্যক্রমের অনেক পরে, আমার কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। বেহালা বাদককে বললাম, 'আপনার বাজনা শুনবার জন্য আমি অনেক আগে থেকে আসরে উপস্থিত থাকব।' তাঁর আসরে যাবার প্রায় কুড়ি মিনিট পরেই আমি ও আশুতোষ গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেজ এত বড়, প্যাণ্ডেল এত বড় যে, আয়তনের দিক থেকে কোলকাতার পার্ক সার্কাসের মাঠকেও হার মানাবে। গিয়ে দেখি কাশীর বিখ্যাত শাহানাই বাদক সবে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার চাপড়ান শুরু হোল। চিৎকার শুরু হোল। শাহনাই বাদক দ্রুত গৎ বাজিয়ে শেষ করল। বুঝলাম এখানকার শ্রোতা কি বস্তু। যে বেহালা বাদকের কথা আগে বলেছি, তাঁকে শুনলাম শ্রোতাদের আক্রমণে বসবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই অন্ততঃ তিনজনকে উঠতে দেখলাম। ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেলাম। কত উৎসাহ নিয়ে বাজাতে এসেছি। এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম? এঁর মধ্যে বসেছেন একজন গায়ক। সে প্রথমে মঞ্চে এসেই বলল, 'ছোটবেলা থেকেই আমার বাবাকে 'সঙ্গীত' পত্রিকা রাখতে দেখেছি। তার ফলেই আমি সঙ্গীতের প্রেরণা পাই। সেইজন্য সঙ্গীত পত্রিকার মালিক কাকা হাথরসীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, পুরো হাথরস নিবাসি এবং হাথরসের প্রত্যেকটি ধূলিকণার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' যে হেতু কাকা হাথরসীকে হাথরসের প্রত্যেকেই চেনে, এইজন্য জনতা হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করল। গায়ক তখন বলল, 'আমি আপনাদের একটা লাইট ক্লাসিকাল গান শোনাব।' এই কথা বলেই বৈজু-বাওরা সিনেমার একটা গান গাইলেন। শ্রোতারা এই প্রথম তারিফ করে, আর একটা গাইতে

অনুরোধ করল। পরপর কয়েকটি সিনেমার গান গাইলেন। শুনলাম, সন্ধ্যা থেকে যে কোন গুণী শিল্পী বসেছেন, কেউ পাঁচমিনিটের বেশী বসবার সুযোগ পায় নি। এই গায়ক প্রথম প্রশংসা পেয়েছে। গায়কের নাম শুনলাম পুরুষোত্তম জলোটা। যাঁর গান এই কার্যক্রমের পর আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। পরবর্তী জীবনে শুনেছি, লক্ষ্ণৌর এক মন্দিরে গান করে এবং উপাধি পেয়েছেন ভজন সম্রাট। এরই সন্তান অনুপ জালোটা, বর্ত্তমানে ভজন গেয়ে নাম করেছে।

যাই হোক এঁর পরেই শুরু হোল অযোধ্যা নিবাসী স্বামী পাগলদাসের স্বতন্ত্র মৃদঙ্গ বাদন। দেখে মনে হোল খুব সাধাসিধে লোক। তাঁর পরিচয় এই যে অযোধ্যার রাম মন্দিরে নিয়মিতভাবে রোজ বাজায় এবং স্বামী পাগলাদাস বলে বিখ্যাত। পাগলাদাস বসেই একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে বলল, 'মানুষ মানুষের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বললে বোঝে কিন্তু মৃদঙ্গের ভাষাও লোকে বোঝে। যেমন রাধা কৃষ্ণের কথাই ধরা যাক। কৃষ্ণ রাধাকে ডাকছেন, 'এসো, অর্থাৎ আওনা'। এ কথা বলেই মৃদঙ্গে বাজাল 'ধাগেন'। এ কথা শুনে রাধা বললেন, 'চারিদিকে লোক রয়েছে তাঁরা কি বলবে?' তাই রাধা বলল, 'না না'। এই বলেই মৃদঙ্গে বাজাল 'না না'। শ্রোতারা খুব মজা পেল এবং লোক আনন্দ সূচক ভাবে হাততালি দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই পাগল দাস বলে উঠল, 'আপনারা চুপ করুন তবেই বাজাব।' শ্রোতারা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে বসে রইল। এর পরই শুরু হোল রেলগাড়ীর চলন। এই সব বাজিয়ে, শ্রোতাদের কাছে খুব বাহবা পেল।

এর পরই আমার বাজনা। এ ধরনের শ্রোতা মৈহারে যাবার আগে কাশীর এক সঙ্গীত সম্মেলনে দেখেছিলাম। বুঝলাম পুরুষোত্তম জলোটা যেমন প্রথমেই ভাষণ দিয়ে যে গান গেয়ে সমাদর পেলো এবং পাগল দাস যা করল, এ তো আমার দ্বারায় সম্ভব নয়। জায়গা বুঝে রাগের ছেড় বাজিয়ে জোড়ের কাজ শুরু করলাম। শ্রোতারা চুপ করে রইল। দ্রুত জোড় ঝালা বাজিয়ে যখন শেষ করলাম, বাবার আশীর্বাদে দেখলাম সকলেই আমাকে গ্রহণ করেছে। গৎ বাজাবার আগে আশুতোষকে বললাম, 'জনতা দেখে কেবল সাথ সঙ্গত করতে হবে।' পুরো সওয়া ঘণ্টা বাজাবার পর যে মুহূর্তে শেষ করলাম, শ্রোতাদের তরফ থেকে ওয়ানস মোর আওয়াজ পেলাম। ভাবলাম ভগবানের দয়ায় ইজ্জৎ রয়ে গিয়েছে, আর নয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। শ্রোতাদের বার বার বলা সত্ত্বেও বাজালাম না।

আমার পর অনেক নামকরা গুণী গায়ক বাদক বসলেন। কিন্তু যেমনি বসে, দুই মিনিটের মধ্যে শ্রোতারা টিটকিরি দিয়ে উঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে রবিশঙ্করকে দেখলাম। শুনলাম, রবিশঙ্কর বলেছে বাজাবে না, কেননা, বহুদিন আগে হাথরসে একবার বাজানোর অভিজ্ঞতা ছিল। এ ছাড়া আজকের সব খবরাখবর নেবার পর তাঁর বাজাবার ইচ্ছা নেই। বৃহস্পতি রবিশঙ্করকে বলল, 'যতীনবাবু এত ভাল বাজিয়েছে আর আপনি যদি না বাজান তাহলে রামপুর ঘরানার বদনাম হবে।' রবিশঙ্কর রাজী হোল। কিন্তু স্টেজে কাকা হাথরসী, মুস্তাক হুসেন খাঁ এবং অনেক গুণীদের নিয়ে স্টেজে বসলেন। স্টেজে গায়ক বাদক ভরে গেল। কিন্তু আমি বসলাম না।

কাকা হাথরসি রবিশঙ্কর সম্বন্ধে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিলেন। কাকা হাথরসিকে হাথরসের লোক শ্রদ্ধা করে, তাই জনতা চুপ করে ভাষণ শুনল। এর পর রবিশঙ্কর শ্রোতাদের মন বুঝেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই বাজনা শেষ করল। তবলার সহযোগিতা করল আশুতোষ। শ্রোতারা চুপ করে শুনল। এঁর মধ্যেই বৃহস্পতি এসে আমাকে বলল, 'রবিশঙ্করের বাজনার পর গান আছে এবং বহু লোক আপনার বাজনা শুনতে চায় সুতরাং আবার বাজাতে হবে।' এ কথা শুনে বললাম, 'আমার অগ্রজ রবিশঙ্কর যখন বাজিয়েছে সুতরাং তারপর আমার বাজান সঙ্গীতের নিয়ম বিরুদ্ধ।' কে শোনে কার কথা। বৃহস্পতি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, রবিশঙ্করকে আমি রাজী করাব।' রবিশঙ্করের বাজনা শেষ হওয়ার পর গ্রীন রুমে এসেই আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বাবারে ফাঁড়া কেটেছে।' বৃহস্পতি সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্করকে বললেন, 'জনতার ইচ্ছা, যতীনবাবু আবার বাজান, কিন্তু উনি বলছেন, আপনার বাজানর পর বাজান নিয়ম বিরুদ্ধ।' এ কথা শুনে রবিশঙ্করের মুখ ক্ষণিকের জন্য একটু বদলাল আমার প্রশংসা শুনে, যদিও আশুতোষের মুখে শুনেছে। উত্তরে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? নিশ্চয়ই বাজাবে।' আমার সঙ্গে চোখাচুখি হোল। সেই পুরানো অমায়িক হাসি। গাড়ী করে দিল্লী থেকে এসেছিল। বাজাবার পরই গাড়ী করে দিল্লী চলে গেল। রবিশঙ্কর চলে যাবার পর আশুতোষ আমাকে বলল, 'এরকম পরিস্থিতিতে তোমার আর বাজান উচিত নয়।' ইতিমধ্যে বৃহস্পতি এসে হাজির। বললেন, 'এখন তো আর আপত্তির কোন কারণ নাই।' বললাম, 'আমি আর বাজাব না। কোন রকমে সম্মান বেঁচে গেছে সুতরাং বাজাবার আর প্রশ্নই আসে না।' বৃহস্পতি আর জোর করলো না।

বাজনার পরের দিন, লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গের জন্য বৃহস্পতির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। গর্গ বৃহস্পতির লেখা সঙ্গীতে ছাপায় বলে, তাঁর সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ। এ যাবৎ কত মধুর সম্পর্ক তো দেখলাম, কিন্তু যে মুহূর্তে স্বার্থে আঘাত লাগে সেই মুহূর্তে কি অদ্ভুত পরিবর্তন।

কাশীতে আসবার পর সঙ্গীত জীবনের বাইরে, সাংসারিক জীবনে একটা মহা পরিবর্তন ঘটে গেল। শুধু পরিবর্তনই নয় প্রলয়ও বলা যেতে পারে। এই সময়েই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার বিঘ্ন ঘটাবার আশঙ্কা দেখা দিলো। প্রসঙ্গটা হোল বিবাহ। মানুষের জীবনে বিবাহ একটা পরম উল্লেখজনক ঘটনা, যাঁর প্রভাব মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। যা শুধু মানুষকে পথভ্রষ্টই করে না সহযোগিতাও দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা সুখকর হলেও, শিল্পীর জীবনে অনেক সময়ে তা বাধা হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমি বরাবর বিবাহ থেকে দূরে থাকবার সঙ্কল্প করে এসেছি। কিন্তু শিল্পীও তো সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষের কাউকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁকে গুরুজন, অভিভাবক, অভিভাবিকা এবং সমাজকে স্বীকার করেই চলতে হয়। মাথার উপর শুধু মা নয়, আমার দাদারাও আছেন। তাঁদের আদেশ, অনুরোধ, উপরোধ এড়িয়ে চলাও সব সময় সম্ভবপর হয় না। এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই, বিভিন্ন সূত্র থেকে, বিবাহের অনুরোধ এবং চেষ্টা চলেছে কিন্তু আমি সেই প্রলোভনকে জয় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বরাবর গুরুজন ও মা'র অনুরোধ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু একটী বিশেষ ঘটনায় আমার দৃঢ় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে হোল। সে ঘটনাটি

হচ্ছে যে আমার সঙ্গীত গুরুবংশের দাদা স্থানীয় একজন, একদিন একটা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তুমি যদি বিয়ে না করো তাহলে আমি অত্যন্ত অখুশী হবো।' তাঁর এই মন্তব্যে সমস্ত জটিল বিষয়টি আমার কাছে সহজ সরল হয়ে উদঘাটিত হোল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি তাঁর জীবনের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে বিরাজ করছি। আমার বিয়ের কথা শুনলে তিনি কেন খুশী হবেন এ কথাটা যখন আমি মনে আলোচনা করতে লাগলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এবং আমি তাঁর পথের বাধা হওয়া থেকে দূরে চলে যাই। এঁর বেশী স্পষ্ট করে লেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই মা, দাদা এবং আত্মীয়স্বজন সবাই যখন আমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন আমি এই ভেবে সম্মতি দিলাম যে সুখের চেয়ে স্বস্তিই বড়। ঠিক হোল, আমার দাদার শ্যালিকার সঙ্গেই আমার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

ঠিক এই সময় সিনেমার কয়েকটি গানের জন্য রবিশঙ্কর কাশী এলো। আমি সে সময় তুলসী মন্দিরে থাকি। রবিশঙ্কর তুলসী মন্দিরে এসে মহন্ত অমরনাথ মিশ্রের কাছে, রামায়ণ গানের জন্য সহযোগিতা চাইল। রবিশঙ্কর আমার গঙ্গার উপর ঘর দেখে মুগ্ধ হোল। রবিশঙ্করকে যখন সমস্ত ঘটনা বললাম, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে রবিশঙ্কর বলে উঠলেন, 'তুমি বিয়ে করলে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী খুশী হবে না।' বললাম, 'আপনার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক।' যদিও আমার ইচ্ছা ছিলো না, কেননা আমার আর্থিক অবস্থার কোন ঠিক নাই, তবে আমার দাদা যে কোলকাতায় পর পর দুবছর আমার বাজনা শুনতে গিয়েছিলো, সে আমার ভবিষ্যৎ ভালোই বুঝেছিলো। দাদা বৌদির মারফৎ জানালো, 'আমি তো আছি সুতরাং যতীনের আর চিন্তা কি।' সুতরাং বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো।

তখন কি জানতাম আমার পেছনে আমার নিজের লোকেরাই আমার সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবে। অর্থাৎ নানা জায়গায় অপপ্রচার অর্থাৎ আমি অভিমানী, অহঙ্কারী, অনেক অর্থ দাবী করি, এই সব অপপ্রচার শুরু করে ছিলেন। অবশ্য চিরকালই মৈহার থেকে আসবার পর, বাবার শিক্ষায় আমি অন্তর্মুখী হয়ে গেছি। অন্তর্মুখী হওয়ায় সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও তেমনি অনেক আছে। অন্তর্মুখী হলে আত্মপ্রচার করা সম্ভব হয় না। বাবার কথায়, পার্টি পার্টি করা যায় না, নিজের ঢাক নিজে পেটানও যায় না। কিন্তু সুবিধা এই আছে যে শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে তা অনুকূল এবং সহায়ক হয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাবার মতন আরো যে কয়জন অন্তর্মুখী শিল্পী দেখেছি, তাঁরা সকলেই অন্তর্মুখী এবং সকলেই পারটি এবং দলবাজির ঊর্দ্ধে থাকেন। তাতে হয়ত সাময়িক ক্ষতি হয়, কিন্তু আখরে তাই শিল্পীকে অবিস্মরণীয় করে, যেমন করেছে উস্তাদ বাবাকে, উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁকে, পটবর্দ্ধনজী, নারায়ণ রাও ব্যাস, ডি. ভি. পালুস্কর প্রভৃতিকে। আমি সঙ্কল্প করলাম, নাই বা হোল আমার প্রচার, তাতে নাই বা হোল আমার অর্থ, তাতে নাই বা হোল আমার সাময়িক লাভ, কিন্তু আমি ঠিক করলাম যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন তাঁদের পথই বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করে চলব। তাতে ইহলৌকিক লাভ যদিও বা না হয়, পরমার্থিক লাভ তো হবে। আমি তখন থেকে ভাবলাম, আমি কি পেয়েছি তা নিয়ে আর ভাবব না, আমি কি দিয়েছি তাই নিয়েই সাধনা অবিশ্রান্ত থাক।

জীবনে কি ভেবেছিলাম, কি হয়ে গেল। এঁর পর তুলসী মন্দির ছেড়ে আমাকে আমার পৈতৃক বাড়ীতেই আসতে হোল। আমার বিয়ে হয়ে গেলো। এই প্রথম বুঝলাম টাকার প্রয়োজনীয়তা। বুঝলাম ভাতের দাম আছে। ভাত সস্তা নয়। ভাতের জন্য সারা পৃথিবীতে লড়াই লেগে গেছে, ভাতের জন্যই এত হাহাকার।

কোলকাতার সঙ্গীত সংস্থান থেকে আবার এই সময় আহ্বান পেলাম। আমার শুভচিন্তক লিখেছেন, 'কাশীতে থেকে টাকা রোজগার হবে না। কোলকাতায় চলে আসুন। সব ব্যবস্থা করে দেবো। কোলকাতার ছেলেমেয়েদের শেখালে অনেক টাকা পাবেন।' আজকাল মাষ্টাররা ছাত্র ছাত্রীদের ডিগ্রির জন্য যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা আমি দেখেছি। কাউকে ঠকিয়ে আমি টাকা উপার্জন করতে পারি না। যা হোক যা হবার তাই হবে। আমি সিদ্ধান্ত থেকে হঠলাম না।

শান্ত পরিবেশ থেকে কোলাহলের মধে এসে পড়লাম। বাজাবার সময় পাছে এসে কেউ বিরক্ত করে, তাই আমার সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করলাম একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে এক ঘণ্টা। আমার বাড়ীতে একমাত্র সঙ্কটমোচনের অমরনাথ মিশ্র, কবিরাজ আশুতোষ এবং গুল্লুজী ছাড়া সকলের আসাই তখন থেকে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অবশ্য অমরনাথ মিশ্র, আশুতোষ এবং গুল্লুজী আমার বাড়ীতে যখনই আসত, তখনই মৃদঙ্গ এবং তবলা নিয়ে বসতেন।

যদিও আমার সংসার হোল, কিন্তু সাধারণতঃ সকলের যেমন হয়, আমার তা কখনও হয় নি। এঁর জন্য আমার স্ত্রীর দিক থেকেও, তাঁর অনেক স্বার্থ ত্যাগের নজির আছে। এ না হলে যে ভাবে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সঙ্গীত পূজারী হয়েই এই জীবন কাটছে তা সম্ভবপর হ'তো না। সেই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিওতে এবং নানা সব স্থায়ী চাকরির প্রলোভন জয় করতে পেরেছি। এঁর জন্য আমি আমার সহধর্মিণীর কাছে কৃতজ্ঞ। সব জিনিষেরই অর্থ আছে, ব্যক্ত কিংবা গুঢ়, আমরা সব সময় ধরতে পারি না। দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যেরই বৈমাত্রেয় ভাই। ওঁরা দুজনে পাশাপাশি বাস করে। আর কে যে কখন আমাদের কাঁধে সওয়ার হয় তা কিছুই বলা যায় না।

ইতিমধ্যে কাশীতে দেখা হোল মৈহারের রায় লাইম কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে। আমার ছাত্রী মুন্নির বাবা এবং মা'য়ের সঙ্গে দেখা হোল। খবর পেলাম বাবার স্ট্রোক হয়েছে। জব্বলপুর থেকে ডাক্তার হর্ষে এসে চিকিৎসা করেছেন। খবর পেলাম জুবেদা বেগম ছেলেদের নিয়ে মৈহারে এসেছে। যে ভয় আমি পেয়েছিলাম তাই হোল। বাবার অত্যন্ত মনের জোর, নইলে এই স্ট্রোক চারবছর আগে হবার কথা। মনের জোরেরও একটা সীমা আছে। তাই এই বয়সেও মনকে সংযত করে রেখেছিলেন। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে গুমরে এতদিনে এই অঘটন ঘটল।

এই অঘটনের সময় সকলেই মৈহারে গেছে। অন্নপূর্ণাদেবী গেছেন। শুনলাম শরণরানী তাঁর স্বামীকে নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছে। অবাক হয়ে ভাবি আমাকে এ সংবাদ কেউ জানালো না। মনের ইচ্ছা থাকলেও যাই নি, কেননা কোন কারণে যদি উত্তেজিত হয়ে পড়েন

এবং শরীর খারাপ হয়ে যায় তাহলে বদনামের ভাগী হব। দীর্ঘ প্রায় সাত বৎসর এই অবস্থায় পড়েছিলাম, যাক সে অনেক পরের কথা। রায় লাইম কোম্পানীর মালিকের মারফৎ বরাবর খবর রাখতাম। শুনলাম বাবা নিজেকে সামলে নিয়েছেন। জুবেদা বেগম মৈহারে রয়ে গেছে এবং ছেলেরা কলেজের জন্য কোলকাতায় চলে গেছে। এই সময় ডাক্তার হর্ষে বরাবর জব্বলপুর থেকে দেখে গেছেন এবং ডাক্তার গোবিন্দ সিং বরাবর চিকিৎসা করছেন। ধীরে ধীরে বাবা মনের জোরে চলা ফেরা করছেন খবর পেলাম।

প্রায় এক বৎসর ছাপরার দুই ছাত্র কাশীতে এসে শিখে যাচ্ছিল। এবারে প্রোফেসার গোপাল দত্ত চৌধুরি এবং রমেন মিত্র ভীষণভাবে ধরল। দুদিনের জন্য যদি আমি প্রত্যেক মাসে ছাপরা যাই তাহলে বারো তেরোটি ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা করতে পারবে। এঁদের আন্তরিক আগ্রহে আপত্তি তুলতে পারলাম না। ছাত্রদের সঙ্গে ছাপরা গেলাম। দেখলাম মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশ স্কুলে পড়ে এবং তাদের কোর্সের মধ্যে সঙ্গীত একটা বিষয় ছিলো। প্রথমেই বললাম, স্কুলে যেমন শিখছে শিখুক। আমি প্রথম পালটা, বোল, কৃন্তন প্রভৃতি বিষয় অভ্যাস করাবো। তারপর শিক্ষকদের এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে রাগ পরীক্ষার জন্য বাজাবে সেটা ঠিক করে শিখিয়ে দেব। দুইদিন শিক্ষা দিয়ে কাশী চলে এলাম।

এবারে কাশীর সঙ্গীত পরিষদে চারদিনের কনফারেন্সের শেষ দিনে আমার বাজনা আছে। তালবাদ্য কাছারি বলে সঙ্গীতের যে বিষয়টা আছে, কাশীর সঙ্গীত পরিষদে অনুষ্ঠান ভুক্ত ছিলো না। কিন্তু সেইটা এই প্রথম অনুষ্ঠানভুক্ত হোল। রবিশঙ্কর এই বিষয়টা পরিচালনা করবে। তবলায় থাকবে কিষণ ও আল্লারাক্খা। মৃদঙ্গে রামানন্দ ঈশ্বরম এবং মঞ্জিরাতে বাজাবেন সোন্দররাজ আয়েঙ্গার। শেষের দুজন দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী এবং দুজনেই দিল্লীর আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত। এঁদের পরেই ছিল আমার বাজনা। আমার পরে নজাকত সলামৎ এর গান এবং সর্বশেষে রবিশঙ্করের বাজনা। কোলকাতায় কেরামত খাঁর সঙ্গে বাজিয়ে আনন্দ পাই বলে, সেক্রেটারিকে বলেছিলাম কাশীতে কেরামত খাঁ কখনও আসেনি, তাঁকে ডাকুন। সে আমার সঙ্গে বাজাবে। সেক্রেটারি রাজী হয়ে কেরামতকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তিনি আসবেন বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। সম্মেলনের কিছুদিন আগে বিহারের কয়েক জায়গায় বাজাতে গেলাম। কাশীতে বাজাবার দিন ভোরবেলায় এসে পৌঁছলাম। দুপুর বেলায় কবিরাজ আশুতোষ আমাকে এসে বলল, 'রবিশঙ্কর আমাকে ছাপান প্রোগ্রামের একটু অদল বদল করতে বলেছে।' আগের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী সুভ্যেনারে পর পর সাজান ছিল। এই বদলাবার কারণ সম্বন্ধে আশুতোষ বললেন, 'রবিশঙ্কর বলেছে তোমার বাজনার পর তালবাদ্য কাছারি রাখলে সেটা একটা অভিনব জিনিষ সকলেই ভালমত গ্রহণ করবে। সেইজন্য রবিশঙ্কর আমাকে বলেছে তুমি যদি কিছু না মনে কর, তাহলে প্রথমে তুমি বাজাও, তারপর তালবাদ্য কাছারি হবে।' আমি বুঝলাম এই প্রস্তাবের পেছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা হোল এই যে, আমার বাজাবার পর তালবাদ্য কাছারি হলে আমার বাজনার প্রভাবটা কমে যাবে। আমার হাসি পেল রবিশঙ্করের সিদ্ধান্তে। বললাম, 'ঠিক আছে রবিশঙ্করের যখন এই ইচ্ছা তাই হবে।'

সময় মত সম্মেলনে গেলাম। আমি বাজালাম আলিআকবরের তৈরী রাগ গৌরি মঞ্জরি। এই রাগটা মৈহার যাবার আগে কাশীতে প্রথম শুনি। খুব ভাল লেগেছিল। তখন কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু মৈহার যাবার পর রেডিওতে শুনি। তারপর দীর্ঘ চারবৎসর জলসায় রাগটা শুনেছি। রাগটি আলিআকবরের তৈরী বলেই মনে হোল বাজাই। বাজাবার আগে ঘোষণা করে বলা হোল রাগটি আলিআকবরের তৈরী। দেখি উইংস-এর ধারে একটা চেয়ারে রবিশঙ্কর বসে আছে। রবিশঙ্করকে দেখে স্বাভাবিক সঙ্কোচ হোল। তা সত্ত্বেও মনে খুব জোর এনে রাগটা বাজালাম। জোড়ের সময় ডিরিডিরি এবং শেষ করবার সময় একটা সপাট তান এত দ্রুত লয়ে বাজালাম, যাঁর ফলে হলে হাততালিতে ভরে গেল। কাশীতে এখনও কিছু লোক বলে, আলাপের পর জোড় এর সময় কখনও এ যাবৎ কেউ হাততালি পায় নি।

আমার বাজনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবিশঙ্কর এই প্রথম শুনল। আলিআকবর ও অন্নপূর্ণাদেবী একবারই সামনে বসে শুনেছেন, যা আগেই লিখেছি। বাবা একবারই নিজের বাড়ীতে সকলের সামনে বসে শুনেছেন। অবশ্য সেতো দশবছর পরের কথা। আলিআকবর, অন্নপূর্ণাদেবী এবং রবিশঙ্কর যে আমার সামনে বসে শুনেছেন সেটা আমার জীবনের চরম সম্পদ বলেই মনে করি।

কাশীতে এই প্রথম কেরামত খাঁ তবলায় সঙ্গত করল। সাথ সঙ্গত এবং সওয়াল জবাবে সুন্দর পরিমিত সঙ্গত করল। কাশীর শ্রোতারা ভূয়সী প্রশংসা করল। এরপর একটা বাজিয়ে যে মুহূর্তে শেষ করে উঠলাম, রবিশঙ্কর আমার কাছে এসে বলল, 'খুব ভাল বাজিয়েছ। তবে আলুভাই-এর তৈরী রাগ কেন বাজালে? নিজে কোন রাগ তৈরী করলে বাজাবে নইলে প্রচলিত রাগ বাজাবে।' আমার অনুষ্ঠানের পর তালবাদ্য কাছারির অনুষ্ঠান হোল। পরের পর একজন করে বাজাল। রবিশঙ্কর বসে কেবল তালি দিতে লাগলো। প্রোগ্রামটি খুব ভালই হোল। এঁর পর সব অনুষ্ঠানই ভাল হোল। সকলেই বলল, 'শুরু যখন ভাল হয়েছে, শেষ ভাল হবেই।'

কিছুদিন পরেই আমার ছেলে হোল। দায়িত্বও বাড়ল। কান্নাতে আমার বাজনার ব্যাঘাত হ'তো। ইতিমধ্যে কাশীতে আমার বৌদিকে এবং ভাইপোদের রেখে আমার দাদা গৌহাটিতে বদলী হয়ে গিয়েছে। এখন বাড়ীতে সব শুদ্ধ আট জন প্রাণী। স্বাভাবিক ভাবেই আমার বাজনার পরিবেশ যা আমি আগে পেয়েছি, তা আর না থাকাতে, অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বাধ্য হয়ে বাজনার সময় পালটালাম। সকালে বাজাই এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি বাজাই। আমার বাজনার অসুবিধা ভেবে, গৌহাটিতে দাদাকে লিখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদা লিখল, 'ছেলের বয়স ছয় মাস হলে সকলকে গৌহাটিতে পাঠিয়ে দিও।'

মৈহারে থাকাকালীন আমার রিয়াজ করবার একটা বাঁধা ধরা সময় নির্দিষ্ট ছিল। সেই কারণেই বাঁধা ধরা সময়ের বাইরে বাজনা বাজাবার প্রেরণা কিছুতেই পাই না। সেইজন্য কাশীতে এসে সাধারণতঃ যে সব জায়গায় কোন বাজনার অনুষ্ঠান হয়, সে সব অনুষ্ঠান সন্ধ্যাবেলাতেই হয়ে থাকে, কিন্তু যে হেতু সে সময়টা আমার বাড়ীতে রিয়াজ করবার সময়,

তাই সে সব গান বাজনার আসরে উপস্থিত হওয়ায় বিঘ্ন ঘটে। তাঁর ফলে লোক সমাজে অসামাজিক, অহঙ্কারী বলে আমার দুর্নাম রটে।

ছয় মাস পরে দাদার কাছে সকলকে পাঠিয়ে দিলাম। বাড়ীর মধ্যে সেই সময় কেবল আমি এবং আমার মা। এখন নিয়মিত সাধনা করি। মাসে দুইদিনের জন্য ছাপরা যাই। আমার ছাপরা যাওয়া শুনে সকলের ধারণা ছিল যে আমি ছাপরাতে একটা স্কুল করেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। দুই দিনের জন্য ছাপরাতে প্রফেসার গোপাল দত্ত চৌধুরির বাড়ীতে থাকতাম, এবং সকলের আন্তরিক শিক্ষার বাসনা দেখে দুই দিনেই একমাসের মত সাধনা করবার সামগ্রী দিয়ে কাশীতে চলে আসতাম। ছাপরার মত জায়গায় যদি কিছু সঙ্গীত প্রচার হয় এবং কয়েকটি ছাত্র ছাত্রী তৈরি হয়, সেই কথা ভেবেই ছাপরায় যেতাম।

বাবাকে একটা চিঠি দিলাম। জানি বাবার শরীর ভাল নাই তাই খবরাখবর দিয়ে শরীর কেমন আছে জানতে লিখলাম। কিছু দিন পরেই বাবার চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যানবর—

শ্রীমান যতীন তুমার পত্র পেয়েছি, সব জানিয়েও কলেজে যখন বেতন দেওয়া হয় না মিছামিছি এত বড় দাইত্ত ভার নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব আমি কলেজের চাকরি ইস্তিফা দিয়েছি। দুই জায়গায় কর্ম্ম করা আমার দ্বারায় কুলাবে না এ সব চিন্তা করে ইস্তিফা দিয়েছি। কলেজে চাকরি করিব না, মাত্র ব্যাণ্ড পারটির চাকরিই আমার জন্য ঠিক মনে করি। অত্র মঙ্গল, কুশল কামনা করি।

ইতি

আলাউদ্দিন।

বাবা তারিখ লেখেন নি। বাবার চিঠিটা পড়ে মনে হোল ব্যাণ্ডে নিয়মিত যাচ্ছেন, কিন্তু যে হেতু কলেজে যে কোন কারণে ঠিক মত বেতন দেওয়া হচ্ছে না, তাই ইস্তফা দিয়েছেন। খবর পেয়ে বুঝলাম কলেজ বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলছে। আসলে বাবাকে বোঝাবার কেউ নাই। সাহস করে কেউ কিছু বলতে পারে না। এ না হলে কলেজে নিয়মিত বেতন কেন দেবে না? আসলে বাবা অন্য জগতের লোক। বাবা তো নিজের থেকে কলেজের জন্য কিছু বলবেন না। বাবার কাছে টাকাটা কোনকালেই বড় নয়। কাজটাই বড়। কিন্তু উচ্চমহলে সব কথা একবার বাবা জানালেই এ পরিস্থিতি হ'তো না। কিন্তু বাবা তো বলবার লোক নয় তাই রাগের মাথায় ইস্তফা দিয়েছেন। মৈহারে কারো সাহস নাই বাবাকে বোঝাবে। অবশ্য পরে ডেভিডের কাছে শুনেছিলাম যে, বাবা ইস্তফা দেন নি। কলেজে বেতন দেওয়ার অসুবিধার জন্য বাবাই কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। যদি বাবা ইস্তফা দিতেন, তাহলে সরকার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।

আজকাল দেখছি সকলেই টাকার পেছনে ছুটছে। আসলে জীবনটা ভোগ করাই সকলের উদ্দেশ্য। তাই চরম লক্ষ্য হোল যেন তেন প্রকারেণ টাকা উপায় করা। যখন

আদর্শবাদ ছিলো তখন টাকাটা বড়ো ছিলো না। আদর্শ তখন ছিলো সঙ্গীতের আদর্শ। আমার মধ্যবিত্ত মনটা মরেনি টাকার জন্য ছুটতে। তাই বিবেকের সাড়া পাই নি। আজ বাবার চিঠি পড়ে মনে হোল বাবার কাছে ভালবাসা এবং বিবেক হোল বড় এবং টাকাটা হোল তুচ্ছ। কিন্তু আজকাল কিছু সঙ্গীতজ্ঞ টাকা চায় না ভালোবাসা চায়, নিজেই জানে না। আসলে সে টাকাই চায়। ভালবাসা কথাটা এঁদের কাছে সেন্টিমেন্টের কথা। ভেজাল সব জায়গাতেই ছিল, সব জায়গাতেই আছে, আবার সব জায়গাতেই থাকবে। ভেজাল দেখি চাল, ডাল, তেল, ওষুধ সব কিছুতেই। কিন্তু মনের মধ্যে যে ভেজাল থাকে। মনের ইচ্ছের মধ্যে যে ভেজাল থাকে তা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না। অথচ এর চেয়ে বড় ভেজাল আর বোধ হয় দুটি নাই। কেমন করে বুঝব কোনটা খাঁটি চাওয়া আর কোনটি ভেজাল চাওয়া। এই ভেজাল জিনিষটা সঙ্গীতের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বাবার কাছে ভেজাল ঢুকতে পারে নি। সেইজন্য নিজের আদর্শ নিয়েই আছেন। কিন্তু নামী সঙ্গীতজ্ঞেরা টাকার পেছনে সেই যে ছোটা শুরু করেছিল, এখনও তো ঠিক সেইরকমই ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জীবনের কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে কি? জীবনের শেষে হয়ত গ্লানি হয়েছে কিন্তু ছোটার শেষ হয় নি। আসলে বাড়ীতে বেড়াজালের বাইরে বেরিয়ে গেলে বোধ হয় এমনি করে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে। আর নিজেকে চিনতে পারলে চারপাশের পৃথিবীকে চিনতে পারে। নিজেকে চেনা বলতে আমি টাকার চেনার কথা বলছি। এখন সে কেবল টাকা চায়, বিলাস চায়, প্রতিষ্ঠা চায় এবং এই চাওয়া হোল আন্তরিক।

হঠাৎ খবর পেলাম বাবার নাকি প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ড হয়েছে। ডাক্তার হর্ষে এবং ডাক্তার গোবিন্দ সিং-এর নির্দেশে বাবাকে কোলকাতায় পাঠান হয়েছে। আরো খবর পেলাম ভালভাবেই অপারেশন হয়েছে। কিন্তু এবারেও পরের মুখে সংবাদ পেলাম।

বছরের শেষে কোলকাতায় তানসেন কনফারেন্সে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সেই সময় গিয়ে বাবাকে দেখব। কোলকাতায় যখন গেলাম তখন দেখলাম বাবা সুস্থ। ডাক্তারের নির্দেশে বিকেলে আলিআকবরের বাড়ীতে একটু ঘুরে আসেন। আমি যে দিন গেলাম, আলিআকবর আমাকে বলল, 'বিকেলে বাবার সঙ্গে গাড়ী করে যাও।' বাবা প্রসন্ন চিত্তে রয়েছেন। বিকেলে আমি এবং আলিআকবরের ছোটছেলে অমরেশ বাবার সঙ্গে গাড়ী করে বেড়াতে গেলাম। অমরেশকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেই ছোট অমরেশ যে বাবার কোলে বসে আদর খেতো, সে এখন বাবার সামনে মাথা নীচু করে চুপটি করে গাড়ীতে বসে আছে। বাবা তখন নাতির সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ছিলেন, উপস্থিত বাবা গম্ভীর অমরেশের সঙ্গেও। বাবার সঙ্গে যেতে যেতে অনেক কথা হোল। বাবাই বেশী কথা বলতে লাগলেন— আমি নীরব শ্রোতা। কোন কথা বললে যদি উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাই চুপ করে বাবার কথা শুনতে লাগলাম। বাবার প্রশ্নে হাঁ এবং না করেই সারলাম। বাবা কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে ছোটবেলার গল্প বলতে লাগলেন। যে সময় ঘাটের পাশ দিয়ে গাড়ী ঘোরানো হোল, আচমকা বাবা ধীরে ধীরে গাইতে লাগলেন, 'হরি দিন যে গেল, সন্ধ্যা হোল, পার কর আমারে।' গান গেয়ে বললেন, 'আহা গানের কি ভাব।' আমি সম্মতি সূচক মাথা

নাড়িয়ে কেবল বললাম, 'কোন চিন্তা করবেন না।' ভাবের ঘোরে বাবা বললেন, 'বাবা আমি তো যোগী পুরুষ হতে পারি নি, যে ভগবান ছাড়া আর কিছু চিন্তা করব না। আমি তো সাধারণ মানুষ।' বাবার কথা শুনে বললাম, 'বাবা আপনি তো আমাদের কাছে আদর্শ পুরুষ। আপনার আদর্শই তো আমরা অনুসরণ করবো।' বাবা হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে আরে বল কি?' তখন আর আমার মুখে কথা নাই। চুপ করে গেলাম। বাবা একটি চুরুট ধরালেন। বাবাকে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে ধীরে ধীরে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরতলায় ওঠালাম।

পরের দিন একজন ফটোগ্রাফার এসে বাবার একটা ফটো ওঠালেন। তারপর ফটোগ্রাফার আর একটা ফটো ওঠালেন। মধ্যখানে বাবা, একদিকে আলিআকবর এবং অপর দিকে আশিস। একসঙ্গে ফটো ওঠাবার কথা কখনও সাহস করে বলতে পারি নি। কি মনে হোল জানি না, সাহস করে ফটোগ্রাফারকে বললাম, 'আর একটা ফটো ওঠান।' বাবা উঠতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু আমার কথায় বসে গেলেন। আমি বাবার পেছনে বসলাম—বাবার একদিকে আলিআকবর এবং অপর দিকে আশিস। ফটো উঠে গেল।

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে বাজালাম। যে কদিন কোলকাতায় ছিলাম, রোজ বাবার সঙ্গে দেখা করতাম। শুনলাম বছরের শেষ সপ্তাহে নিজের পুত্রবধূ, মা এবং ধ্যানেশকে নিয়ে মৈহার যাবেন। যাক বাবা অত্যন্ত সাত্ত্বিক জীবন পালন করছেন বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। বাবার মৈহার যাবার আগেই আমি কাশী ফিরে এলাম। কাশীতে আসবার পর বিদেশে থাইল্যাণ্ডে যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। বাবাকে চিঠি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবার আশীর্বাদপূর্ণ চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

কল্যানবর

শ্রীমান বাবা যতীন নব বর্ষের আসির্ব্বাদ গ্রহণ কর, চিরজিবী হও। তুমি ইওরোপে যাইতেছ জেনে খুব সুখী হলেম। মা সারদা তোমার মঙ্গল করুন ও খুব জয় হৌক, জয়২ হোক এই আসির্ব্বাদ করি। আমার বয়স এখন ১২৮ এক শত আঠাস সব ইন্দ্রিয় সিথিল হয়ে গেছে মার কৃপায় খোদার কৃপায় বেঁচে আছি। বৌমা ও নাতি, নাতিন ধিগকে আমার আসির্ব্বাদ দিবে। তোমার মা ভাল আছে। এক প্রকার তোমাদের মঙ্গল কামনা করি

ইতি

আলাউদ্দিন

এ চিঠিতেও বাবা সাল এবং তারিখ লেখেন নি। বুঝলাম বাবার মতিভ্রম হয়েছে নইলে কখনও বয়স লেখেন ১২৮।

সময়, দিন, রাত, মাস, বছর কখনও একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে ঠিক নিজের লয়ে চলতে থাকে এবং চিরকাল চলবে। মৈহারের খবরাখবর মাঝে মাঝেই পাই আমার ছাত্রী মুন্নির বাবার কাছ থেকে, যে হেতু কাশীতে একটা বাড়ী কিনেছেন সেইজন্য মাঝে মাঝেই কাশীতে আসেন। হঠাৎ মুন্নির বাবা পালবাবু একদিন কাশীতে আমার বাড়ীতে

এলেন। বললেন, 'ধীরে ধীরে বাবা এখন সামলিয়ে উঠেছেন। কিছুদিন হোল বাবা আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবীকে মৈহারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বাবা বাড়ীর উইল করিয়েছেন আমার জামাইকে দিয়ে।' পাল বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুন্নীর স্বামী শ্রীকৃষ্ণমুরারি রায় উপস্থিত কোথায় আছে?' পাল বাবু বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে আমার জামাই এখন মধ্যপ্রদেশের দুর্গ-এর সিভিল জজ। বাবা আমাকে এবং আমার জামাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার জামাই বাবার কথায় যে সময় উইল তৈরী করে সেই সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাকে ডেকে আমাদের সামনে বাবা বলেছিলেন, আমার যে সম্পত্তি আছে তার অর্ধেক দেব অন্নপূর্ণাকে এবং অর্ধেক দেব আলিআকবরকে। এ কথা শুনে অন্নপূর্ণা যখন সম্পত্তি নিতে আপত্তি করলেন তখন বাবা বাধ্য হয়ে সব স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি আলিআকবরের নামেই উইল করে দিয়েছেন। যখন অন্নপূর্ণা কিছুই নিলো না সেই সময় বাবাকে একজন কেউ চন্দন কাঠের একটা বাক্স উপহার দিয়েছিলো, সেইটাই অন্নপূর্ণাকে নিদর্শন হিসাবে দিয়েছেন। উনি এর মধ্যে বাবার সেভিং ব্যাঙ্কের তিরিশ হাজার এবং ফিক্সড ডিপজিটের আটাত্তর হাজার টাকা আলিআকবরকে দিয়েছেন। এ ছাড়া মৈহারের বাড়ী এবং এক একরের বাগান বাড়ির লাগোয়া জমি দিয়েছেন। এ ছাড়া চাযের জন্য যে জমি কিনেছিলেন তাও আলিআকবরের নামে দিয়েছেন। উপরন্তু বাবার দেশে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াতে তিনটে বাড়ী, পুকুর এবং মসজিদের মালিকানা আলিআকবরের নামে দানপত্র করেছেন। উইল তৈরী করে বাবার কাছে যাবার পর বাবা সই করে দিয়েছেন। সই করার পর বাবা হাসতে হাসতে বলেছেন, আজ থেকে আমার আর নিজের বলতে কিছুই রইল না। আমি এই বাড়ীর চৌকিদার। এর পর বাবা অন্নপূর্ণার হাত ধরে নিজের মাথায় হাত রেখে বললেন, আমার দিব্যি করে বল, সারাজীবন রিয়াজ করবে এবং উপযুক্ত যদি কেউ ছাত্র ছাত্রী পাও, তাহলে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করবে যাতে সেনীঘরাণার নাম বজায় থাকে। এ ছাড়া আর একটা কথা মনে রেখো, মেয়েদের জন্য স্বামীর ঘরই হোল আসল ঘর। তবে যদি বোঝ তোমার কোন কারণে সম্মান থাকছে না তাহলে তোমার বিবেক যা বলবে তাই কোর।'

পাল বাবুর কথাগুলো শুনে মনে হোল বাবা তাড়াতাড়ি উইল করে দিলেন কেননা ভেবেছেন এবারে তাঁর যাবার পালা। কিন্তু তখন কি বাবা জানতেন, চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা আছে যে আরো বারোটি বছর তাঁকে মৈহারে কাটাতে হবে। এবং বাবার দেশের সম্পত্তি, আলিআকবরের না যাওয়াতে সব বেদখল হয়ে যাবে? যাক যে কাজ বাবা করেছেন তা অনেক আগেই করা উচিৎ ছিলো। মক্কা যাবার আগে শেষের কথা ভেবে মায়ের নামে বাড়ী এবং জয়েন্ট এক্যাউন্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা সর্বদা বলতেন, 'আগে কর শেষের আয়োজন।' পাল বাবুর কথায় বুঝলাম কটকে বাবা যখন গিয়েছিলেন বাজাতে, সেই সময় এক ভদ্রলোক চন্দন কাঠের একটা বাক্স উপহার দিয়েছিলেন এবং বাবার বাজনার মধ্যে কটকি রূপোর আতরদানি করিয়ে দিয়েছিলেন। কটক থেকে ফেরার পর সেই চন্দনকাঠের বাক্স এবং রুপোর কাজ করার গল্প শুনেছিলাম এবং দেখেছিলাম বুঝলাম নিদর্শন হিসাবে

বাবা সেই চন্দনকাঠের বাক্সটা অন্নপূর্ণাদেবীকে দিয়েছেন। অন্নপূর্ণাদেবী জিনিষটা তুচ্ছ হলেও বাবার আশীর্বাদ স্বরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটি গ্রহণ করেছেন।

যাক, বাবা ধীরে ধীরে অনেকটা সেরে উঠে মনের জোরে আবার সব কাজ করেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। ও দিকে আমি নিজের বাজনা নিয়েই আছি এবং মাঝে মাঝে এদিক ওদিক প্রোগ্রাম করে কোনরকমে দিন গুজরান করি।

৫১

সাতই এবং আটই অক্টোবার দুর্গাপূজার সময় পাটনার বড় বড় চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দুর্গাপূজার মণ্ডপ হয়। তাঁর সঙ্গে গান বাজনার আসরও বসে। তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের গুণী গায়ক, বাদক এবং নৃত্যকার আসেন। এই সব পুজোর উৎসবের মধ্যে লঙ্গরটোলির উৎসব আয়োজনে এবং আয়তনে বৃহত্তম। সেই লঙ্গ-রটোলিতে সাতই এবং আটই অক্টোবার বাজাতে গিয়েছি। যখন মণ্ডপের পেছনে সরোদের সুর মেলাচ্ছি তখন লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত তবলা বাদক মুন্নে খাঁ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কি-আপনি এখানে? আজ ভূপালে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। সেখানে রবিশঙ্কর, আল্লারাক্‌খা, পাগলাদাস, শরণরাণী প্রভৃতির যোগদান করবার কথা আছে আর আপনি বাবার এত কাছের লোক হয়েও এখানে?' আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোল। জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কি করে পালিত হচ্ছে? বাবার তো শতবর্ষ পূর্ণ হয় নি। যদি বাবার ভুল হয়েই থাকে তাহলে আমার নামই শিষ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল? মুন্নে খাঁর কথার কি জবাব দেব? বাধ্য হয়ে মিথ্যা কথা বলতে হোল। মিথ্যে কথা না বললে ঘরের মহারথীদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে বললাম, 'যে হেতু পাটনাতে বাজানোর আগাম অর্থ নিয়েছি তাই ভূপালে যেতে পারি নি।' এই মিথ্যা কথা বলবার জন্য নিজের প্রতিই রাগ হোল। আমার নিজের লোকেরাই মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করল। অবাক হয়ে যাই, যখন আমি মৈহারে ছিলাম সেই সময় আমার পরামর্শ বিনা কোন কাজ হ'তো না। কিন্তু মৈহার ছাড়ার পর আমি রাতারাতি পর হয়ে গেলাম। কথায় আছে, 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী।' আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। পাটনায় দুইদিন বাজাবার পরই লঙ্গরটোলির বঙ্গীয় সমাজের সেক্রেটারি এসে আমাকে পরের দিন বাঙ্গালী ক্লাবে বাজাবার অনুরোধ করলেন। শুনলাম বাবাও এই বাঙ্গালী ক্লাবে দীর্ঘদিন আগে বাজিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ক্লাবের ঘরে বাবার একটা ছবিও দেখলাম। সেক্রেটারির কথায় পরের দিন বাজিয়ে কাশীতে চলে এলাম। যদিও জানি বাবার শতবর্ষ হয় নি, তাহলেও মুন্নে খাঁর কাছে সংবাদ পেয়েই বাবাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শতবর্ষ পালিত হয়েছে জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম করলাম।

কাশীতে আসবার কিছুদিন পরেই আমার এক বন্ধু বললো, 'যুগান্তর' সংবাদপত্রে কেউ একজন লিখেছে, ভুল ক্রমে বাবার শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। বহু চেষ্টা করেও সংবাদপত্রটা জোগাড় করতে পারলাম না। মনে মনে অবাক হলাম, 'কোলকাতা থেকে কে এ কথা লিখতে পারে? হরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির বইখানা পড়েছি, যাঁর মধ্যে লেখা ছিল উনিশশো একাশি সনে বাবার জন্ম। এ কথা মৈহারে যাবার পরই রবিশঙ্করকে বলেছিলাম।

কিন্তু কি করে বাবার শতবার্ষিকী হয়ে গেল এ আমার বোধগম্যের বাইরে। খবর পেলাম, এই অনুষ্ঠানে আলিআকবর ছিলো না, কেননা উপস্থিত সে এখন বিদেশে বাজাতে গিয়েছে। মনে মনে ভাবি, যে শতবার্ষিকী পালন করেছে, সে ভুল করেছে। কথায় কথায় মধ্যপ্রদেশ সরকার যদি করে থাকে, তাহলে তাঁদের দেখা উচিৎ ছিল, মৈহারে কলেজ খুলবার সময় বাবার হিসাব মত হিন্দিতে কলেজের রেকর্ডে, বাবার জন্ম তারিখ লেখা হয়েছে দশই অক্টোবর আঠারোশ সাতষট্টি। বাবা তাঁর মধ্যে সই করেছিলেন। সেই ভুল তারিখ দেখলেও তো শতবার্ষিকী হয় না।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন চলে গেল। বাবার চিঠি পেলাম পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম

Shantikutir
MAIHAR
10th oct 1962

কল্যানবরেষু

বাবা যতীন আমার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তোমার প্রণাম জ্ঞাপক টেলিগ্রাম আমি পেয়ে অত্যন্ত সুখী হয়েছি

গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর ভূপালে ঐ উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে উৎসব মানান হয়। ৯ তারিখে আমি ভূপাল থেকে ফিরেছি।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
আলাউদ্দিন খাঁ

বাবার শরীর খারাপ বলে নিজে চিঠি লিখতে পারেন নি। কাউকে দিয়ে বাবা চিঠি লিখিয়েছেন। কিন্তু বাবা নিজে সইটা করেছেন। আমার কাছে বাবার এই শেষ চিঠি। এর পর বাবার শরীর খারাপ থাকাতে আর কোন চিঠি লেখেন নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই খবরের কাগজে পড়লাম বাবার উপর একটা সিনেমা হবে। সিনেমার প্রযোজক এবং সঙ্গীত নির্দেশক হবে আলিআকবর ও রবিশঙ্কর। সিনেমার পরিচালক হবে তপন সিংহ। বাবার ভূমিকায় অভিনয় করবেন চিত্রাভিনেতা কালী ব্যানার্জি। সংবাদপত্রটি পড়ে অবাক হলাম। অবাক হয়ে ভাবি সকলেই আমাকে কি ভাবে একপাশে সরিয়ে রেখে সব কাজ করে যাচ্ছে। সেই সময় আমার আরো অবাক হবার পালা ছিলো। কিছুদিন পরেই শুনলাম, বাবার উপর একটা তথ্য চিত্র হয়েছে। সেই তথ্য চিত্রেও আমাকে ডাকা হয় নি। তথ্য চিত্রটি মুক্তি পাবার পর, বহু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেন তথ্য চিত্রে যোগদান করেন নি?' কি উত্তর দেব? আমার নিজের লোকেরাই আমাকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করল, যা আমি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি। সকলের মুখ চেয়ে এই দ্বিতীয় বার আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হোল, 'তাড়াতাড়িতে তথ্য চিত্রটি হয়েছে। সেই

সময় আমি ব্যস্ত ছিলাম বলে যোগদান করতে পারি নি।' অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পৃথিবীতে যাঁরা মুখ ফুটে নালিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে, তাঁরাই উল্টে আসামী হয়।

একের পর এক, এই ঘটনা ঘটে যাওয়াতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। ভাবলাম, রবিশঙ্কর ও আলিআকবরের সঙ্গে দেখা হলে এই অবজ্ঞার কারণ জিজ্ঞাসা করব এবং বোঝাপড়া করব। প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা আছে। সেই সীমা পরের পর ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সকলের কাছে জবাবদিহি করতে হয় বলেই মনে মনে রাগ হয়। পর মুহূর্তেই অসকার ওয়ালড এর একটা উক্তি ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিই। অসকার ওয়ালড এক জায়গায় লিখেছেন, 'হু হ্যাজ গট এ মিসন মাষ্ট গো ইট এলোন।'

মৈহার ছাড়ার পর দীর্ঘ ছয়বৎসর হয়ে গেল। নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝলাম অবিমিশ্র প্রশংসা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। মধু পেতে গেলে, হুল ও গোলাপের কাঁটা সহ্য করতে হয়। এই জগতের নিয়ম। আজকের যুগে যে কম্প্রোমাইজ করতে পারে সেই ধাপে ধাপে উন্নতি করে। সঙ্গীতের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকেছে। রণে এবং নিজের স্বার্থের জন্য নীতির বালাই রাখতে নাই। তাই শয়তান জেনেও প্রয়োজনে তাঁদের কাছে ডেকে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে হয়। পরের ব্যাপারে সবাই কৌতুহল প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তাঁর উপকারের বেলায় কেউ নাই। জীবনে সকলেই বড় হতে চায় নিজের কাজে। কিন্তু এক একজন কেবল বড়ই হতে চায় না, আরো বড়, আরো বড়। একেবারে আকাশে গিয়ে মাথা ঠেকাতে চায়। বাবার কাছে সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা একধরনের শুনেছি, কিন্তু আজকাল সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে, যেন তেন প্রকারে অর্থ উপার্জন করে নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে না পারলে ঐশ্বর্যবান হয়ে কি সুখ? কথায় আছে, 'পলাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে।' আমার বেলায় দেখছি তাই হয়েছে। যত ভাবি একান্তে থাকব, সাত পাঁচে থাকবার দরকার কি? ভেবেছি অরবিন্দর ভাষায় থাকব, 'ফ্রম এলোন টু এলোন।'

কিন্তু আমার জীবনে কয়েকটি শুকর শাবক পেছনে পড়ে গেছে। যাক এ সব ভেবে লাভ নাই। একান্তে নিজের সাধনা করি এবং মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম করি। দেখতে দেখতে সাতটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এর পর গৌহাটি এবং শিলং থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। গৌহাটির বাজনা শুনে, একটা সঙ্গীতের নূতন অনুষ্ঠানে, আমাকে বছরের শেষের প্রথম সপ্তাহে বাজাবার আমন্ত্রণ করল। কর্মকর্তা বলল, 'সেই সময় খুব বড় সঙ্গীত সম্মেলন হবে এবং ভারতবর্ষের গুণী শিল্পীরা গৌহাটিতে সঙ্গীত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।' আমি প্রথম যে বার গৌহাটি যাই, পরিচয় হয়েছিল এক প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি এবং সঙ্গীত প্রেমিকের সঙ্গে। সেই শিল্পপতি জিনু অহমদ আমাকে বললেন, 'এই সংস্থাটির কর্মকর্তা বিশ্বাসনীয় নয়। সঙ্গীত সম্মেলন করে বটে, তবে বাজাবার পর শিল্পীদের টাকা দেয় না। বাজনার পর তাঁর আর দর্শন পাওয়া যায় না। যদি আপনাকে সম্মেলনে ডাকে, তাহলে তিনি চতুর্থাংশ টাকা অগ্রিম চেয়ে নেবেন। যদি টাকা পাঠায় তাহলেই আসবেন।' এ-কথা শুনে অবাক হলাম।

যাই হোক গৌহাটি এবং শিলং এ বাজিয়ে প্লেনে করে কোলকাতায় গেলাম। কোলকাতায় এসে দেখলাম আলিআকবর কোলকাতায় আছে। আলিআকবরকে বললাম, 'বাবার শতবার্ষিকী হোল অথচ আমাকে ডাকা হোল না কেন? লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ ছাড়া কাগজে পড়লাম বাবার নামে একটা সিনেমা করছেন । একটা কথা মনে রাখবেন, বাবার উপর বই হলে তাঁর মধ্যে যদি আমার (প্রাইভেট সেক্রেটারির) ভূমিকা না থাকে তাহলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না। বাবার উপর তথ্যচিত্র হয়ে গেল, তাতেও আমাকে ডাকা হোল না? বলতে পারেন এঁর কারণ কি?' আলিআকবর আমার মেজাজ জানে। বলল, 'বাবার শতবার্ষিকীতে আমি ছিলাম না। আমি থাকলে তোমাকে নিশ্চয় ডাকতাম। এবারে মৈহারে বাবার একশোএক জন্মদিবস পালিত হবে। তাঁর মধ্যে আমি যাব এবং তোমাকে নিশ্চয় ডাকব। বাকী রইল বাবার উপর সিনেমা হবার কথা। সিনেমা হলে তোমাকে বম্বে নিশ্চয়ই ডাকব। স্ক্রিপ্ট লিখবার সময় তোমার সহযোগিতা প্রয়োজন। তোমাকে নিশ্চয় ডাকব।' আলিআকবরের কথা শুনে সব রাগ জল হয়ে গেল। কিন্তু তখন কি জানতাম, বাবার উপর সিনেমা, যে কোন কারণে হোক হবে না। যাক আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করে কাশী চলে এলাম।

কাশীতে আসার কিছুদিন পরেই তানসেনে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম, যা হবে বছরের শেষে। ইতিমধ্যে মৈহারের পূরণ চন্দ্র সেটের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম। বাবার একশোএক জন্ম বার্ষিকিতে বাজাবার জন্য আমাকে লিখেছেন। লিখেছেন, 'সকলের কাছে চাঁদা নিয়ে এক বিরাট কাজে হাত দিয়েছি। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আপনাকে কি পারিশ্রমিক দিতে হবে?' উত্তরে লিখলাম, 'এ কাজটা তো তোমাদেরই করা উচিৎ। আপনি এত পরিশ্রম করে করছেন তাঁর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। পয়সার কোন প্রশ্নই আসে না। বাবার কাজে নিজের খরচে বাজাব।' মৈহার ছেড়ে এসেছি দীর্ঘ ছয় বৎসর হোল। বাবার শারীরিক এবং মানসিক কথা ভেবে মৈহার যাই নি। না যাবার কারণ একটা ছিলো, যদি বাবা কলেজে কাজ করতে বলেন। কিন্তু এখন বাবা কলেজে যাচ্ছেন না সুতরাং যেতে কোন অসুবিধে নেই। মৈহারে যাব এ কথা ভেবে মনে মনে রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। পূরণ চন্দ্র সেটের চিঠিতে জানলাম, আলিআকবর শিল্পীর সব ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু কিছু শিল্পী পূরণ চন্দ্র শেঠও ঠিক করেছেন। আমি ভাবলাম বাবার বাড়ীতে ভিড় হয়ে যাবে। মাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে, তাই আমার ছাত্র ডেভিডকে লিখলাম, মৈহারে গিয়ে তার বাড়ীতে উঠব।'

একত্রিশ অক্টোবরে মৈহারে পৌঁছলাম। স্টেশন-এ ডেভিডকে দেখলাম। ডেভিড বলল, 'মৈহারে উপস্থিত একজন বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রেমী এগ্রিকালচারাল অফিসার আছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনি তাঁর বাড়ীতে ওঠেন।' বললাম, 'তোমার এখানেই উঠব। অপরিচিতের ওখানে উঠলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা হবে। তাই কারোর বাড়ীতে পারতপক্ষে উঠি না।' স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়েই দেখি, জীপগাড়ী নিয়ে কৃষি বিভাগের অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। কম আলোর জন্য দূর থেকে ভদ্রলোককে অস্পষ্ট দেখলাম। কাছে গিয়ে

দেখে অবাক হবার পালা। আমার ছোট বেলার বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছি। এগ্রিকালচারে এম.এস. সি পাশ করে নানা জায়গার পর, বদলী হয়ে উপস্থিত কিছুদিন হোল মৈহারে এসেছে। আমার বন্ধু অরুণ বোসকে দীর্ঘদিন পরে দেখে অবাক হলাম। অরুণ বলল, 'আমার কোয়াটার্সে উঠতে হবে।' বললাম, 'ঠিক আছে। বাজনাটা হয়ে যাক, তারপর যাব।' আমার বন্ধুর দুই ছোট ছেলে এবং তিনটি মেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স বোধ হয় বারো বছর হবে। ডেভিডের কাছে সেতার শেখে। আমার বন্ধু, ডেভিডের কাছে আমার নাম এবং ফটো দেখেই চিনেছে, যার জন্য কাটনি এবং সাতনায়, অমার দুটো বাজনার অনুষ্ঠান আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে। এও শুনলাম, বাবার কাছে আমার বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায় যায়। বাবা বন্ধুর স্ত্রীকে মা বলে ডাকে এবং সেই হিসাবে আমার বন্ধুকে 'জামাই বাবা' বলে ডাকেন। এ কথা শুনে খুব ভাল লাগল।

পরের দিন আমার বন্ধুকে নিয়ে বাবার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলাম। বাবা আমার বন্ধুকে আমার সঙ্গে দেখেই বললেন, 'এই ছেলেটা আমার পূর্ব জন্মের কেউ ছিলো। এই জামাই বাবা এবং এঁর স্ত্রী, আমার ধর্ম মা। আমার খুব সেবা করে।' এ কথা শুনে আমার বন্ধু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমরা একসঙ্গে ছোট থেকে পড়েছি।' বাবা একথা শুনে খুশি হলেন।

পরের দিন বাবার কাছে গেলাম ডেভিডকে নিয়ে। গিয়ে দেখলাম আলিআকবর এসে গেছে। আলিআকবর সব শিল্পীদের থাকবার জন্য ধর্মশালায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হঠাৎ দেখি স্বামী পাগলাদাস অযোধ্যা থেকে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাবাকে দেখেই প্রণাম করলেন। বুঝলাম বাবা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বাবা পাগলা দাসকে বললেন, 'আরে আরে, তুমি সাধু, তুমি আমাকে প্রণাম করলে, আমার পাপ হবে।' পাগলাদাস বলল, 'আপনাকে আমি বাবা বলেই জানি।' বাবা পাগলাদাসকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনবছর আগে হাথরসে পাগলাদাস আমার বাজনা শুনেছিল। সে আমাকে চিনতে পারল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিলাম।

আমার প্রোগ্রামটা পড়েছে রাত্রি এগারটার সময়। শামতাপ্রসাদ আমার সঙ্গে বাজাবে। বিকেল চারটের সময় ডেভিডের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ ধ্যানেশ এসে বলল, 'শামতাপ্রসাদ সকালে মন্দিরে দর্শন করে সিঁড়ি চড়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই আপনার সঙ্গে বাজাতে পারবে না, এখনও ঘুমোচ্ছে। শেষ রাত্রে বাবার সঙ্গে বাজাবে। বাবা বলে পাঠিয়েছেন, পাগলা দাস সকলকে বলছে যে আমার সঙ্গে বাজাবার কেউ কি আছে এখানে? আসলে গত বছর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভূপালে দাদুর কথায় পিসেমশাই পাগলা দাসের সঙ্গে বাজাতে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ বাজাবার পরই বাজনা বন্ধ করে আল্লারাক্খার সঙ্গে বাজিয়েছিল। কারণ হিসেবে বলেছিলো যে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাঁর বাজাবার অভ্যাস নেই। তাই বাবা বলেছেন আপনি যেন পাগলা দাসের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজিয়ে এতদিন পরে তাঁর উপযুক্ত জবাব দেন।'

ধ্যানেশের কথা শুনে বললাম, 'পাগলাদাসকে ডাকা হয়েছে। সকালেই দেখেছি বাবাকে

কত শ্রদ্ধা করে। যাঁকে বাবার কাজে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হয়েছে তাঁকে অপমান করতে পারি না। তোর বাবাকে গিয়ে বল, অন্য জায়গায় যে দিন পাব তাঁকে এর জবাব দেব। তবে এখন সেটা করা অভদ্রতা হবে।' এ কথা শুনে ধ্যানেশ বলল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে কে বাজাবে?' বললাম, 'আশিসের সঙ্গে কোলকাতায় শঙ্কর ঘোষ যে রিয়াজ করত, তাঁর সঙ্গেই আমাকে রাখ।' সন্ধ্যায় বাবার একশো একবর্ষ পূর্ত্তি উৎসবের উদ্বোধন হবে বলে আমি স্নান করে মঞ্চেতে গেলাম। আমার বন্ধু এবং আমি বাবাকে ধরে মঞ্চে বসালাম। প্রথম প্রোগ্রাম অর্কেষ্ট্রা হবে। বাবা এই বৃদ্ধ অবস্থায় বেহালা নিয়ে বসলেন। অর্কেষ্ট্রা বাদনে একটু ত্রুটি হওয়াতে বাবা হঠাৎ বললেন, 'মারেগা।' বাবার গলার আওয়াজ এখন স্পষ্ট নয়, বাবাকে কোন রকমে শান্ত করলাম। মা স্টেজের সামনে বসেছিলেন। হঠাৎ বাবার নজর পড়তেই বললেন, 'আরে আরে, তোমার মা কেন এসেছে? বাড়ীতে যেতে বলো।' বললাম, 'আপনার এত সম্মান হচ্ছে, মা দেখবেন না?' বাবা কখনও চাইতেন না যে মা খুব আপন লোক ছাড়া লোকের সামনে আসে। যাই হোক, বাবার অর্কেষ্ট্রা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মা বাড়ী চলে গেলেন। এই অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে আলিআকবরের সঙ্গে শামতাপ্রসাদ বাজাল। বাজনা ভালই হোল।

পরদিন আমার বন্ধু জোর করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুর জিপে সাতনা ও কাটনির প্রোগ্রাম করে কিছু টাকা পেলাম। এর পর মৈহারে সাতদিন থেকে রোজ দুবেলা বাবার সঙ্গে দেখা করতাম এবং নানা কথা হ'তো। ডেভিডের কাছে শুনলাম আমার মৈহার ছাড়ার পর বাবার শরীর ভাল থাকায় সব নূতন ছাত্ররা এবং শরণরাণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে দুইবার এসেছিল। বর্তমানে বাবার কাছে গিয়ে দেখলাম, কোন ছাত্রের দেখা নেই। মৈহারের একমাত্র ডেভিড যে কলেজে কাজ করত এবং মৈহারের ছাত্ররা বাবার কাছে আসে। ডেভিডের কাছে এ কথাও জানতে পারলাম, গতবছর বাবার শতবর্ষ হবার পরে ইন্দ্রনীল কোলকাতায় চলে গেছে। এঁর কিছুদিন পর রবীন অসুস্থ হয়েছিল বলে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। যে হেতু অরুণ আমার বন্ধু ছিল সেইজন্য বাবার কাছে দীর্ঘ নয় বছরের মত প্রতি বছরে তিন চারবার বরাবর গিয়েছি মহাপ্রয়াণের আগে পর্যন্ত। এই দীর্ঘ নয় বছরে কত কিছু দেখলাম সে পরের কথা পরেই বলব। যথা সময়, বছর শেষ হবার মাঝামাঝি দুই মাস আগে কাশী চলে এলাম।

মৈহার থেকে যেদিন কাশীতে এলাম, সেদিন দুপুর বেলায় শুনলাম সাত আটজন বাঙ্গালী এসেছেন। আমি নীচে যেতেই দেখলাম, প্রায় সকলেই কম বয়সী, কিন্তু একজন বয়স্ক লম্বা ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, 'আমরা প্রয়াগ সঙ্গীতের কোলকাতা কেন্দ্র থেকে এলাহাবাদে ডিগ্রি নিতে যাচ্ছি, ফেরার পথে বারাণসী হয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোলকাতায় ফিরে যাবো।' যিনি প্রধান তিনি বললেন, 'আগে আমি সচিত্র ভারতের সাপ্তাহিকীর সম্পাদক ছিলাম। এখন আমি 'সুরছন্দা' সঙ্গীত পত্রিকার সম্পাদক। আমি কোলকাতার একটা গানের স্কুলের পরিচালক।'

মৈহার থাকাকালীন, সঙ্গীতের উপর 'সঙ্গীত বিজ্ঞাপন প্রবেশিকা' বাবার কাছে আসত।

এ ছাড়া হাথরস থেকে 'সঙ্গীত' পত্রিকা আসতে দেখেছি কিন্তু 'সুরছন্দা'র নাম শুনিনি। এঁর পরই ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও আমি কৈশোরে কাশীতে কাটিয়েছি কিন্তু দীর্ঘদিন কোলকাতায় আছি।' ভদ্রলোক বললেন, 'কোলকাতায় আপনার বাজনা শুনেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেবো সুরছন্দা মাসিক পত্রিকার জন্য।' মনে মনে পুলকিত হলাম। বহু লোককে দেখেছি বাবার সাক্ষাৎকার নিতে, আর আজ আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন? আমার জন্য কাশীতে আসবেন এবং বিকেলের গাড়ীতে কোলকাতায় চলে যাবেন। এ কথা শুনে বললাম, 'দেখুন, বাবার একশোএকতম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে বাজিয়ে সবেমাত্র মৈহার থেকে এসেছি।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা তো প্রমাণ করে দিয়েছি উস্তাদ-এর শতবার্ষিকি ভুল করে হয়েছে। আসলে তাঁর জন্ম আঠারশো একাশী সালে। এ নিয়ে আমি দীর্ঘ একবছর ধরে ধারাবাহিক লিখেছি এবং এখনও লিখেছি। যে হেতু আপনি উস্তাদজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন তাই আপনার কাছ থেকে সেই প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। আপনি আমাদের 'সুরছন্দা' ম্যাগাজিন পড়ে নি?' আমি বললাম, না। এই সুরছন্দার নামই শুনি নি।' এ কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'কাশীতে অবশ্য কিছু গ্রাহক আছে। যাই হোক কোলকাতায় গিয়ে আমাদের পত্রিকা পাঠিয়ে দেব।' সাক্ষাৎকারের নামে যে আমি পুলকিত হয়েছিলাম কর্পুরের মত উড়ে গেল। ভাবলাম কি করে জানল বাবার জন্ম আঠারোশো একাশি সালে। আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, কয়েকমাস পরেই আমি কোলকাতায় তানসেন কনফারেন্সে বাজাতে যাব, সেই সময় আপনাকে সাক্ষাৎকার দেব।' ভদ্রলোক রাজী হলেন। তাঁদের আপ্যায়িত করে বিদায় দিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই একটা বড় প্যাকেট রেজিস্টার্ড পারসেলে পেলাম। খুলে দেখি এগারো মাসের 'সুরছন্দা' পাঠিয়েছেন। প্রথম সংখ্যা খুলেই দেখলাম, সম্পাদকীয়তে বাবার উৎসব যে ভুল ভাবে করা হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন এবং কোলকাতার বিমলাকান্ত রায়চৌধুরি সে সম্পর্কে একটা মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরির নাম বাবার কাছে শুনেছিলাম। বিমলাকান্তর মাকে বাবা দিদি বলে সম্বোধন করে অনেক গান লিখে পাঠিয়েছিলেন। লেখায় হরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির 'মিউজিসিয়ান অফ ইণ্ডিয়া' বইটার রেফারেন্স দিয়েছেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা অবধি সমস্ত পড়ে ফেললাম। অপমান এবং রাগও হতে লাগল, কিন্তু যা লিখেছে তাঁকে অস্বীকার করি কি করে? ভাবলাম, আমি যেমন 'সুরছন্দা'র নাম জানি না, সেইরকম রবিশঙ্কর, আলিআকবরও হয়ত জানে না, নইলে রবিশঙ্কর অন্ততঃ কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করত। মাথা দপদপ করতে লাগল। সারা বিকেল এবং রাত্রে বারবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকবার পড়লাম।

এঁরমধ্যে খবর পেলাম কাশীতে রবিশঙ্কর ডিসেম্বারের প্রথম সপ্তাহে সঙ্গীত পরিষদে বাজাতে আসছে। এবারে এই অনুষ্ঠানে আমার বাজনা নাই। ভাবলাম ভালই হোল। রবিশঙ্কর এলে সব বলব এবং এঁর ব্যবস্থা করতে বলব। আশুতোষের কাছে জানলাম রবিশঙ্কর কাশীতে বাজিয়েই পরের দিন বিকেলে গৌহাটি চলে যাবে। এর মধ্যে আমার

মজঃফ্‌রপুরে একটা প্রোগ্রাম ঠিক হোল। আমি রাজী হলাম কেননা রবিশঙ্কর শেষ রাত্রে বাজনা শেষ করবে। সেই দিন সকালেই আমি কাশী চলে আসব। জানি সারারাত বাজিয়ে দুপুর অবধি ঘুমোবে এবং আমিও সকালে চলে আসব। সুতরাং রবিশঙ্করের যে সব দেখা শোনা করত, তাঁকে বললাম, 'দেখ রবিশঙ্করকে বোলো, আমার বিশেষ কথা আছে, সুতরাং রবিশঙ্কর সারারাত বাজিয়ে দুপুর বারোটার সময় যেন কারো সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট না রাখে। আমি একলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

রোজ সারা দিনরাত সুরছন্দা পত্রিকাটা যেন আমাকে তাড়া করছে। সংক্ষেপে বলি, প্রতি মাসে একটি অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে কাউকে কটুক্তি করতে ছাড়েনি। সর্বশেষে লিখেছে, 'বাবার বয়সের জন্য তাঁর মতিভ্রম হতে পারে, কিন্তু তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, বা সংসারের যে কোন সদস্য বা শিষ্য সম্প্রদায় সত্য কথা বলুন। কেননা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা মহাপাপ। আমরা সব গুণীজনদের শতবার্ষিকী পালন করেছি, আর উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শতবার্ষিকী পালন করব না? কিন্তু যা মিথ্যা তা কি করে স্বীকার করব?'

যাই হোক মজঃফ্‌রপুর থেকে বাজিয়ে কাশীতে সকালে এসে পৌঁছলাম। ঠিক দুপুর বারোটার সময় কাশীর ক্লার্ক হোটেলে পৌঁছলাম। দেখলাম রবিশঙ্করের কাশীর বাহন শম্ভু এবং দুবে দুইজনেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেতেই শম্ভু রবিশঙ্করকে ডেকে দিল। রবিশঙ্কর বাইরে এল। এসেই বলল, 'আরে কাল তোমায় অনুষ্ঠানে দেখলাম না?' বললাম, 'কেন আপনার বাহনরা বলে নি, যে আজ সকালেই আমি মজঃফ্‌রপুর থেকে ফিরব?' রবিশঙ্কর বলল, 'হাঁ, হাঁ, বলেছিল বটে। আসলে শেষ রাতে বাজিয়ে এই মাত্র উঠেছি, তাই এখনও ঘুমের ঘোর যায় নি। আচ্ছা বলতো কি ব্যাপার?' প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুরছন্দা' নামে কোলকাতা থেকে একটি পত্রিকা বেরোয়, তার নাম কি আপনি শুনেছেন?' রবিশঙ্কর বলল, 'কেন বলোতো?' বুঝলাম যেমন আমি জানি না, তেমনি রবিশঙ্করও জানে না। তখন আমি মৈহার থেকে এসে নীলরতনবাবুর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বললাম। সব শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'চাঁদু, সব জানি। আলু ভাইও জানে এবং বাবাকে এবং আমাদেরও রেজিষ্ট্রি করে পাঠিয়েছে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বাবার কথা ছেড়ে দিন। আমি মৈহারে থাকলে এর ব্যবস্থা করতাম, কিন্তু আপনি এবং আলিআকবর সব পড়েও কি করে চুপ করে রয়েছেন?' রবিশঙ্কর খুব সহজভাবেই বলল, 'কি বলব বল?' গম্ভীর ভাবে বললাম, 'মৈহারে যাবার পর বাবার বাড়ীর বারান্দায় আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। বলুন, সেই সব কথা মনে আছে কি না?' রবিশঙ্কর একটু ফ্যালফ্যাল করে যেন চিন্তা করছে, এই ভাব দেখিয়ে বলল, 'হাঁ মনে আছে।' আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'দেখুন আপনি সবে ঘুমিয়ে উঠেছেন, বেশী কথা বলতে চাই না। তবে এইটুকুই বলি, এই লেখা পড়ে আপনাদের কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি? এত বড় সত্যটা চোখের সামনে দেখেও আপনি সত্য স্বীকার করতে ভয় পান?'

রবিশঙ্কর আমার অবস্থা বুঝে বলল, 'তুমি বলো কি করতে পারি? কয়েকজন ছাড়া এই পত্রিকা কত জনে পড়ে?' রবিশঙ্করের কাছে এই ধরনের উত্তর শুনে অবাক হলাম। বললাম,

'এই পত্রিকাটার, যদি একহাজার পাঠক হয় তাহলে দশহাজার লোকের মুখে এই চর্চা হবে।' এই কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'তুমিই বলো, এর প্রতিকার কী?' বললাম, 'এই কয়েক দিন ধরে আমি যা স্থির করেছি, তা এই নীলরতনবাবুর কাছে আপনি গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলুন, ভুল হয়ে গিয়েছে।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর হাই তুলে বলল, 'দেখ এখনও ঘুম কাটে নি। হাঁ আর একটা কথা। গৌহাটি থেকে এডভ্যান্স আমি পেয়েছি এবং সেক্রেটারীর কাছ থেকে যে সব শিল্পী অংশগ্রহণ করবে, তার মধ্যে তোমারও নাম দেখেছি। সুতরাং সেই সময় সব কথা হবে।' বললাম, 'শুনেছি এই সংস্থাটি বাজাবার পর টাকা দেয় না। আমি অগ্রিম টাকা পাই নি। অগ্রিম না পেলে যাব না। তবে আপনি যদি যান, আমার দাদার সঙ্গে গৌহাটিতে দেখা করবেন। আমার দাদার টেলিফোন লিখে দিচ্ছি। যদি গৌহাটি না যাই তাহলে সোজা কোলকাতায় গিয়ে নীলরতনবাবুর কাছে ইন্টারভিউ দেব। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবেন।' কি আশ্চর্য? 'সুরছন্দায়' এই লেখার পরও কি করে এরা চুপ করে থাকতে পারে? আলিআকবরকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে ধরি না, কেননা, সে রবিশঙ্করের কথায় সবকিছু করে। কিন্তু সব জিনিষেরই সীমা আছে। দুজনের মুখ চেয়ে অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু দীর্ঘ পনেরো বছর পর সব সংশ্রব ত্যাগ করেছি। রবিশঙ্কর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, অন্যকে যেমন বাই ক্যাস, কাইণ্ড, কিংবা নানা প্রলোভন দিয়ে জয় করতে পারলেও, একমাত্র বোধহয় আমাকেই করতে পারে নি। এরপর যা করেছিলাম জীবনের শেষেও ভুলতে পারবে না। কথায় বলে অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। তাই তাঁর হয়েছিল। আমার কাছে তাঁর চালাকি ধরা পড়ে গেছে। যাক সে সব অনেক পরের কথা। পরের কথা আগেবলে রসভঙ্গ করব না।

পাপের জন্য মানুষকে মাশুল দিতে হয়, আর সে মাশুল হোল এই সমাজের মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও সমস্ত কুকীর্তির নিঃশ্বর্ত স্বীকৃতি। এক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ যেন বিবেকের কাছে পরাজিত। পাপের এই মাশুল দিতেও হয়েছিল। যাক সে কথা এখন থাক।

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এবারে গৌহাটি এবং শিলং এ বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। কোলকাতায় গিয়েই প্লেনে গৌহাটি যাব। কোলকাতায় গিয়ে সুরছন্দার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কেননা এখনও সম্পাদকীয়তে বাবার শতবার্ষিকী নিয়ে অভিযোগ চলছে। কোলকাতায় গিয়ে নাদুর ওখানে উঠলাম। নাদু আমাকে বিশেষ করে একটা ছেলেকে সেতার শেখাবার জন্য বলল। ছেলেটি খুবই ভাল। নাম দীপক চক্রবর্তী। এই সময় বেনারসী শাড়ী ব্যবসায়ী হেম ভট্টাচার্যর মালিকের ছেলে বীরেন ভট্টাচার্যকে, আমার এক বন্ধুর সুপারিশে শেখাতে লাগলাম। নাদুর কাছে জানলাম দীপক চক্রবর্তী টেক্সমাকোতে চাকরি করে। চাকরিতে সকাল ছটায় যায় এবং সন্ধ্যা ছটায় বাড়ী ফেরে। কিন্তু সঙ্গীতের অত্যন্ত আগ্রহ দেখে শেখাতে লাগলাম।

আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে জুবেদা বেগমের কাছে যে সংবাদ শুনলাম, তা আমার কাছে বিস্ময়কর। শুনলাম, ধ্যানেশের উপর রাগ করে নিজের বাড়ী থেকে দূরে, আলিআকবর একটা নূতন বাড়ী ভাড়া নিয়ে একলা আছেন। জুবেদা খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এ

নিয়ে কোলকাতায় নানা রকম আলোচনা চলছে। একমাত্র আপনিই ওকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে পারেন, কেননা উনি আপনার কথা শোনেন। আপনার কথায় না করবেন না। সকলের কাছে জবাবদিহি করতে করতে লজ্জিত হচ্ছি। উনি এসে বাড়ীতে থাকুন। ধ্যানেশ ওনার সামনে যাবে না।' এই কথা বলেই আলিআকবরের নূতন ঠিকানা দিলেন। বললাম, 'কোলকাতায় এতদিন আসছি, কিন্তু কোন নূতন জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি করে ঠিকানা বার করতে, অনেক সময় লেগে যাবে এবং অসুবিধা হবে।' ঠিক এই সময় ইন্দ্রনীল এসে পৌঁছল। জুবেদা বেগম ইন্দ্রনীলকে দেখে বললেন, 'এই আপনাকে দূর থেকে বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে।' ইন্দ্রনীলও বলল, 'আমি যে বাড়ী দেখিয়েছি তা যেন বলবেন না।' জুবেদা বেগমও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ইন্দ্রনীল ঠিকই বলেছে। বাড়ী কেউ দেখিয়ে দিয়েছে শুনলে উনি রাগ করবেন।' বললাম, 'ঠিক আছে, চলো।' ট্যাক্সি করে যাত্রা করলাম।

কোথায় ভেবেছি, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে 'সুরছন্দায়' যাতে আর কিছু লেখা না হয় সেই বিষয়ে কথা বলব, অথচ এ কি এক উটকো ঝামেলা? ইন্দ্রনীলের কাছে নানা ঘটনা শুনলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীর কাছে এসে গিয়েছি। বাড়ীর একটু দূরে গাড়ী থামিয়ে ইন্দ্রনীল বাড়ী দেখিয়ে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখলাম আলিআকবরের নেম প্লেট। কলিং বেল বাজতেই দেখি একজন অর্ধেক দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?' বললাম, 'আলিআকবর আছেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'আছেন তবে ঘুমোচ্ছেন।' এই অর্ধেক দরজা ভেজিয়ে, চামচের কথা বলা দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আলিআকবর খাঁ সাহেবের সেক্রেটারি।' রাগের মাথায় বললাম, 'আপনি যাঁর সেক্রেটারি আমি তাঁর বাবার সেক্রেটারি।' লোকটা আমার কথা শুনে একটু থতমত খেল। তখন ভদ্রলোক আমার মূর্তি দেখে বললেন, 'আসুন, আসুন, বসুন।' ড্রয়িং রুমে বসে খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'চা খাবেন?' গম্ভীর ভাবে বললাম, 'না।' প্রায় দশ মিনিট পরেই আলিআকবর দরজা খুলে আমাকে দেখেই বললো, 'আরে তুমি কখন এসেছ?' বললাম, 'এসেছি কিছুক্ষণ, কিন্তু আপনার সেক্রেটারি অর্ধেক দরজা বন্ধ করেই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের এই সব চামচের জন্যই আপনাদের বদনাম হয়।' আমার কথা শুনেই আলিআকবর নিজের সেক্রেটারিকে বললেন, 'তোমার কি কোন দিন আক্কেল হবে না? জানো এ কে? এ হোল আমার বাবার ছাত্র, এবং আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলো।' হঠাৎ যেন জোঁকের মাথায় নুন পড়ল। ভদ্রলোক বলল, 'দাদা ভুল হয়ে গিয়েছে।' আলিআকবর চটে উঠে বললেন, 'তোমার সর্বদাই এই রকমের ভুল হয়। একটা কথা বলো তো, চা কিংবা কোল্ড ড্রিংক দিয়েছো কিনা?' এ কথা শুনে বললাম, 'আপনি রাগ করবেন না। আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলো, আমি নিজেই বারণ করেছিলাম। আজই কোলকাতায় এসে পৌঁছেই আপনার কাছে বিশেষ কারণে এসেছি।' আমার কথা শুনেই বললেন, 'তাহলে এখানে খাবার খেয়ে যাবে। আমি দু মিনিটের মধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে আসছি।' বললাম, 'খাবার জন্য এখন আসি নি।। আপনার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা আছে, এবং সেই কথা বলেই আমাকে একজায়গায় যেতে হবে। আপনি নিশ্চিন্তে চা খেয়ে স্নান সেরে আসুন। ততক্ষণ আমি ম্যাগাজিন এবং কাগজ পড়ছি।' আলিআকবর সেক্রেটারির উপর অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'শীঘ্রই আসছি।' প্রায় আধ ঘণ্টা পর সব কিছু সেরে আমাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। ঘরে দেখলাম এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত গোপন কথা আছে, কারো সামনে সে সব কথা হবে না।' আলিআকবর ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'তুমি পাশের ঘরে যাও।'

আলিআকবর এঁরপর বললেন, এ-বাড়ীর খবর কি করে পেলে?'

আলিআকবরের প্রশ্নে স্পষ্ট বললাম, 'আপনার বাড়ী গিয়ে শুনলাম, আপনি এখানে এসে রয়েছেন, তাই এলাম।' আমার কথা শুনে আলিআকবর বললো, 'তাহলে তো সবই শুনেছ। তোমার ছাত্র ধ্যানেশ কত বড় বদতমিজ হয়েছে বল তো?' বললাম, 'ছেলে ভাল কাজ করলে আপনার ছেলে আর খারাপ কিছু করলে আমার ছাত্র। এঁর জন্য তো আপনিই দায়ী। বাবার পার্সোনালিটির সামনে কখনও চোখ তুলে কথা বলতে পারেন নি, অথচ ছেলেকে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন আজকালকার যুগ অনুযায়ী। এ কতটা উপযুক্ত, তা না বিচার করে এই ধরনের বন্ধুর মত ব্যবহার করলে, পরিণতি এই রকমই হয়। আমার কথায় রাগ করবেন না, যা সত্য তাই বললাম।' আলিআকবর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, এঁর পর বললেন, 'তোমার সব কথা শুনব, কিন্তু আমাকে বাড়ীতে যেতে বোলো না। এ বিষয়ে যদি বলো তাহলে, আমার দ্বারা সে কথা রাখা সম্ভব নয়। আমি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি। তুমি কি চাও এই ব্যাপারের পর আমি বাড়ী যাই?' এ কথা শুনে বললাম, 'ঠিক আছে এ বিষয়ে পরে কথা হবে। আসলে যাঁর জন্য এসেছি সে কথাই আগে বলি।' এ কথা বলে 'সুরছন্দা' ম্যাগাজিন সম্বন্ধে রবিশঙ্করের সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সব বললাম। এও বললাম, 'আপনি সব জেনেও কি করে চুপ করে আছেন?' আলিআকবরের মুখ এখন দেখার মতন। আমার মনে হোল এই সত্য স্বীকার করতে কেউ রাজী নয়। ভুল করা মানুষের সহজাত স্বভাব। কিন্তু এটা স্বীকার করতে লজ্জার কি আছে? কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কি করে এঁদের বোঝাব, 'উই লারন ফ্রম হিষ্ট্রি দ্যাট উই ডুনট লারন ফ্রম হিষ্ট্রি।'

এখানে বলে রাখা ভাল, অনেকে হয়ত ভাবছেন আলিআকবরের সঙ্গে এ রকম কথা আমি কি করে বলতে পারি? তাঁর জবাবে একটা কথাই বলব, আলিআকবর বা রবিশঙ্করকে যেমন সম্মান করেছি, তেমনি বহুদিন যে রকম প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে কথা হয় সেইরকমই কথা বলেছি। তবে ব্যতিক্রম হয়েছে। মৈহার ছাড়ার ষোলো বছর পর আলিআকবরের সঙ্গে এবং মৈহার ছাড়ার বাইশ বছর পরে রবিশঙ্করের সঙ্গে আর দেখা করি নি।

যাক যা বলছিলাম। আলিআকবরের থতমত ভাব দেখে বললাম, 'গতবছরের শেষে আমি গৌহাটি যাই নি, যাঁর ফলে রবিশঙ্করের সঙ্গে কোন কথা হয় নি, এবং চিঠিও পাই নি, অথচ আজ বিকেলে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইন্টারভিউ দেব বলে কথা দিয়েছি। সুতরাং বাবার ভাষায়, কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া ভেবেই এখান থেকে তাঁর কাছে যাবো। এখন আপনি বলুন আপনার কি বলবার আছে?' মুখ কাঁচুমাচু করে

আলিআকবর বলল, 'রবু আসুক, তাঁর আসার পর তিনজনে পরামর্শ করে যা ভাল হয় তা করা যাবে।' বললাম, 'রবিশঙ্কর এখন কোলকাতায় আসছে না, সুতরাং পরামর্শ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি নিজের মতামত দিন।' আলিআকবর সব ব্যাপারেই নির্বিকার। রবিশঙ্কর যেমন বোঝাবে, তেমনি করবে। আমার কথা শুনে আলিআকবর চুপ করে রইল। বললাম, 'বুঝেছি আপনার বলার কিছুই নাই। সুতরাং আমি চললাম নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যা ভাল বুঝব তাই করব। যাক আপনি আমার জবাব দিলেন না। সব কথারই যে জবাব দিতেই হবে শাস্ত্রের অনুশাসনে নাই।' হঠাৎ আলিআকবর বলল, 'তুমি যদি 'সুরছন্দা'র এডিটরকে সব কথা বলো, তাহলে আমি বলব, তুমি বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলে, তুমিই সব করেছ।' এ কথা শুনে রাগ হোল। বললাম, 'বাহা বাহা। এই সময় আমি সেক্রেটারি আর অন্য সময় কেউ নই। বাবার শতবার্ষিকী হয়ে গেল, তখন আমি নেই। বাবার ফিচার ফিল্ম হয়ে গেলো সে সময় আমার কথা কারো মনে এলো না, আরো কত বলব? যা হোক আপনাদের, সকলকেই চেনা হয়ে গিয়েছে। আমি চললাম।' আলিআকবর আমার রাগ দেখে বললো, 'আরে বসো বসো। খেয়ে তারপর যেও।' বললাম, 'খাব অন্যদিন, তবে আজ নয়। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। যদিও আপনি প্রথমেই বলে দিয়েছেন বাড়ী যাওয়ার জন্য যেন আপনাকে না বলি, তবুও একটা কথা বলব। পরের কথায় নাচবেন না। নিজের বুদ্ধি দিয়ে একটু চিন্তা করবেন। বাবা এখনও বেঁচে আছেন। বাবার সম্মানের কথা ভেবেও চিন্তা করবেন। বাবা এই সব কথা শুনলে মনে কত বড় আঘাত পাবেন সে কথা কি একবারও চিন্তা করেছেন? যাক যা ভাল বুঝবেন করবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন জীবনে অনেক বেশী যে লাভ করে, তাঁকেই অনেক বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই বাড়ীতে এসে যা করছেন যদি ভাবেন কেউ জানে না, তাহলে আপনি অন্ধকারে আছেন।' এই কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে আলিআকবরকে কোন কথার সুযোগ না দিয়েই সোজা বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেখি, দিনের তৃতীয় প্রহর শুরু হয়ে গিয়েছে।

যেখানে দৃষ্টিভঙ্গীর এত তফাৎ সেখানে এঁদের বোঝান মানে উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটা। যুক্তি না মেনে যাঁরা চুপ করে থাকতে ভালবাসে, কর্তব্যের দরজা খোলা তাঁদের কাছে অসম্ভব। কি করব? আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট। কিন্তু না, আমাকে চুপ করে থাকলে চলবে না। 'সুরছন্দা'র এডিটরের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। চিরকালই প্রতিবাদ করে এসেছি। আমার মনে হয়, যে মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে না, সে মানুষ হিসাবে সম্পূর্ণ নয়। দুজনকেই দেখলাম। দুজনের মনোভাব বুঝলাম। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের পরীক্ষা হয়। আমার কাছে যা মহৎ বলে মনে হয়েছে আমাকে তাই করতে হবে, কেননা মহৎকে মহৎ বলে গ্রহণ না করলে, নিজেরই নীচতা প্রকাশ পায়। বাবার শতবার্ষিকী নিয়ে দুজনের কাছেই পরিস্থিতি বুঝে কখনও উগ্র এবং নম্র হতে হয়েছে। উচিত সময়ে উচিত ভূমিকা পালন করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ কখনও বক্তা হতে হবে, কখনও মৌন থাকতে হবে। কিন্তু আর মৌন থাকা চলে না।

সকালে ট্রেন থেকে নেমে একটু বিশ্রাম নিই নি। সোজা নাদুর বাড়িতে গিয়ে আবার স্নান

করলাম। মাথা টনটন করছে। নাদু আগেই আমাকে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছিল। নাদুর বাড়ী থেকে তিন মিনিটের রাস্তা। স্নান সেরে সোজা গিয়ে পৌঁছলাম। নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সমাদর করে ঘরে বসালেন। সবে খেয়ে উঠেছেন। মনে মনে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিয়েছি সব সত্য কথা বলব। আমার স্থির বিশ্বাস সত্য চিরকালই সত্য। গিলটি সোনা পরে যদি কেউ আভিজাত্য দেখায় স্বর্ণকার তা বুঝতে পারে। সেইরকম সত্য চিরকালই মিথ্যাকে ঘৃণা করে। যে সৎ সাংবাদিক বাবার শতবার্ষিকী নিয়ে এ ধরনের কথা লিখতে পারে, তাঁর কাছে সব সত্য কথা বললে কি সত্যের মূল্য তিনি দেবেন না? কোন ভনিতা না করেই বললাম, 'দেখুন আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, সুতরাং দাদার মতন।' আমার কথা শুনে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসলেন এবং কাশীর বেনারসী ভাষায় বললেন, 'ঠিক হও ভইয়া!' কাশীর হিন্দি (বেনারসী হিন্দি) অন্য প্রদেশের হিন্দি ভাষা থেকে স্বতন্ত্র কথোপকথনের সময়। 'ঠিক হও ভইয়া' শুনে খুব ভালো লাগলো। বললাম, 'আপনার ম্যাগাজিন পড়েছি। আপনার কাছে যা বলছি সে কথা আপনি চিন্তা করবেন। তারপর আপনার কাছে আমার একটা কথা নিবেদন করব।' আচমকা জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা একটা কথা বলুন তো? আপনার এই শতবার্ষিকী সমাচার লেখার পর আপনার কাছে কখনও কেউ কিছু বলে নি?' নীলরতনবাবু বললেন, 'রবিবাবুর ভগ্নপতি তরুণেন্দু ঘোষাল অর্থাৎ রবিশঙ্করের একমাত্র খুড়তুতো ভগিনী কনকদি, যিনি উদয়শঙ্করের ট্রুপ এ বহুদিন বিদেশে এবং স্বদেশে নৃত্য করেছেন, তাঁরই স্বামী একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'সঙ্গীত তীর্থ বারানসী' 'সুরছন্দায়' লিখছেন, তাঁর মধ্যে আপনারও সাক্ষাৎকার নেবেন। অবশ্য এই প্রবন্ধে কাশীর সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী লেখা হবে। তরুণেন্দু ঘোষাল অবশ্য শতবার্ষিকীর সম্পর্কে তর্কবিতর্ক চলাকালীন একদিন এসে বলেছিলেন, রবিশঙ্কর তাঁকে বলেছে, এ সব বিষয় না লিখতে। কিন্তু যদিও তরুণেন্দু ঘোষাল আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু বলেছিলাম সাংবাদিক হিসাবে যা বর্ত্তমানে লেখা চলছে তা রবিবাবুর কথায় বন্ধ করতে পারব না। যদিও আমার সঙ্গীত পত্রিকা খুব ছোট কিন্তু লোকের কথায় আমি কিছু লিখি না। আমার বিবেক যা বলে, অপ্রিয় হলেও, সত্য কথা লিখতে কুণ্ঠিত হই না। এঁর জন্য আমি বহু সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে অপ্রিয়।' কথাটা শুনে মনে হোল একেই বোধ হয় বলে নির্ভীক সাংবাদিক। নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে আমার প্রশ্ন করার উত্তর পেয়ে গেলাম।

আলিআকবর সরাসরি সব ব্যাপার জেনেও নির্বিকার অথচ রবিশঙ্কর সব স্বীকার করল কেন? আসলে রবিশঙ্কর অত্যন্ত চতুর। যে মুহূর্তে জানতে পেরেছে যে 'সুরছন্দার' সম্পাদক আমার ইন্টারভিউ নেবেন, সেইসময় কথায় কথায় তরুণেন্দু ঘোষালের মাধ্যমে সে বলেছে এই সব বিষয় না লিখতে, কারণ সম্পাদক নিশ্চয়ই আমাকে বলবেন। রবিশঙ্কর এ কথাও ভাল ভাবেই আমার মুখ দেখে বুঝেছে, আমি সম্পাদককে সব সত্য কথা বলে দেব, কেননা সে আমার স্বভাব জানে। এর জন্যই রবিশঙ্কর সত্য স্বীকার করেছে, নইলে সেও আলিআকবরের মত নির্বিকার হয়ে থাকত। আমার মনের শঙ্কা দূর হোল।

যে কথা বলছিলাম। 'সুরছন্দা' সম্পাদকের নানা কথা শুনে বুঝলাম, ভদ্রলোক খুব

স্পষ্টবক্তা, খুব ভাল লাগল। বললাম, 'প্রায় একবছর ধরে লিখছেন। এক জায়গায় লিখছেন বাবার এবং বাবার যত আত্মীয় কিংবা কোন শিষ্য যদি সত্য কথা লেখেন তাহলে কৃতজ্ঞ হবেন। যদি কেউ উত্তর না দেয় তাহলে শতবার্ষিকী ভুল-এর প্রমাণ ধারাবাহিক বার করবেন। তাই বাবার ছাত্র হিসাবে এঁর উত্তর দিতে এসেছি।' এই কথা বলে সব কথা বলে গেলাম। প্রথম মৈহারে যে দিন রবিশঙ্করকে বলেছিলাম, একদিন বাবা ইতিহাস হয়ে যাবেন। যে ভুল নিজের অজ্ঞাতে বাবা বলছেন, একদিন তাঁর জবাবদিহি আপনাদের দিতে হবে। এর পর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যখন আমার কথা একনাগাড়ে বলে গেলাম, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় চুপ করে শুনে গেলেন। দেখলাম এক ভদ্রমহিলা চা নিয়ে এবং বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছে কখন বুঝতেই পারি নি। পরিচয় করিয়ে দিলেন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে। নমস্কার বিনিময় হোল। বললাম, 'বৌদি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব। এখন একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলছি।'

মাথাটা যে সময় ভার হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় চা দিয়ে বিরাট উপকার করলেন। বৌদিও বুদ্ধিমতি দেখলাম। বললেন, 'আপনাকে দেখেই বুঝেছি খুব গুরু গম্ভীরমেজাজ-এ আছেন। সুতরাং কথা বলুন। কিন্তু যাবার আগে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবেন।' বৌদি চলে যাবার পর বললাম, 'সব তো শুনলেন। আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন, তবে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার সব কথা চিন্তা করে আর দয়া করে কিছু লিখবেন না।' দুই মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, 'চলুন কালই আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তরুণেন্দু ঘোষাল এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অর্থাৎ রবিশঙ্করের বোন কনকলতা যাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় নাই।' আমি বললাম, 'সে তো পরের কথা। আগে বলুন আমি যে প্রার্থনা আপনার কাছে করলাম সে বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিলেন?' নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় হেসে কাশীর বেনারসী ভাষায় যা বললেন, তার অর্থ, 'আমি জানতাম আমি স্পষ্টবক্তার জন্য অনেকের কাছেই অপ্রিয়, কিন্তু আপনাকে দেখে খুব অবাকই হয়েছি এই স্পষ্টবাদীতায়। যা শুনে আজ বুঝলাম আমারও দোসর আছে।' আরো বললেন, 'জীবনে খুব কষ্ট পাবেন আজকের এই সঙ্গীতের জগতে। স্পষ্টবক্তা বলে মনে শান্তি পাবেন। আপনি অতি মহান তাই আমাকে দাদা বলে ডেকেছেন। সুতরাং সব শোনার পর ভাই-এর কথা কি করে উপেক্ষা করবো। কথা দিচ্ছি আর লিখবো না।' এই কথা শুনে বললাম, 'দেখুন যে স্পষ্ট কথা বলে, সে স্পষ্ট কথাও শুনতেও পছন্দ করে। সুতরাং আপনার হাঁ সূচক জবাব শুনে আমার নিজের মনের জোর অনেক বেড়ে গেল।'

এবার বৌদিকে ডাকুন বৌদির সঙ্গে একটা কথা বলে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন। বৌদি এসেই বললেন, 'সপ্তাহে তিনদিন তরুণদা আসেন, আপনিও এখানে আসবেন। আপনার ইন্টারভিউ নেবেন।' এই কথা বলেই বললেন, 'চলুন আজ সন্ধ্যায় গিয়ে তরুণদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তিনিও আপনাকে দেখে খুশী হবেন।' বললাম, 'কাশী থেকে গত কাল যাত্রা করে আজ সকালে কোলকাতায় এসেছি এবং তারপর থেকে এক মিনিটও বিশ্রাম নিই নি। আমি চারদিন পরেই গৌহাটি যাব। সুতরাং আজ থাক।' বৌদি বললেন, 'এ কথার পর

আর আটকাবো না, তবে আগামী কাল সকালে তরুণদার সঙ্গে আলাপ করে সঙ্গে আলাপ করে এসে সোজা আমাদের বাড়ীতে আসবেন, এবং এখানে খাবার খেয়ে বিকেল অবধি গল্প করব। কাশীর সব গল্প শুনব। তরুণবাবু 'সঙ্গীত তীর্থ বারাণসী' সুরছন্দায় লিখছেন। কাশীতে গত বারে গিয়ে আপনার দেখা পান নি। আপনার বাড়ী তো আছেই। আপনার জীবনী এখানে বসেই বলবেন। সেই ফাঁকে আমরাও শুনবো।' কথার ফাঁকে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'কাল সকালে আসুন। তরুণদার বাড়ী যাব।' বললাম, 'সকালে আমার আলিআকবরের বাড়ীতে যেতে হবে। সুতরাং সকালে কি করে যাব তরুণ ঘোষালের কাছে।' আমার কথা শুনে বললেন, 'আলিআকবরের বাড়ীর কাছেই তরুণদার বাড়ী। আমি ডোভার লেনের মোড়ে ঠিক দশটার সময় অপেক্ষা করব।' সম্মতি জানালাম। মনটা এতক্ষণে হালকা লাগছে।

পরের দিন জুবেদা বেগমের বাড়ী গিয়ে বললাম, 'আমার দ্বারা আলিআকবরকে এ বাড়ীতে আনা সম্ভব হোল না, কেননা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বসিয়ে প্রথমেই বললেন তোমার কোন কথায় আমি না করিনি, কিন্তু বাড়ীতে যাবার জন্য আমাকে কিছু বোলো না। এই কথা শোনার পর অনুরোধ করে আমি নিজেকে ছোট করব কেন'? জুবেদা বেগম চুপ করে রইল। বললাম, 'কয়েক দিন যাক, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এই কথা বলবার জন্যই সকালে এসেছি। আমাকে এক জায়গায় উপস্থিত যেতে হবে। পরে আবার আসব।'

ডোভার লেনের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে যথাসময়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তরুণেন্দু ঘোষাল-এর কাছে গেলাম। বাড়ীর গলির ভিতরে যেতেই দেখি জগদীশ চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, 'এখানে কোথায়?' উত্তরে বললাম, 'যাচ্ছি আপনার ভাগ্নি এবং ভগ্নিপতির বাড়ী। ফেরার পথে কথা হবে।' একথা শুনে মুখের একটা পরিবর্তন দেখলাম। নিজের বোনের সঙ্গে কি বনিবনা নাই? তরুণ ঘোষাল আগেই আমার কথা শুনেছিলেন, তাই খুব সহজভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তরুণ ঘোষাল নদীয়া কলেজের প্রফেসার ছিলেন। শিক্ষিত লোক কিন্তু কনকলতাকে দেখলাম খুব স্পষ্টবক্তা। রবিশঙ্কর এবং জগু সম্বন্ধে প্রশংসা করলেও, বহু কথা বিরুদ্ধেও বললেন। বুঝলাম, কনকলতা সব খবরই রাখেন। বহু জিনিষ আমার জানা থাকলেও একটা কথা জানা ছিলো না। কনকলতার কাছে শুনে অবাক হলাম। বহুদিন আগে জুবেদা বেগমের কাছে একটা নাম শুনেছিলাম। অবাক হলাম। ভাবলাম পূর্বকল্পিত ভাবেই কি এই সব অঘটন ঘটিয়েছে প্রেমিক প্রবর। প্রেয়সীর রূপে, প্রেমিক প্রবরটির কাছে বিশ্বতুচ্ছ, স্বার্থ বাসনা তুচ্ছ। শুধু মাত্র মোহ। কল্পনা আর স্বপ্নে প্রেমিকটি প্রেয়সীর পদবন্দনা করতে রাজী। পুরুষের ধ্যান জ্ঞান প্রেমের অপূর্ব রহস্যময়তায় যে মূর্তিময়ী, তাঁর নাম প্রেয়সী। প্রেমিক পুরুষ জানে, ভালবাসার মধ্যেই ভরা থাকে সবচেয়ে বেশী ভুল। তবে সে কিছুটা সংশয় আর কিছুটা আবেগ আনয়ন করে। যে পুরুষটি প্রেমিকার জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারে, ঘরে স্ত্রীর বিষয়ে কিন্তু তাঁর সেই আগ্রহ অধিকাংশ সময় থাকে না। প্রেয়সীর হাতে তুলে দেবার জন্য উপহারের কথা সে চিন্তা করে। গৃহিনীর জন্য সেই উপহার হাতে নিয়ে কখনোই বাড়ী

ঢোকে না। যতই প্রেয়সী হোক, শ্রেয়সীর কাছে যে তুচ্ছ। যে হেতু শ্রেয়সীর কাছে প্রেমিক প্রবর নিজেকে ছোট ভাবে, সেইজন্য প্রেয়সীর প্রশংসায় নিজেকে বড় মনে করে গর্ব বোধ করে। প্রেয়সী সুকৌশলে নিজেকে প্রেমিকের কাছে আনন্দের সামগ্রী করে রাখে, কিন্তু শ্রেয়সীর পক্ষে তা কি সম্ভব? শ্রেয়সী সংসারের মঙ্গল চিন্তায়, স্বামীর অনেক চাহিদাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকচ করে দেয়? এঁর জন্যই অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আমার মনে নানা কথা উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। কনকলতা দুঃখ করে বললেন, 'আমার বাড়ীর কাছে, রবু জগুর কাছে নিজের মতলবের জন্য আসে, কিন্তু নাম এবং অর্থ হয়েছে বলে তাঁর একমাত্র বোনের সঙ্গে দেখা করবার সময় হয় না। যাই হোক তোমার মত একটা ভাই পেয়ে খুব খুশী হলাম।' পারিবারিক অনেক কথা হোল তারপর দুপুর হয়ে গিয়েছে বলে জোর করে আমাদের খাওয়ালেন। তরুণ ঘোষাল যে বই 'সঙ্গীততীর্থ বারানসী' ধারাবাহিক লিখছেন, তার জন্য আমার সঙ্গে তারিখ এবং সময় স্থির হোল। হঠাৎ কনকলতা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোলকাতায় কোথায় আছো এবং খাওয়া দাওয়া কোথায় করো?' বললাম, 'কালীঘাটে থাকি এবং হোটেলে খাই।' কনকলতা বললেন, 'তোমার জামাইবাবুর বয়স হয়েছে। তুমি যদি আমার বাড়ী চলে আসো তাহলে বই এর জন্য সাক্ষাৎকারও হবে এবং সেই সঙ্গে বোনের হাতে দুটো ডাল ভাত খাবে।' কনকলতার আন্তরিকতায় রাজী হতে হোল। নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললাম, 'আজ তো আপনার বাড়ী খাবার কথা ছিলো, বাড়ীতে বলবেন আর একদিন গিয়ে খাব এবং গল্প করব গৌহাটি যাবার আগের দিন।'

কনকলতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে এলাম। পরের দিন তরুণ ঘোষালের কথামত তাঁর বাড়ী গেলাম। বাড়ী যাবার পথেই জগদীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জগদীশ নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি, ঘরভর্ত্তি নানা ভঙ্গিমায় তাঁর অন্নদাতার ফটো টাঙানো রয়েছে।

জগদীশ বলল, 'গতকাল কেন গিয়েছিলে তরুণদার কাছে?' কারণ বলাতে জিজ্ঞেস করল, 'কনকদি আমার সম্বন্ধে কিছু বলে নি?' বললাম, 'আপনি যা তাই বলেছেন।' কথায় কথায় জগদীশ বলল, 'বছরের শেষে একটা ডুয়েট ঠিক করেছি রবু এবং আলিআকবরের।' এই কথা বলে সুভ্যেনারের প্রচ্ছদপটের একটা রাফ স্কেচ দেখাল। কোন একটা সংস্থার নাম দিয়ে লিখেছে, প্রেজেন্টস পণ্ডিত রবিশঙ্কর এণ্ড উস্তাদ আলিআকবর খাঁ ডুয়েট। তবলা একমপ্যানিড বাই আল্লারক্খা। প্রচ্ছদপট দেখে বললাম, 'একটা বিরাট ভুল করেছেন?' জগদীশ বলল, 'কেন কেন?' বললাম, 'আলিআকবরের নামটা আগে দেওয়া উচিত, কেননা সে গুরুপুত্র।' জগদীশ বলল, 'তাতে কি হয়েছে? এই সঙ্গীতের পরিচালনা তো আসলে রবুই করছে, তাই তাঁর নাম আগে থাকলে ক্ষতি কি?' বললাম, 'আপনি কোলকাতায় রবিশঙ্করের ইমপ্রেসারিও, কিন্তু সঙ্গীতের কিছুই বোঝেন না বলে এ-কথা বলছেন।' রবিশঙ্করকে দেখাবেন এবং বলবেন আমি এই কথা বলেছি। রবিশঙ্কর বুঝতে পারবে কিন্তু এ ব্যাপরটা আপনার বোধগম্যের বাইরে।'

এই একটা প্রসঙ্গের জের যে রবিশঙ্করের সঙ্গে আমার সামনাসামনি আলোচনা হবে,

তখন কি জানতাম? তরুণ ঘোষালের বাড়ী গেলাম। বাড়ী গিয়ে কিছুক্ষণ কথার পরই তরুণ ঘোষাল আমার ছোটবেলা থেকে বর্ত্তমান পর্যন্ত শুনল। পরের পর তিনদিন গিয়ে শিল্পীজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত শেষ হোল। সত্যিই 'সুরছন্দার' কয়েকটি সংখ্যায় তরুণ ঘোষালের লেখা 'সঙ্গীততীর্থ বারানসী' প্রবন্ধটি খুব সুলিখিত হয়ে-ছিলো।

কয়েকদিন পরই গৌহাটি যাব। ইতিমধ্যে কোলকাতায় এসেছি শুনে, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ণধার আমায় ডেকে বললেন, 'আগামী বছরের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে কোলকাতায় বাজাতে হবে।' সম্মতি জানালাম। নির্দিষ্ট সময়ে গৌহাটি পৌঁছলাম। গৌহাটি গিয়ে শুনলাম, তিনমাস আগে রবিশঙ্কর কানাই দত্তকে নিয়ে বাজাতে গিয়েছিল। এই সম্মেলনে আমি যাই নি কেননা অগ্রিম টাকা পাই নি বলে। দুই দিন রবিশঙ্করের বাজনা ছিল। দর্শকদের ভীড় ছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হবার পর কর্ণধারদের দেখা পায় নি। পরে, আমার দাদা হীরেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা করে। আমার দাদা পুলিশের এস. পি. কে দিয়ে রবিশঙ্করকে নাম মাত্র টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমি আগেই রবিশঙ্করকে বলেছিলাম, 'এই সম্মেলনের কর্ণধার বিশ্বস্ত নয়।' তা সত্ত্বেও রবিশঙ্কর গিয়েছিলো। রবিশঙ্করের জীবনে এ ধরনের শিক্ষা কমই হয়েছে। যাক, গৌহাটিতে গিয়ে রবীন্দ্রালয়ে আমার বাজনা হোল। গতবারে গৌহাটি যখন এসেছিলাম, সেই সময় যে সরোদ শিখতে চেয়েছিল, সে আমার অনুষ্ঠানের পর দেখা করে বললো, 'কোলকাতা থেকে সরোদ কিনে এনেছি।' সেতারের ছাত্রটিকেও দেখলাম। দুজনকে বললাম, 'শিলং থেকে বাজিয়ে আসবার পর শেখাব।' আসামে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচলন খুবই কম তবুও বহু বাঙ্গালী এবং অসমীয়া শ্রোতার সংখ্যা যথেষ্ট আছে। তবে গৌহাটির শ্রোতা খুবই ভালো।

আসলে সম্মেলন করবার যোগ্য লোকের অভাব। গৌহাটিতে এসে দেখলাম ভূপেন হাজারিকার আধুনিক সঙ্গীতে খুব খ্যাতি আছে। সে বাংলা আধুনিক সঙ্গীতের সুরে অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করে গায়। তারপর সেই গানটিই আবার ইংরেজী অনুবাদ করে গায়। এটাকে ঠিক সঙ্গীত বলা যায় না। বলা যায় সঙ্গীতের উপহাস। এঁর ফলে অসমীয়রা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনবার বা শিখবার সুযোগ পায় না। তাই দুধের বদলে ঘোল খেয়েই তাঁদের সঙ্গীতের তৃষ্ণা মেটাতে হয়। আর ভূপেন হাজারিকার গানের আসরে মানুষের ভীড়ে ভর্ত্তি হয়ে যায়।

এবারে শিলং-এর অভিজ্ঞতা জানাই, বিহু উৎসবে পয়লা বৈশাখে যা হয়েছিল। এটা এ জন্যই লিখছি, কারণ ভবিষ্যৎ-এ যাঁরা বিহু উৎসবে বা অন্য কোন সঙ্গীত সম্মেলনে গাইতে, বাজাতে যাবে, এটা জেনে রাখলে তাঁদের উপকার হবে। সম্মেলন উদ্যোক্তাদের অনুরোধে কাশীর দুইজন নৃত্য শিল্পী এবং একজন তবলা বাদকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। নৃত্য শিল্পী দুজনেই হোল বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সিতারার ভাগ্নি এবং ভাগ্নে। আর কাশীর সারদা সহায়কে ঠিক করে দিয়েছিলাম সঙ্গত করবার জন্য। সারদা সহায়ককে আমার সঙ্গে বাজাবার জন্যই ঠিক করেছিলাম। শিলং-এ এম. পিদের অতিথি ভবনে আমাদের রাখা হোল। সন্ধ্যেবেলায় যখন প্রোগ্রাম-এ গেলাম, দূর থেকে দেখলাম, বেশ বড় ময়দান লোকে লোকারণ্য। বহু দূর

থেকে শুনলাম, লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হচ্ছে, উত্তর আসামের একটা অন্ধ ছেলের একক তবলা বাদন হবে। ঘোষণা শেষ হবার পর যেই তবলা বাজনা শুরু হোল, সব শ্রোতা এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'নো মোর, নো মোর' বলে। ঘাবড়ে গেলাম, এ কি জায়গায় এসে পৌঁছেছি। হাথরসের কথা মনে হোল। এর পর যাঁরাই বসছে তাঁদেরই উঠিয়ে দিচ্ছে শ্রোতারা। শুনলাম এখনও তিনটে প্রোগ্রাম হবে। প্রথম রাম ও অন্নপূর্ণার যুগল নৃত্য। তবলায় সহযোগীতা করবে সারদা সহায়। তারপর ভূপেন হাজারিকার গান, এবং শেষ হবে আমার বাজনা দিয়ে। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন প্রোগ্রামের কর্ণধার। ভূপেন হাজারিকাকে বললাম, 'এখানে কি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচলন নাই?' ভূপেন হাজারিকা বলল, 'আসলে গৌহাটি ছাড়া, আসামের অন্য কোথাও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চলন নাই। তবে ঘাবড়াবেন না। সরোদ বাজনার আওয়াজ পছন্দ করবে। ' নাচ শুরু হোল, পনেরো মিনিটের মধ্যেই নাচকেও প্রতিবাদের চিৎকার দিয়ে বন্ধ করার উপক্রম। সেই প্রতিবাদ শোনার পর শিল্পী দুজন তাড়াহুড়ো করে দ্রুত লয়ে সওয়াল জবাব করেই নাচ শেষ করল। নৃত্য একটা এমন জিনিষ যে মূর্খশ্রোতারা খুব বেশী পছন্দ করে। অথচ নাচ যখন লোকে নিল না, তখন আমার কি হবে ভেবে ঘাবড়ালাম। এর পর ভূপেন হাজারিকার বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠোঁট দিয়ে সবাই সিটি বাজাতে লাগল। আমি ঘাবড়ালাম। শুনেছি, আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'ভূপেন হাজারিকা' নাইট হয়। তাঁকেও লোকে সিটি দিচ্ছে। ঠিক ব্যাপারটা বোধগম্য হোল না। প্রায় এক ঘণ্টা গানের তর্জমা করে, বাংলা, এবং ইংরেজী মূল গান অসমীয়া ভাষায় গাইল। ঠোঁটের সিটির শেষ নাই। আমাদের উত্তর ভারতে মুখে সিটি দেওয়া মানেই বন্ধ কর। গানের শেষে ভূপেন হাজারিকার কাছে জানতে পারলাম, মুখের সিটি দেওয়া মানে তারিফ। এর পর আমার পালা। হঠাৎ ভূপেন হাজারিকা আমার সম্বন্ধে আসামী ভাষায় একটা পূর্ব ঘোষণা করে বললেন, 'আপনারা মন দিয়ে এই সরোদ বাজনাটি শুনুন।' ভাষা না বুঝলেও আসামী ভাষা এবং বাংলার সঙ্গে হরপে এবং কথাতেও খুব মিল আছে। ভূপেন হাজারিকা আমার পাশেই বসল। আমার সঙ্গে তবলায় বসল সারদা সহায়। হাথরসে যেমন বাজিয়েছিলাম, এখানেও ঠিক তেমনি রাগের ছেড় বাজিয়েই জোড় মধ্যে লয়ে বাজিয়ে ঝালা দিয়ে শেষ করলাম। এর মধ্যেই তিন চারবার মুখের সিটি আওয়াজ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে গৎ শুরু করেই, তবলার সঙ্গে সাথ সঙ্গত শুরু হোল। বাবার আশীর্বাদে 'ওয়ানস মোরও' হোল। প্রায় সওয়া ঘণ্টা বাজালাম। গেস্ট হাউসে ফিরে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর শুনলাম, নাগাল্যাণ্ডে চীফ সেক্রেটারি মিস্টার শর্মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বললেন, 'কোহিমাতে দশদিন পর একটা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে, তাতে ভূপেন হাজারিকা ছাড়া বিবিধ অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে আপনাকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করছি।' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম কেননা কোহিমা শহর দেখবার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। জানা ছিল, এমনি যাঁরা কোহিমা শহর দেখতে যায়, গভর্ণমেন্টের গাড়ী সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে যাত্রীদের নিয়ে যায়। এ কথা চিফ সেক্রেটাইরকে বলায় হেসে

বললেন, 'আপনারা ভি.আই.পি. গেস্ট হয়ে যাবেন সুতরাং চিন্তার কারণ নাই।' শিলং এ একদিন থেকে গৌহাটি চলে এলাম। ডান্স পার্টি এবং তবলা বাদক কাশী চলে গেল। ইতিমধ্যে গৌহাটি রেডিওতে বাজালাম। সঙ্গত করল আসামী শিল্পী কেশব শাঙ্খকুটি।

আসামের বরডার ডিমাপুর গেস্ট হাউসে রাত কাটিয়ে, সকালে কোহিমা গেলাম। কোহিমাতে বিবিধ অনুষ্ঠানের শেষ হোল আমার সরোদ বাদন। যাঁদের ভ্রমণের নেশা আছে তাঁদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন নিশ্চয়ই একবার কোহিমা যান। কোহিমা না গেলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না, কি ভাবে সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে ডিমাপুর থেকে কোহিমা পর্যন্ত যানবাহন যায়। উনিশশো চৌষট্টি সালে এ আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। এর সাতবছর পরেও একবার গিয়েছিলাম। সে সময়েও দেখেছি সেই ব্যবস্থাই তখনও চালু আছে। জানি না বর্ত্তমানে সে রকম ব্যবস্থা চালু আছে কি না। যাক কোহিমা থেকে গৌহাটি ফিরে কয়েকদিন সুবোধ সরকার এবং একটা অসমীয়া সেতারের ছাত্র নবীন বোরাকে শিক্ষা দিয়ে কোলকাতায় চলে এলাম।

কোলকাতায় এসে, আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে জুবেদা বেগমের কাছে শুনলাম, এখনও আলিআকবর বাড়ীতে আসে নি। কোলকাতায় এসে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে কাশী যাওয়ার আগের দিন, আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'সুরছন্দা পত্রিকাতে বাবার শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনা হবে না।' না হবার কারণ বিস্তার-পূর্বক বললাম। প্রসঙ্গ ইতি করে বললাম, 'আপনার পারিবারিক জীবন নিয়ে কোলকাতায় কি রকম গুঞ্জন এবং আলোচনা চলছে তা কি আপনি জানেন? আসলে আপনি বিখ্যাত মানুষ যদি না হতেন, তাহলে এ সব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। যে হেতু বিখ্যাত লোকদের নিন্দা বেশী মুখরোচক, এঁর জন্যই সকলে এত নিন্দা ছড়াচ্ছে। আপনি আপনার নিজের বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা করে নিন। যতদিন তা না করেন, ততদিন এই সব মুখরোচক আলোচনা চলতে থাকবে। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।' আলিআকবর চুপ করে আমার কথা শুনল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে আলিআকবর আমার খবরাখবর নিলো। এমন নির্বিকার চরিত্র সত্যই বিরল। এঁর পরদিনই কাশীযাত্রা করবার আগে আমার ছাত্র দীপক চক্রবর্তী বলল, 'ছুটি নিয়ে কয়েকদিনের জন্য কাশীতে গিয়ে শিক্ষা করতে চাই।' কাশীতে আসবার সম্মতি দিয়ে কাশী যাত্রা করলাম।

কাশী আসবার কিছুদিন পরই দীপক চক্রবর্তী কোলকাতা থেকে এল শিখতে। ছেলেটি কোলকাতায় যাবার আগে অনুরোধ করে বলল, 'এবারে কোলকাতায় যখন যাবেন তখন আমার বাড়ীতে উঠবেন। আমার বাড়ীতে উঠলে আপনার বাজনা শুনতে পাবো এবং শিখবার সুযোগ পাব।' দীপকের আন্তরিক অনুরোধে আপত্তি করতে পারলাম না। বললাম, 'এবারে বছরের শেষে তানসেনে যখন বাজাতে যাব, সেই সময় তোমার বাড়িতেই উঠব।'

৫২

বছর শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। কাশীতে শীত জাঁকিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোলকাতায় তানসেনে বাজাতে গিয়ে, শীতকাল মনেই হোল না। যদিও কোলকাতাবাসীর জন্য ভয়ঙ্কর

শীত। এবারে দীপকের বাড়ীতে গিয়েই উঠলাম। দেখলাম বাড়ীর সকলেই সঙ্গীতপ্রেমী। বাড়ীতে কেবল এক ভাই, বাবা এবং একটা ছোট বোন আছে। সব বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জামাই মেয়েরা প্রায় বাবাকে দেখতে আসে। সবচেয়ে বড় কথা, দীপকের বাবা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমী। সঙ্গীতকে ভালবাসেন বলে আমাকেও এই বৃদ্ধ বয়সে যে সম্মান দেন উস্তাদজী বলে, তাঁর ফলে নিজেকে সঙ্কুচিত অনুভব করি।

তানসেনে বাজাবার আগে আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করলাম। বিদেশ থেকে কিছুদিন হোল এসেছে। প্রায় আটবছর হতে চললো, আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর দুজনেই বেশীর ভাগ সময়ে বিদেশেই কাটায়। বিদেশে দুজনেই শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে। শীতের মরশুমে ভারতে এসে কয়েকটা মাস কাটিয়ে, আবার বিদেশে পাড়ি দেয়। শুনলাম, রবিশঙ্কর এসেছে কোলকাতায়। আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করে গেলাম তরুণেন্দু ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ী যাবার পথেই দেখা হয়ে গেল জগদীশ চ্যাটার্জির সঙ্গে। দেখলাম বাড়ীর সামনেই ছোট জায়গায় ইলেকট্রিকের দোকান খুলেছে। জগদীশ অভ্যর্থনা করে বলল, 'এবারে ডুয়েট হবে রবু এবং আলিআকবরের।' সুভ্যেনারটা দেখাল। বলল, 'রবু এসে উঠেছে ডি.এস.এম.-এর গেস্ট হাউসে। একটু পরেই যাবো রবুর কাছে। চলো আমার সঙ্গে দেখা করবে রবুর সঙ্গে।' বললাম, 'ঠিক আছে। আপনার বোন এবং ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করে তারপর যাব।' কি জানি কেন, বোনের নাম শুনলেই মুখটা কেমন হয়ে যায়। জগদীশ বোনের নাম শুনে বলল, 'কনকদি কোলকাতা থেকে দূরে বাড়ি কিনেছে, সেইখানে আমিও একটা বাড়ী করেছি। বাড়ীর সামনে পুকুর আছে। একদিন চলো আমার সঙ্গে, দেখবে নির্জন জায়গায় প্রাকৃতিক শোভা তোমায় মুগ্ধ করবে। রবুও মাঝে মাঝে যায়।' বুঝলাম, রবিশঙ্করের পয়সায় সব করেছে। যতই হোক রবিশঙ্করের ইমপ্রেসারিও হলেও জগু খুব প্রাণখোলা। বিদেশের ঘটনার উল্লেখ করে বললো, 'বিদেশের ছেলে মেয়েরা ভারতীয় সঙ্গীতের জন্য পাগল। বিদেশের নীতি হোল 'গিভ এণ্ড টেক'। এক ঘণ্টা ঘড়ি দেখে শিখবে, আর নগদ ডলার দেবে। দুঃখ হয়, এত ভাল, একটা শিক্ষাকেন্দ্র রবু খুলেছিলো কিন্তু চললো না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন চললো না?' জগু চোখটিপে বললো, 'চলবে কি করে? নিজের ছাত্রদের নিয়ে ক্লাস চালাচ্ছিল। যতই হোক ভারতীয় মনোপ্রবৃত্তি তো। সাদা চেহারা দেখে নোলায় জল পড়ে। খিটকেল করার ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তাঁর জন্য ছাত্রের কপাল পুড়ল। ছাত্রটি বম্বে ফিরে এসেছে। যদিও রবু এই সব কিছু মনে করে না, তাই সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবারে ঠিক করেছি, কোলকাতার কনফারেন্সে রবুর জন্য বেশী বুকিং নেবো না। মস্ত বড় স্টেডিয়ামে, কম টাকায় টিকিট করে নিজেই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করব। অবশ্য তাঁর এখন দেরী আছে। মনে এখন একটা কল্পনা করেছি, সন্ধ্যার সময় প্রেস কনফারেন্স হবে। তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। জান তো খবরের কাগজ হোল প্যারালাল গভর্ণমেন্ট। এই যে ডুয়েট হবে তার জন্য প্রেসের লোকেদের না জানালে, পাবলিসিটি হবে কি করে? পাবলিসিটি করতে খবরের কাগজের মত আর কি বস্তু আছে পৃথিবীতে? একা আমি কত দিকে সামলাবো বলো তো?'

কথাটা শুনে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত যে পার্টি দেন তাঁর জন্য তো অনেক খরচা হয়।' জগু হেসে বলল, 'এটা তো ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্ট না করলে প্রফিট হয়? যে কোন ব্যবসার মতো এটাও তো একটা ব্যবসা।' কথাটা শুনে নূতন এক অভিজ্ঞতা হোল। বাবার কাছে কখনও তো এ ধরনের কথা শুনি নি। এ ছাড়া মৈহারে থাকাকালীন ইমপ্রেসারিও দিয়ে যে পাবলিসিটি হয়, সে কথা তো পণ্ডিতের কাছে শুনি নি। মৈহার ছাড়ার পর এক নূতন অভিজ্ঞতা হোল।

জগুর কাছে, এক নাগাড়ে এই সব কথা শুনে বললাম, 'আপনার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে শীঘ্রই আসছি। তারপর আপনার সঙ্গে রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। তরুণেন্দু ঘোষালের বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখে কনকলতা ঠিক নিজের ভাই এর মত বললো, 'দিদির কথা মনে পড়েছে তা হলে?' সামনে টেবিলের উপর দেখলাম ডুয়েটপ্রোগ্রামের কার্ড। কনকলতা বললেন, 'দেখছ কাণ্ড। রবু আমার বাড়ীর দরজায় জগুর কাছে আসে, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করে না। জগু কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। বয়ে গেছে আমার যেতে? রবু এসে যদি কার্ড দিতো তাহলে যেতাম। সত্যই কষ্ট হয় রবুর জন্য। সকলে তেলিয়ে নিজের আখের গুছোচ্ছে। আমি তো তেলাই না। মুখের উপর কট কট কথা বলি। উচিত কথা বললে পরে জ্বলবে লোকের হাড়। যাক ছাড় এ সব কথা। তুমি এবার কোলকাতায় একবছরে তিনবার বাজাতে এসেছ। খবর পেয়েছিলাম, তিন চার মাস আগে শ্রীরামপুরের টাউন হলে একক ভাবে তোমার গুণীসম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিলো? শুনে খুব আনন্দ পেয়েছি ভাই।' একথা শুনে বললাম, 'আমার কিসের সম্বর্দ্ধনা? এসব বাবার কৃপা।' এঁর পর কিছুক্ষণ গল্প করে, জগুর সঙ্গে রবিশঙ্করের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি সামনেই ডুয়েট বাজাবার সুভ্যেনারটা রয়েছে। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই বলল, 'আরে এসো এসো। শুনলাম তানসেনে তো তোমার বাজনা আছে?' জানালাম কোন তারিখে বাজনা আছে। রবিশঙ্কর কথা ঘুরিয়ে নিজের থেকেই বললো, 'আরে শোনো যতীন, শুনলাম তুমি রেগে গিয়েছে জগুর উপর। ঠিকই রাগ করেছ। এই সব মূর্খের জন্যই আমার বদনাম হয়। সত্যই তো আলু-ভাই এর নাম আগে দেওয়া উচিত, কেননা সে আমার গুরুপুত্র। আলুভাই দেখলে কি বলবে বলো তো?' এ কথা শুনে বললাম, 'শুনুন, লাগান ভাঙ্গান আমার স্বভাব নয়। জগুর সঙ্গে যখন এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছিলাম, তারপর আলিআকবরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি কিছুই আলিআকবরকে বলি নি। সবাই পরের মন পাবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু আমার স্বভাব যাঁকে বলার তাঁকেই বলা। খারাপ লেগেছিলো তাই জগুকে বলেছিলাম।' রবিশঙ্কর বলল, 'আমি দেখার আগেই সুভ্যেনার হয়ে গিয়েছে। আগে এটা দেখবার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আমি আলুভাই-এর নাম আগে রাখতাম। তুমি জান না, আমি আলুভাইকে কত রেসপেক্ট করি। যদি তুমি বলো তাহলে স্টেজে প্রকাশ্যে তাঁকে প্রণাম করে বাজনা শুরু করতে পারি।' এ কথা শুনে আমার হাসি পেল। কত বড় অভিনেতা। বললাম, 'যা অভিরুচি তাই করবেন, আমার যা উপযুক্ত মনে হয়েছে তাই বলেছি।' রবিশঙ্করের কথাটা যে অভিনয় ছিল, তাঁর প্রমাণ সেই যে শুরু হয়েছিলো নিজের নাম আগে

রাখা, আজও রেডিও বা ডুয়েট প্রোগ্রামে রবিশঙ্করের নামই আগে থাকে এবং পরে আলিআকবরের নাম। বুঝলাম, যে কথা জগুর সঙ্গে প্রায় চার পাঁচ মাস আগে হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গের জের চলল বছরের শেষে। কিছুক্ষণ কথা বলে, নিজের বাড়ী চলে এলাম।

এবারেও বছরের শেষে তানসেনে বাজালাম। তানসেনে বাজিয়ে উঠবার পরেই সেক্রেটারি শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়।' মৈহারে থাকাকালীন বাবার কাছে সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা বহু শুনেছি। সেক্রেটারির কথা শুনে আনন্দ হোল। গিয়ে প্রণাম করলাম। আমাকে দেখেই বললেন, 'আপনার বাজনা শুনলাম। খুব ভাল লাগলো। একদিন আমার গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীতে আসুন।' আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে ঠিকানা জেনে নিয়ে পরের দিন তাঁর বাড়ী গেলাম। বহু কথা হোল। কথার শেষে বললেন, 'প্রত্যেক মাসের শেষে, আমার এখানে একটা ঘরোয়া জলসার ব্যবস্থা করি। যতবার অধিবেশন হয়, কয়েকমাস ততবারই একটা রাগই পরিবেশন হয়। পরের বারে আবার যখন অধিবেশন বসবে তখন হয়ত পূরবী রাগে সকলেই গাইবে এবং বাজাবে। তাঁর পরবর্তী কয়েকমাস পরে অধিবেশনে হয়ত পরিবেশিত হবে মারওয়া রাগ। আমার এখানে মাসিক অধিবেশনের এই নিয়ম করেছি।' আমার সঙ্গে যখন দেখা হোল তখন তাঁদের সেই অধিবেশন শেষ হয়ে গিয়েছে। বললেন, 'যদি আগামী নূতন বছরের শেষে থাকেন তাহলে আপনাকেও সেই অধিবেশনে বাজাবার নিমন্ত্রণ করব। আগামী জানুয়ারীর শেষে যে অধিবেশন বসবে তাতে আপনাকে পূরবী রাগ বাজাতে হবে।' সব শুনে বললাম, 'প্রথমতঃ আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না।' আমার কথা শুনে হেসে বললেন, ঠিক আছে তুমিই বলব।' বললাম, 'চারদিন পরে বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্সে বাজিয়েই কাশী চলে যাবো। সুতরাং এঁর পরের বছর যখন কোলকাতায় আসব, সেই সময় আগে থেকে জানিয়ে দেব এবং নিশ্চয়ই বাজাব।' কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই আমার শেষ দেখা। কাশীতে ফিরে আসবার পরই তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনি। অবশ্য তাঁর মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর অবর্তমানে, সেই ঘরে কথা রাখবার জন্য বাজিয়েছিলাম। তখন সেই ঘরে তাঁর ছেলে বিজয় চক্রবর্তী ছিলেন।

যথাসময়ে বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্সে বাজাবার পর আমার কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়েছিলো। এই প্রথম আমার সামনে বসে বাজনা শুনলেন বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরি। বাজিয়েছিলাম ললিতাগৌরি। উৎসবের অন্যতম একজন কর্ণধার আমাকে বললেন, 'আপনাকে দেখা করবার জন্য ডাকছেন বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরি।' মৈহারে থাকাকালীন বীরেন্দ্রকিশোরের লিখিত সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু রচনা আমার পড়া ছিলো। তা ছাড়া বাবার কাছে বহু কথা শুনেছি। গিয়েই প্রণাম করলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'খুব খুশী হয়েছি তোমার বাজনা শুনে। এ সব রাগ আজকাল শোনা যায় না। আশীর্বাদ করি উস্তাদের নাম রাখো।' এমন শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের আশীর্বাদ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তখন কি জানতাম, দশবছর পরে নিজের প্রয়োজনে তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে? কোলকাতায় বাজিয়ে, কাশীতে নূতন বছরের প্রথম দিনে একটা

অনুষ্ঠান ছিল বলে কাশীতে এসে বাজাবার পরদিনই, আবার কোলকাতার কাছে শ্যামনগরে বাজাবার জন্য কোলকাতায় গেলাম। কোলকাতায় গিয়ে আমার ছাত্র দীপকের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। আলিআকবরের বাড়ী গিয়ে দেখলাম, নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। শ্যামনগরে বাজাতে গেলাম। কেরামৎ খাঁ সুন্দর সঙ্গত করলেন। কোলকাতায় এক সপ্তাহ থেকে দীপক এবং বীরেনকে শিখিয়ে কাশীতে চলে এলাম।

কাশীতে আসার কিছুদিন পর, কানপুরের কনকরড নামে একটা সঙ্গীত সংস্থা আমার এবং কিষণের খুব ভাল ভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করল। সেখানে বাজাবার পরই জে, কে ইনডাসট্রিস এর কর্ণধারের বাড়ীতেও বাজনা হোল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বৃহস্পতির সঙ্গে দেখা হোল। পাঁচ বছর আগে হাথরসে বৃহস্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছিল।

বৃহস্পতির অনুরোধে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাজালাম। তবলায় সহযোগিতা করল কিষণ। বৃহস্পতির বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম ঘরে একটা বড় ছবি টাঙ্গান রয়েছে, যাঁর মধ্যে রবিশঙ্কর বম্বেতে সম্বর্দ্ধনা দিয়ে বৃহস্পতিকে গলায় মালা পরাচ্ছে। ছবিটা দেখিয়ে বৃহস্পতি বলল, 'রবিশঙ্করের অনুরোধে বম্বে গিয়ে সঙ্গীতের থিওরির উপর একটা ভাষণ দিয়েছিলাম। সেই সময় রবিশঙ্কর আমাকে সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিলো।' বাজাবার আগেই বৃহস্পতি বলল, 'রামপুরের উজির খানি শুনব।' কি ভেবে বলেছিলেন জানি না, উজির খানি গৎ বাজালাম। বাজাবার পর কাশীতে চলে এলাম।

কিছুদিন পর কোলকাতায় বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। এই বঙ্গ সংস্কৃতিতে আগেও বাজিয়েছি। এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের একটা ঐতিহ্য আছে। সারারাত প্রোগ্রাম হবে। এই প্রথম বুঝলাম, দলবাজি কাকে বলে। আমাকে প্রথমে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল বাজাবার জন্য। তারপর কর্মকর্তা সময় কমিয়ে দিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে বললেন। আমি সময় দেখেই শেষ করলাম। কিন্তু জনতার অনুরোধে আমি সর্ব সাকুল্যে দেড় ঘণ্টা বাজালাম। বহু লোকেরা অন্যকে বলেছে, যাঁদের কাছে আমি শুনেছি যে আমার বাজনা খুবই ভাল হয়েছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। আমার নিজের লোকেরাই চক্রান্ত করে বহু প্রোগ্রাম এর পর থেকে নাকচ করতে লাগল। তাই বলে কি আমার বাজনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে? আমি একে নিয়তি বলেই মনকে প্রবোধ দিয়েছি। মনে পড়ে কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'ও লিবার্টি, হোয়াট থিংকস আর ডান্ ইন দাই নেম।' এখন বুঝতে পারছি সঙ্গীতের কি রকম পার্টি বাজি। সকলেরই এক একটা দল আছে। কেবল আমিই একলা। আমি কোন দলে নাই। দলবাজিতে কখনও বিশ্বাস করি নি এবং এখনও বিশ্বাস করি না। তবে বিশ্বাস করি, একটা বড় পার্টির মধ্যে থাকলে অনেককে খুব প্রোগ্রাম পেতে দেখেছি। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভব হয় নি। বাবার কথাই আমার কাছে বেদবাক্য। বাবা বলতেন, 'বাজনাই হোল পার্টি। নিজের বাজনাকে পূজা করো, তেল লাগাও।' বাবার এই নীতি স্মরণ করে সান্ত্বনা পেয়েছি। অযথা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজ হাসিল যদি আমি করতে পারতাম তা হলে আজ আমি পৃথিবীর ব্যস্ততম শিল্পী হতে পারতাম, কিন্তু তা আমি পারি নি, কেননা সঙ্গীতকে ট্রেড হিসেবে নিতে বিবেকে বেঁধেছে। আমি প্রাচীনপন্থী, তাই এই যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলাম না।

যাক যা বলছিলাম। বঙ্গসংস্কৃতিতে বাজাবার তিন মাস পরে সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। আমার ছাত্র দীপকের অনুরোধে তিন মাস কোলকাতায় থেকে গেলাম। দীপককে শিক্ষা দিলাম। তারপর সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল পূর্বেকার কথা। পূর্বেও যেমন আমার বিরুদ্ধে, আমার নিজের লোকেরা রটিয়েছিল, আমি খুব অভিমানী, অহঙ্কারী, অর্থলোভী, অনেক টাকা চাই, আবার এবারেও তাই শুনতে পেলাম আমার বিরুদ্ধে সেই একই রটনা। আসলে আমার প্রোগ্রাম যাতে কেউ না রাখে তার জন্যই এই সব অপপ্রচার হচ্ছে বুঝলাম। এ সব কথা আমি গ্রাহ্য করলাম না, কেননা আমি বুঝি একটাই সার কথা। সেই সার কথাটা হোল বিশ্বাস, ভালবাসা ও ভক্তি। এই তিনটি জিনিষে একাগ্র চিত্ত হলে, আর কিছু না পেলেও সঙ্গীতের রাস্তা পাওয়া যাবেই। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, 'ট্রুথ মাস্ট প্রিভেল।' যখন বুঝলাম, আমার সম্বন্ধে নানা কুচক্র হচ্ছে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আরও সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে রইলাম। এদিক ওদিক নানা কথা কানে আসে, কিন্তু সে সব আমি শুনেও শুনি না, কেননা আমার চিরকালকার স্বভাব, পরের কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করি না। সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনে বাজিয়ে কাশী চলে এলাম।

বেদান্তের উপর নানান ভাষ্য আছে। আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা হোল, পৃথিবীতে যতো বস্তু, যত জীবন, সবই সেই অসীম ঈশ্বরের স্পর্শের দ্বারা আবৃত। সত্যই তো, যা ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে? যখন যেটা হবার, ঠিক সময়েই হবে। তাঁকে কেউ বদলাতে পারবে না। দেখতে দেখতে নয়টি বছর কি ভাবে কেটে গেল। মৈহার ছাড়ার পর কত কিছুই তো করব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু এ কি হোল? ইতিমধ্যে আমার দাদা গৌহাটি থেকে কানপুরে বদলী হয়ে এসেছে। আমার ছেলে ও তাঁর মা চার বছর পর বাড়ীতে এলো। ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। যদিও ছেলের বয়স পাঁচ বছর, তবুও রাত্রে যখন বাজিয়ে উঠি ঠিক রাত্রি একটার সময় জাগবে ও কাঁদবে। ছেলেকে প্রথম দিনেই বোঝালাম, বাজাবার সময় কাঁদলে মারব। বাজাবার সময় ছেলে কিন্তু চুপটি করে বসে থাকত।

আমার উপস্থিত একটাই ইচ্ছা আছে, যে সুযোগ আমি পাই নি, সেই সুযোগটা ছেলে পাক। ছেলে একটু বড় হলেই খেলার ছলে সরোদ ধরিয়ে দেব। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আমার অনেক জানাশোনা ছেলে পড়ে। পাঠ্য বিষয় অসংখ্য, এ ছাড়া সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা অবধি ক্লাস। যতই ক্লাসে উঠবে ততই পড়ার চাপ বাড়বে। তবুও আমি বিশ্বাস করি, পড়া ও বাজনা দুই চলতে পারে যদি শখ থাকে। মনে হ'তো সখ আছে, কারণ চুপ করে বসে বাজনা শোনে। যা হবার তা হবে, ভবিতব্যকে কে রোধ করবে? এঁর জন্য চিন্তা করার কিছু নাই।

তিনটে বছর কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। এঁর মধ্যে প্রতিবছর বম্বে গিয়েছি বাজাতে। ছেলেকে ভর্তি করবার পর, বাবার একশো এক জন্মবার্ষিকীতে বাজিয়ে আসবার তিন বছর পরে, মৈহার থেকে চিঠি পেলাম ডেভিডের। ডেভিড কাটনিতে আমার একটা প্রোগ্রাম রেখেছে। ইতিমধ্যে বম্বের থেকেও প্রোগ্রাম এসেছে। ভাবলাম বাবার সঙ্গে

দেখাও হয়ে যাবে, তারপর কাটনিতে বাজিয়ে বম্বে চলে যাব। যথাসময় মৈহার পৌঁছলাম। পরের দিন আমার বন্ধু অরুণের জীপে সপরিবারে ডেভিডকে নিয়ে কাটনি বাজাতে গেলাম। কাটনিতে বাজিয়ে পরের দিন বম্বে গেলাম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা দরকার। অরুণ মৈহারে বদলী হয়ে আসার ফলে দীর্ঘ ছয় বৎসর বাবার মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রতিবছর তিন বার গিয়েছি যার ফলে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। অরুণ সর্বদাই আমার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে।

বম্বেতে কমল সিং-এর সঙ্গীত সম্মেলনে বাজাতে গেলাম। বম্বেতে স্থায়ী হয়ে বাস করছে হাথরসের লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ অর্থাৎ লল্লা। লল্লাকে আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বম্বে গিয়ে লল্লার বাড়ীতেই উঠলাম। বম্বে গিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। রবিশঙ্কর ভাল জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছে। বাড়ীর নাম পাভলোভা। শুভকে দেখলাম খুব নিয়মমাখিক রিয়াজ করছে। পেনটিং স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পেনটিং এবং সঙ্গীতে অন্নপূর্ণাদেবীর নিখুঁত পরিচালনায় শুভর দিন যাচ্ছে। শুভর মধ্যে সেই ছোট বেলার মতই সরলতা রয়েছে। বরাবর মৈহারে দেখেছি অন্নপূর্ণাদেবী নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করেন। রবিশঙ্করের কাছে শুভ খুব স্নেহ বৎসল। আমার মতে, বাবা মা'য়ের মধ্যে একজনের খুব নিয়মশৃঙ্খলাপ্রেমী এবং আর একজনের খুব উদারমনা হওয়া উচিত। তবেই ছেলে শিক্ষা পায় ভাল। যেমন আলিআকবরের প্রতি বাবা ছিলেন কঠোর এবং মা ছিলেন উদারমনা। রবিশঙ্করকে সর্বদাই দেখেছি, নিজের বাড়ীতে কিছু ছাত্র রাখে, যাঁদের দ্বারা বাড়ীর সব কাজ হয়। কিন্তু শিক্ষার নামে মা ভবানী। যাঁরা কিছু শিখে এসেছে, তাঁদের একটু শিখিয়ে নিজের বাজান টেপ দিয়ে বলে, শুনে শিখতে। তবে এ কথা ঠিক রবিশঙ্কর যাকেই নিজের কাছে রেখেছে, তাঁর ভবিষ্যৎ তৈরী করে দিয়েছে। যাঁরা বাজিয়ে কিছুই করতে পারে না, তাদের টিউসান করিয়ে দিয়েছে এবং পরবর্তী জীবনে বিদেশে এক জায়গায় পাকাপাকি বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম রবিশঙ্কর নিজের ড্রয়িং রুমে সোফা সেটের বদলে, মাটিতে ফরাসের ব্যবস্থা করেছে এবং পিঠের দিকে ফরাসের তিনদিকে কাঠের উপর পিঠ পর্যন্ত গদি বসিয়ে, হেলান দেবার নূতন ধরনের ব্যবস্থা করেছে। সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট। একটা ছোট ভাল জাতের কুকুর চুপটি করে শুয়ে আছে। আমি অন্নপূর্ণাদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি দেখেই হঠাৎ বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ালাম এ আবার কি? দেখলাম, একটা বকলেস হাতে নিয়ে 'দাসুম দাসুম' বলে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা আসা মাত্র চেন দিয়ে বেঁধে দিয়ে বললেন, 'আমার কাছে কেউ এলেই, আমার এই কুকুরটি আগন্তুকের ওপর লাফিয়ে কামড়ে দেয়। এঁর জন্যই আপনাকে এগুতে বারণ করেছিলাম।' কুকুরটি এক দুইবার আওয়াজ করল। অন্নপূর্ণাদেবী আদর করে কুকুরটিকে জড়িয়ে কি যে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি চুপ করে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুকুরটির নাম তো ভালো রেখেছেন। এ তো বাবার কথা দাসের দাস অর্থাৎ দাসুম। কুকুরটি ভাল জাতের মনে হয়।' উত্তরে বললেন, 'দাসুম হোল হনটিং ডগ।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে থেকে কুকুর পোষার সখ হোল আপনার?' গম্ভীর ভাবে বললেন, 'মানুষের চেয়ে কুকুর অনেক বেশী সৎ, সরল ও বিশ্বাসী।' আবহাওয়াটা উলটো দিকে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন?' উত্তরে বললেন, 'যেমন ভাবে হোক চলে যাচ্ছে।' অন্নপূর্ণাদেবী বরাবর চাপা প্রকৃতির। বুঝলাম, কোনরকম আপোষ করে চলেছেন। আবার পুরোন কথার জের টেনে বললেন, 'এই কুকুরটা যে সময় বাজনা হয় চুপ করে শোনে। একে আমি স, র, গ, ম শিখিয়েছি। আমার অবাক ভাব দেখে অন্নপূর্ণাদেবী গলায় 'স' গাইলেন। কুকুরটিও গাইলো। এর পর স, র, গ, ম পরপর অন্নপূর্ণাদেবী গলায় গাইলেন এবং কুকুরটাও পরের পর চারটি সুর গাইল। আমার কাছে বিস্ময়। পরে যখন কয়েকবছর পরে এই ফ্লাটটি ছেড়ে আকাশ গঙ্গার ফ্লাটে যান, তখনও সেই কুকুরটিকে দেখেছি। শুনেছি সেই আকাশগঙ্গার ফ্লাটেই সেই অদ্ভুত কুকুরটির মৃত্যু হয়েছে। যাক এ তো পরের কথা। বম্বে বাজিয়ে কাশীতে চলে আসি।

প্রতি বছরই বম্বে যাই। শুভকে সেতার বাজাতে দেখি। উনিশশো অটষট্টির আগস্ট মাসে বম্বে যেতে এই প্রথম দেখলাম নূতন জায়গায় ওয়ারডেন রোডে নিজস্ব ফ্লাট 'আকাশ গঙ্গায়' বসবাস করছেন। সমুদ্রের সামনেই বিরাট ফ্লাট সিস্টেমের বাড়ী। অবশ্য এই বাড়ীতে আমার বন্ধু লল্লা নিয়ে গিয়েছে। লল্লা যদিও রবিশঙ্করের কাছে গণ্ডা বেঁধেছে, তা সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শেখে এবং মাতাজি বলে সম্বোধন করে। অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শুনলাম ওয়ারডেন রোডের এই ফ্লাট যখন তৈরি হচ্ছে, তখনই শুভর জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছিলো এবং জোর করেছে তাঁর বাবার কাছে, এই জায়গায় ফ্লাটটি কিনতে এবং পাভলোভার ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে দিতে। শুভর বাবা এই কথা শুনে বলেছে, 'তোমার মা'কে জিজ্ঞাসা করো, তোমার মা'র পছন্দ কিনা?' শুভর কাছে এই কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'আমার পছন্দর কোন প্রশ্নই আসে না। তোর যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার যেতে আপত্তি নেই।' বুঝলাম, অন্নপূর্ণাদেবীর ব্যক্তিত্বের কাছে রবিশঙ্কর কত তুচ্ছ। নিজের বলার সাহস নাই, নইলে লেকচার শুনবেন, 'বাজনার উপর খেয়াল নেই, কেবল সৌখিনতার দিকে ঝোঁক।' যাই হোক, বুঝলাম শুভর ইচ্ছায় এই নূতন ফ্লাটে এসেছেন। সত্যই এ জায়গাটা চমৎকার। এঁর পর লল্লা ও আমাকে চা দিয়ে এই প্রথম অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে বললেন, 'তোর কাকাকে আজ বাজনা শোনা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনুন, কি রকম বাজাচ্ছে? ওকে আশীর্বাদ করুন কেননা আপনি ওর লেখাপড়ার গুরু।' শুভর বাজনা শুনলাম। পুরো দু ঘণ্টা আলাপ এবং গৎ শোনাল। বাজনা শুনে মন্ত্র মুগ্ধ হলাম। শুভর সামনে তারিফ করলাম না। শুভকে বললাম, 'খুব রিয়াজ করে এই রকম বাজালে, তোর দাদুর নাম উজ্জ্বল নিশ্চয়ই হবে।' আলাদা অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'এবার শুভকে বাইরে বাজাবার অনুমতি দিন। রবিশঙ্করকে বলুন সারা ভারতবর্ষে সঙ্গে নিয়ে বসে বাজাতে।' উত্তরে বললেন, 'আরও দুই বছর পরে বাজাবার অনুমতি দেবো।' কি পরিশ্রম করে অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে শিখিয়েছেন তা আমার অজানা নাই। অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে শিখেয়েছেন, সেই হেতু রবিশঙ্কর কখনও শুভকে শেখান নি। অবশ্য অন্নপূর্ণাদেবী মৈহার থেকে দিল্লী গিয়ে যখন শুভকে প্রথম

সেতার শেখাতে আরম্ভ করেন, তখন রবিশঙ্করকে বলেছিলেন, 'তুমি নিজে একটু শুভকে শেখাও না।' এর উত্তরে রবিশঙ্কর বলেছিলো, 'যখন তুমি শেখাচ্ছ, আমি আর কি শেখাবো?' শুভর সেই বাজনা শুনবার পর, উনিশশো আটষট্টির শেষে আমি কাশী চলে গেলাম।

উনিশশো উনসত্তর সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর আমার জীবনে একটা স্মরণীয় বছর। কেন স্মরণীয় সে কথাটা প্রথমেই বলে দিলে, গল্পের ঠিক স্বাদ পাওয়া যাবে না। যে কারণে স্মরণীয় সে তো বছরের শেষের দিকের ঘটনা। শেষের ঘটনা শেষে বলাই তো নিয়ম। শেষের আগে তো শুরু আছে। তাই প্রথমে গোড়ার দিকের কয়েকটা ঘটনা না লিখলে শেষটা লিখবো কি করে? তাই বছরটির প্রথম দিনের কয়েকটি স্মরণীয় সঙ্গীত কার্যক্রমের কথা সংক্ষেপে লিখেই মূল কথাতে আসব।

লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে কলেজে বাজাতে গিয়েছি। বাজাবার পরই প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি, প্রেস ক্লাবে আমাকে বাজাবার জন্য অনুরোধ করে। বাজাতে রাজী হলাম একটা শর্তে। সেক্রেটারিকে বললাম, 'বাজাব কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটির বিবরণ কাগজে ছাপাতে পারবেন না। আমি চাই না লোকে ভাবুক যে খবরের কাগজের সৌজন্যে বাজিয়েছি নিজের প্রচারের জন্য। আমি প্রচার বিমুখ। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বাজাই এবং তা বেরোয় খবরের কাগজে। কিন্তু প্রেস ক্লাবে বাজালে সকলের ধারণা হবে, আমি প্রেস-এর কাউকে ধরে বাজিয়েছি এবং সব কাগজে প্রচার করিয়েছি। প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি বোধ হয় আমার মত আহাম্মুখ লোক দেখেন নি। আমার শর্তে সেক্রেটারি রাজী হয়ে বাজাবার জায়গাটা যেখানে রাখলেন, সে জায়গাটি ঐতিহ্যমণ্ডিত। যেখানে বাজনা রাখা হয়েছিল, সেটা প্রাচীন কোন মুসলমান বাদশার সঙ্গীতের আসর ছিল। মাইকের দরকার নাই। অটোমেটিক ভাইব্রেশন হয়। জায়গাটা ছিলো লক্ষ্ণৌর আমিনাবাদে। জায়গার নাম ছিল গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল মিউজিক হল। এ রকম জায়গা আগে দেখিনি। কত যুগ আগে নবাবরা সঙ্গীতের জন্য এই ধরনের জায়গা করেছিলো ভাবা যায় না। সত্যই তাঁরা সঙ্গীতের কদরদান ছিলেন বলেই এমন হল তৈরী করেছিলেন। সে সময় তো মাইকের ব্যবস্থা ছিলো না। তাই অদ্ভুত পরিকল্পনা করে সঙ্গীত কক্ষ তৈরী হয়েছিল।

বম্বেতে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি পারফরমিং আর্টস-এর হল তৈরী হয়েছে, যাতে মাইকের দরকার হয় না, সেইরকম লক্ষ্ণৌতে কয়েক শতাব্দী আগে এই ধরনের হল তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল সঙ্গীতের আসরের জন্য, যা এখন কল্পনা করা যায় না। এর পর কোলকাতায় সুরেশ সঙ্গীত সংসদ এর প্রেসিডেন্ট মন্মথনাথ ঘোষ এবং সেক্রেটারি কানাইলাল সরকারের নিমন্ত্রণে কোলকাতায় আমি গিয়ে বাজাই। সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন কাশীর সঙ্কট মোচনের মহন্ত অমরনাথ মিশ্র। কোলকাতায় সংবাদপত্রেও প্রকাশ হয়েছিল, এবং প্রায় বহু লোকেই বলেছিলেন, মৃদঙ্গের সঙ্গে এইরূপ সঙ্গত তাঁরা আগে কখনও শোনেন নি। সেই আসরে কোলকাতার বহু গুণী গায়ক, বাদক উপস্থিত ছিলেন।

আগেই শুনেছিলাম আমার ছাত্র দীপকের বিয়ে হয়েছে। কোলকাতায় গিয়ে দীপকের

বাড়ীতেই উঠলাম। গিয়ে দেখি নিজের ঘরটাই আমাকে দিয়েছে থাকবার জন্য। একটা বড় ঘরে নিজের স্ত্রী এবং বাবার সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করেছে। ব্যাপারটা কিন্তু বুঝি নি। আমার বন্ধু রণজিৎ কুণ্ডুই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। আমার বন্ধুর উত্তর কোলকাতায় তাঁর নিজস্ব ফ্লাটে আমাকে থাকবার জন্য বললো। যদিও দীপক এবং দীপকের বাবা বারবার আমাকে বললো, তাঁদের কোন কষ্ট হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও এর পর কোলকাতায় নিজের বন্ধুর কাছেই থাকব স্থির করলাম। এর ফলে দীপকের শিক্ষায় বাধা পড়ল।

এর পর দিল্লীতে সুন্দর এসোশিয়েসন-এর তরফ থেকে একটা ঘরোয়া প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। সেখানে তবলায় দিল্লীর লতিফ খাঁর সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বাজনা হয়েছিল। এর পর বহির্ভারত মন্ত্রকের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নেপালে যেতে হয়। নেপালের রাজা, রাণী এবং তাঁর পরিবারবর্গের সামনে ভারতীয় দূতাবাসে দুই দিন বাজাই। নেপালি এসোশিয়েসানের তরফ থেকেও একদিন বাজনা হয়। সেখানেও নেপালের মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

এর পর কাশীতে পৌঁছে চিঠি পেলাম মৈহার থেকে। মৈহারে আমার বন্ধু অরুণ বোস লিখেছে, বাবার শরীর খারাপ। কাটনি এবং পান্না মহারাজের প্রাসাদে আমার বাজনা স্থির হয়েছে। বাবার শরীর খারাপ শুনেই মৈহার পৌঁছলাম রাত্রি বারটার সময়। পরের দিন সকালেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম বাবা বারান্দায় তক্তপোষের উপর শুয়ে আছেন। নিজের ঘরে আর শোন না। দেখলাম সত্যিই বাবার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। জুবেদা বেগম তখন উপস্থিত আছেন। আমার বন্ধু অরুণ বোস এবং তাঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে বাবা বললেন, 'গতজন্মে এ আমার মা ছিলো। তোমার বন্ধু অত্যন্ত ভালো। রোজ আমার কাছে আসে এবং সব দিকে খবরাখবর রাখে। মৈহারে ওষুধ না পাওয়া গেলে, সাতনা থেকে এনে দেয়।' এই প্রথম বাবাকে সারাদিনরাত শয্যা নিতে দেখলাম। তবুও এর মধ্যে একটু বসেন, পেছনে বালিশ হেলান দিয়ে। বাবাকে বলে, কাটনিতে বাজিয়ে মৈহারে এলাম সকালে। দুপুরেই পান্না যাত্রা করলাম। পান্না মহারাজের এখানে বাজিয়ে, পরের দিন দুপুরে মৈহারে পৌঁছে বিকেলে দেখা করতে গেলাম বাবার কাছে। বাবাকে প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'কাটনিতে কি রাগ বাজিয়েছিলে?' বললাম, 'শুদ্ধ বসন্ত।' বাবা হঠাৎ ধীরে ধীরে আরোহী অবরোহী গাইলেন। বাবার স্মৃতিশক্তি এখনও ঠিক আছে। বাবা বললেন, 'কবে ফিরে যাবে কাশী?' বললাম, 'কয়েকদিন থাকব।'

চৌঠা সেপ্টেম্বর আমার জীবনে স্মরণীয় দিন। সকাল নয়টার সময়, আমার ছাত্র ডেভিড এবং আমার বন্ধু তাঁর পুরো পরিবার নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছি। গিয়ে দেখি মৈহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কিছু ছেলেরাও বসে আছে। আচমকা বাবা বললেন, 'কি রকম আজকাল বাজাচ্ছ? আমাকে শোনাও।' আমার তো অবস্থা খারাপ। এ কি বাবার কঠিন পরীক্ষা? বললাম, 'আমি কি বাজাব?' বাবা আবার বললেন, 'যাও বাজনা নিয়ে এসো এবং বাজাও।' আমার আপত্তি সত্ত্বেও যখন দেখলাম, বাবা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, তখন আমার বন্ধুকে বললাম, 'জীপে এগিয়ে আমার বাজনা নিয়ে এসো।' বাজনা আনতে ডেভিড সঙ্গে গেল।

আমি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে নানা চিন্তায় পড়লাম। এ কি বাবার পরীক্ষা? আমার সব ছাত্রদের সামনে হঠাৎ যদি বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে বলেন, 'এই ছাতার বাজনা বাজাও?' তাতে আমিও নিরুৎসাহ হব এবং এ ছাড়া ছাত্রদের সামনেও লজ্জা। যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই সরোদ নিয়ে আমার বন্ধু এবং ডেভিড এলো। ডেভিড-এর কাছ থেকে সরোদ নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেলাম। বাবা আমার বন্ধুকে বললেন, 'বাবাজী আমাকে একটু বসিয়ে দাও তো।' বাবাকে বসিয়ে দুটো বালিশ রাখা হোল। বাবা বসেই মা'কে ডাকতে বললেন। মা এলেন। মা'কে বললেন, 'তোমার ছেলে বাজাচ্ছে, শোন।' বারান্দায় বসে আমি দেখলাম বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবাকে ও মা'কে প্রণাম করে 'আহির ভৈরো' বাজালাম। সেই যে চোখ বুজে শুরু করলাম, শেষ যখন হোল কানে এল বাবা দুই হাত দিয়ে হাততালি দিচ্ছেন। চোখ খুলে দেখলাম বাবা হাসছেন। হঠাৎ কি হোল, বাজনা নামিয়ে রেখে, বাবাকে প্রণাম করতেই হঠাৎ কোথা থেকে কান্না এসে গেল বেশ জোরেই। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'শান্ত হও, শান্ত হও।' বাবার এই কথা শুনে, কি জানি কেন, ভেতর থেকে সব দুঃখ বোধ হয়, কান্নায় দ্বিগুণ রূপান্তরিত হোল।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই ভাবেই কেটে গেল। অরুণ আমাকে ধরে বললো, 'বাবাকে শোয়াতে হবে।' বাবার কথা ভেবে নিজেকে সংযত করলাম এবং বাবাকে শুইয়ে দিলাম। বাবা মা'কে বললেন, 'যতীনকে খাওয়াও।' এ কথা শুনে বললাম, 'সকালে খেয়েই এসেছি।' বাবা বললেন, 'খুব ভাল বাজিয়েছ। ভাব নিয়ে এইরকম সব জায়গায় বাজাবে। আমি খুশী হয়েছি।' এর পরই হঠাৎ বাবা বললেন, 'একটা কথা বলবো? আমি যে তোমাকে শিখিয়েছি তার জন্য আমাকে গুরুদক্ষিণা কি দিয়েছ?' বাবার কথা শুনে ঘাবড়ালাম। বাবা কি বলতে চাইছেন? ক্ষণিকের মধ্যে মনে পড়ে গেল, মৈহারে শিক্ষাকালীন সময়ে, একবার আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর যখন এসেছিলেন, বাবা আমায় বলেছিলেন, 'আলিআকবর, রবুকে বলো যে তাদের শিখিয়েছি বলে, গুরুদক্ষিণা হিসাবে এক একজন একলাখ টাকা করে আমাকে দিক।' অবশ্য এ কথা বলার পরই বলেছিলেন, 'আমি এঁদের টাকায় হিসাব করে দিই? এঁদের কেবল পরীক্ষা করতে চাই। দেখতে চাই ওঁরা কী বলে।' আলিআকবর এবং রবিশঙ্করকে বাবার গুরুদক্ষিণার কথা বলায় দুজনেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে রবিশঙ্কর বলেছিলেন, 'এখন তো সে অবস্থা নাই, সময় হলে নিশ্চয়ই দেবো।' এর পর আলিআকবর একই কথা বলেছিলো। এ কথা শুনে আমি হেসে বলেছিলাম বাবা পরে যা বলেছিলেন। আলিআকবর ও রবিশঙ্কর দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে উঠেছিল। দুজনেই অবশ্য অবাক হয়েছিলো কেননা তাঁরা বাবার মেজাজ জানত। এঁদের সঙ্গে কথা বলার পর বাবার কাছে যেতেই বলেছিলেন, 'আমার কথামত বলেছিলে?' বলেছি বলাতে, বাবা বলেছিলেন, 'বলনি পরীক্ষার জন্য এ কথা বলেছি?' উত্তরে বাবাকে বলেছিলাম, 'এ কথাও বলেছি।'

উপরোক্ত ঘটনাটা মনে পড়ায়, ভাবলাম বাবাও আমাকে কি সেইরকম পরীক্ষা করছেন? যাই হোক বাবাকে বললাম, 'আমার দ্বারায় সম্ভব হলে আপনি যা চান তাই গুরু দক্ষিণা হিসাবে দিতে পারি।' বাবা বললেন, 'আমার জীবনী নিয়ে এ যাবৎ যা কিছু হয়েছে,

সব সত্য করে লিখবে?' বললাম, 'আপনার মিথ্যা কোনটা?' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'কেন? আমি মাছ, পিঁয়াজ, মুরগী খাই, অথচ সকলেই লেখে আমি এ সব খাই না। এই সব মিথ্যা কথা কেন লেখে? এই সব লেখা পড়ে যারা আমায় জানে, সকলেই মিথ্যাবাদী বলবে। আমি কি মিথ্যাবাদী?'

বললাম, 'লোকে আপনাকে কেন মিথ্যাবাদী বলবে?' বাবা আবার আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করেই খুব উত্তেজিত হয়ে গেলেন। আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। বুঝলাম বাবা 'সুরছন্দা' পড়েছেন। তাঁরও প্রতিক্রিয়া হয়ত নিশ্চয়ই হয়েছে। বাবাকে কেউ বোঝাতে পারে নি, যার জন্য বাবার বিবেক দংশন করছে। অথচ শরীর খারাপের জন্য বাবা কথায় যোগসূত্রও হারিয়ে ফেলেছেন। আমার চুপ করা দেখে বাবা আরো উত্তেজিত হলেন। বললেন, 'আমার ছাত্রদের মধ্যে তুমিই লেখাপড়া করেছো। বলো তুমি আমার বিষয়ে সব সত্য কথা লেখবে কি না? তার মানে তুমি আমায় গুরুদক্ষিণা দেবে না?' বাবা অসুস্থ। এই অবস্থায় যদি কিছু হয়ে যায় তবে নিজেকে কি করে ক্ষমা করব? আমার জন্যই যদি এই উত্তেজিত অবস্থায় মারা যান? সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু অরুণ বোস আমাকে ইশারায় বললো রাজী হয়ে যেতে। মনে মনে ভাবি সব সত্য কথা লিখতে গেলে কত বড় সমস্যার সম্মুখীন হবো, সে কথা তো অরুণ বোস জানে না। বাবার দিব্যি, সব ঘটনা লিখতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। চিন্তার ফলে মনে হোল, কেউ আমার মাথাটা ঠিক লাট্টুর মত সুতো ছেড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে বাধ্য হয়ে হাত জোড় করে বললাম, 'অভয় দেন তো একটা কথা বলবো?' বাবা বললেন, 'তোমার কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই, যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো।' বললাম, 'আপনি বাড়ীর সকলকে কথায় কথায় শুয়ার বলেন, তা কি লিখব?' বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'জরুর, জরুর জরুর! এই তিনবার তিহাই দিয়ে বলছি নিশ্চয়ই লিখবে।' এই কথা বলতে বলতে দেখলাম বাবার শিরা ফুলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ঠিক আছে। আমি লিখব।' সঙ্গে সঙ্গে বাবার মেজাজ শান্ত হয়ে গেল। এবার আমার চিন্তার পালা। নানা কথা মনে হতে লাগলো। হঠাৎ মনে হোল, বাবার সঙ্গে আমার একটা ফটো তো নেই। সঙ্গে সঙ্গে অরুণকে বললাম, 'মৈহারে একজনেরই ফটোগ্রাফীর দোকান আছে। তাঁকে ডেকে আনো। বাবা মা'য়ের সঙ্গে একটা ফটো ওঠাব।' বাবাকে ফটোর প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। বাবা খুশী মনে রাজী হলেন। কিছুক্ষণ পর ফটোগ্রাফার এসে ফটো ওঠাল। কিন্তু ফটোগুলো যখন পরে দেখলাম, খুব খারাপ হয়েছে। মৈহারে এর বেশী আশাও করা যায় না। বাবা আমার বন্ধুর পরিবারবর্গের সঙ্গেও আলাদা ফটো ওঠালেন। বাবার যখন মেজাজ একটু ভাল বুঝলাম বললাম, 'দশ বছর আগে এলাহাবাদের হোটেলে নিজের হাতে লেখা, আপনার জীবনী যা দেখিয়েছিলেন, সেটা কোথায়? সেটা যদি আমাকে দেখান, তাহলে বই লিখতে আমার সুবিধা হবে।' বাবা ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখাব। আমাকে ধরে ঘরে নিয়ে চলো।' ঘরে গিয়ে বাবা মোটা খাতাটি বার করে, আমাকে দিয়ে বললেন, 'পড় এইখানে বসে। পড়ে আবার এইখানে রেখে দেবে।'

বাবাকে ধরে বাইরে এনে শুইয়ে দিলাম। বাবা যা লিখেছেন শেষ করতে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বাবা নিজের আত্মজীবনী, বংশপরিচয় দিয়ে শুরু করে আমার মৈহার ছাড়ার সময় পর্যন্ত সব লিখেছেন। কয়েকটা জায়গা বারবার পড়লাম। মনে হোল এই লেখাটা যদি ছাপান যায়, তাহলে যাঁরা বাবাকে চেনেন, তাঁরা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামতে পারবেন না। যদিও বানান ভুল কিন্তু লিখে রাখতে পারব না কেননা কাগজ কলম নাই। তা ছাড়া সব লিখতে সময়েরও প্রয়োজন। দেখলাম, বড় বড় করে খাতার প্রথমেই লিখেছেন, 'আমার জীবনী, ৩০.৫.৫৭. বাবার সামনে লেখাটা পড়ে শেষ করে, বাবার কথামত বাবার ঘরে রেখে এসে আবার বাবার সামনে বসলাম। বাবা আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'কেমন হয়েছে? সকলের ভেদ খুলে দিয়েছি।' বাবার পা ধরে আবেগের সঙ্গে বললাম, 'বাবা আপনি অসাধারণ পুরুষ। যেটাকে আপনি ধরেছেন তারই শেষ করে ছেড়েছেন। যেমন বাজনায়, তেমনি সর্ববিষয়ে, কত কথার উল্লেখ করব।' হেসে বাবা বললেন, 'আরে আরে বল কি? আমি তো মহামূর্খ। আমি কি করেছি? জীবনে কিছুই করতে পারলাম না।' মনে মনে ভাবলাম আলিআকবর এলে বাবার এই লেখাটা চেয়ে নেব। কিন্তু আলিআকবর কি এই খাতা দেবে? বাবা তো কাউকে ছেড়ে কথা বলেন নি। বাবা সত্যই সকলের ভেদ খুলে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর বাবাকে প্রণাম করে অরুণের সঙ্গে বাড়ী গেলাম। বাড়ী যাবার পর মনে হোল, কেউ আমার মাথায় পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে। বিকেলে একটা খাতা কিনলাম। খাতায় একটা খসড়া করলাম। কার কার সঙ্গে দেখা করব? কার কাছ থেকে বাবার দুষ্প্রাপ্য ফটো পাব? বাবার ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী কারা, যাঁদের সাক্ষাৎকার নেবো? এই সব লিখতে গিয়ে কখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে খেয়াল নেই। সন্ধ্যায় বাবার কাছে গেলাম। বাবা আমাকে দেখেই বললেন, 'মনে রেখো কথা দিয়েছো? কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। সব সত্য কথা লিখবে তো?' উত্তরে বললাম, 'আমাকে মস্ত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, কথা যখন দিয়েছি, তখন নিশ্চয়ই লিখবো।' মনে হোল বাবাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু মেজাজ দেখে কিছু জিজ্ঞেস করবার ভরসা হোল না। উপরোক্ত ঘটনার সময়, সপরিবারে আমার বন্ধু এবং ডেভিড উপস্থিত ছিলো। বাড়ীতে এসে আবার খাতা নিয়ে বসলাম। নিজের মনে যা যা এলো লিখতে লিখতে খাবার সময় হয়ে গেল। আমাকে কখনও বাবার জীবনের সব সত্য কথা লিখতে হবে, এ কথা ভাবতেই চিন্তায় ঘুম চলে গেল। এও এক পরিহাস বই কি। আমার কেবল নেবারই কপাল, দেবার নয়। যাক বাবা যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন তা যদি পালন করতে পারি, ভাবব অন্ততঃ কিছুটা তো করতে পারলাম।

পরের দিন সকালে আমি একলাই বাবার কাছে গেলাম। ভাবলাম, যদি শরীর এবং মেজাজ ঠিক থাকে তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করব বাবাকে। বাবাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। বাবা খুব ধীর স্বরে বললেন, 'আমাকে ধরে, ধীরে ধীরে আমার ঘরে নিয়ে চলো তো।' বাবার এই ধরনের ধীরে কথা বলা দেখে অবাক হলাম। বাবা কেন ঘরে যেতে চাইছেন? যাক বাবাকে ধরে ঘরে নিয়ে গেলাম। বাবা আমাকে বললেন, 'কবে আছি, কবে নেই, তাই

তোমাকে দুটো জিনিষ বলে যাই।' সেই ঘরের মেঝের একটা টালি দেখিয়ে বললেন, 'আলিআকবরকে বোলো এই টালিটা খুললেই একটা ছোট ঘড়া সে দেখতে পাবে। সে ঘড়ার ভেতর আমার কিছু গুপ্তধন আছে।' মনে পড়লো আমার মৈহার থাকাকালীন, বাবা আগেও একবার মক্কা যাবার আগে এই কথাটা বলেছিলেন। তারপর একটা আলমারীর পাল্লা খুলে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখ। এইটা হচ্ছে আমার উইল, আমার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির দানপত্র। আমার মৃত্যুর পর আলিআকবর এলে তাকে উইলটা দেখিও।' বাবার এই কথা শুনে বললাম, 'তাই হবে, তবে আপনি মরার কথা ভাবছেন কেন?' বাবাকে এই কথা বলে ধীরে ধীরে বাইরের বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। হঠাৎ বাবা বললেন, 'এ কথা এখন কাউকে বলবে না।' বললাম, 'ঠিক আছে।' এখন যেন বাবাকে প্রসন্ন অবস্থায় দেখলাম। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকলেও বাবার অসুস্থ শরীর বলেই কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

৫৩

বছর শেষ হতে এখনো তিন মাস প্রায় বাকী আছে। মৈহার থেকে কাশী আসবার পর, এই তিনমাসের মধ্যে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কোলকাতায় এবং মৈহারে গিয়েছি। মৈহারে গেলেই কদিন থেকে গিয়েছি। আমার বন্ধু সর্বদাই প্রোগ্রাম ঠিক করেছে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কোলকাতায় গিয়েছি বাজাতে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে বাবার প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বাবার জীবনের উপাদানগুলি কারো কাছে কোথায় কিছু যদি থাকে, তার সন্ধানে কেবল দেশের বিভিন্ন স্থানে খুঁজে বেড়িয়েছি। সর্বদাই মনে হচ্ছে, দার্শনিককে যেমন অনুমানের পথ ধরে এগুতে হয়, ব্রহ্ম কি? তাঁর স্বরূপ কি? ঠিক সেইরকম আমাকেও এই অনুমানের পথ ধরে বাবার জীবনী লিখতে হবে।

আশ্চর্য। কখন কেমন করে কোনদিকে যে মানুষের মোড় ঘোরে তা বোধ হয় তাঁর সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারে না। নইলে বাবার আজ্ঞায় যে সময় সকলের সঙ্গে দেখা করছি, তার প্রায় সাত মাস পরেই একদিন দুপুরে এমন বিপর্যয় কেনই বা ঘটবে? আমাদের ঘরের একটা সম্ভাব্যময় সঙ্গীত প্রতিভার আকস্মিক মৃত্যু কেন ঘটবে? এই মৃত্যুর জন্য, কোন মিরাশী, ধাড়ী, কাফের দায়ী? সেই মিরাশিটা কে? আমার বই-এর জন্য এই মস্ত বড় বিপর্যয়টি মস্ত বড় উপাদান হয়ে দাঁড়াবে, তা কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিলাম। গোড়ার কয়েকটা কথাই আগে বলি। কাশীর সঙ্গীত পরিষদের থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। সঙ্গীত পরিষদের এবারে হীরক-জয়ন্তী উৎসব হবে। ভারতের প্রথম স্তরের শিল্পী থেকে মধ্যম শ্রেণীর শিল্পী এমন কেউ নেই, যিনি এই সঙ্গীত পরিষদে এসে নিজের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। প্রথম প্রথম প্রত্যেক মাসে একটা করে সঙ্গীত অনুষ্ঠান হ'তো। পরেও হয়েছে এবং শেষের দিকে, বছরে পাঁচ দিন একটানা সঙ্গীত অনুষ্ঠান হ'তো। এই সঙ্গীত পরিষদের কর্ণধার যিনি ছিলেন তাঁর নাম শীতলা প্রসাদ অগ্নিহোত্রী। তাঁর ছিল গন্ধ দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা। কিন্তু প্রাণ ছিল তাঁর সঙ্গীত। ভারতবর্ষে সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার ও প্রভাবের ব্যাপারে তিনটি সংস্থার দান অবিস্মরণীয়। প্রথমটি হচ্ছে কাশীর সঙ্গীত পরিষদ।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বম্বে প্রদেশের সুরশৃঙ্গার পরিষদ আর তৃতীয়টি হোল কাশীর সঙ্কট মোচানের বার্ষিক সঙ্গীত মহোৎসব। ভারতবর্ষে তিনটি লোককে দেখেছি, যাঁরা সঙ্গীতের প্রচার করতে চেয়েছেন, যদিও তাঁরা শিল্পী নন। তবে রসজ্ঞ শ্রোতা। তার মধ্যে আগেই বলেছি কাশীর সঙ্গীত পরিষদের সেক্রেটারির কথা। অতঃপর উল্লেখযোগ্য হোল বম্বের সংস্থা সুরশৃঙ্গার সংসদ। এর কর্ণধার হলেন ব্রিজনারায়ণ। সুরশৃঙ্গার সংসদের নামে, অনেকগুলো সর্বভারতীয় সঙ্গীতের আয়োজন করেন, যেমন 'হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলন', 'আজ কে কলকার' এবং আরোও অনেক। সম্মেলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোল বিনা টিকিটে সকলেই এই সঙ্গীত শুনবার সুযোগ পায়। বম্বেতে ১৯৪৯ থেকে সুরশৃঙ্গারের সর্বেসর্বা হয়ে আছেন ব্রিজনারায়ণ। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান আছে, তা থেকেই তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ চলে যায়। কিন্তু সঙ্গীত তাঁর কাছে প্রাণস্বরূপ। ভারতের যত গুণী শিল্পী আছেন, সকলেই এই সংস্থায় যোগদান করেছেন।

প্রায় একুশ বছর আগে ভারতের যাঁরা দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সবাই বম্বেতে তাঁরই সঙ্গীত সম্মেলনিতে যোগদান করে খ্যাতিমান হয়েছেন। অবশ্য কোলকাতায় অলবেঙ্গল, অলইণ্ডিয়া কনফারেন্সের সেক্রেটারিরাও এই পর্যায়েই পড়ে। তখনকার দিনের সঙ্গীতজ্ঞর কদর যেমন ছিল, শ্রোতাও তেমন ছিল। উপরোক্ত সংস্থার কর্ণধাররা সঙ্গীত শিল্পী না হলেও প্রকৃত সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন। সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁরা নিজেদের শ্রম, অর্থ, সময় অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমটির কর্ণধার ছিলেন মন্মথনাথ ঘোষ এবং দ্বিতীয়টির কর্ণধার ছিলেন লালাবাবু। এঁদের সম্মেলনে যোগদান করতে পারাটা ছিল তখনকার সঙ্গীতজ্ঞের গর্বের বস্তু। কাশীতে একটা প্রতিষ্ঠান আরও আছে যাঁরা বিনাটিকিটে চারদিন অনুষ্ঠান করেন। যার পরিচালনা করেন সঙ্কটমোচন ফাউণ্ডেসানের প্রেসিডেন্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিভাগীয় কর্তা ডাক্তার বীরভদ্র মিশ্র। ইনিও এই পর্যায়ে পড়েন। প্রায় তিনহাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে চারদিন সন্ধ্যা আটটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত সঙ্কটমোচনে সঙ্গীত কার্যক্রম হ'তো। যেটা এখন প্রতিবছর পাঁচদিন হয়। এখানে একটা জিনিষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিনাটিকিটে সর্বভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গীত শ্রোতাদের শুনবার সুযোগ একমাত্র বম্বেতে সুরশৃঙ্গার এবং কাশীতে সঙ্কটমোচন ছাড়া আর কোথাও বর্ত্তমানে হয় না। যদিও এই ধরনের আরও কিছু সংস্থা আছে, কিন্তু সেখানে সর্বদাই দলাদলি অর্থাৎ বাবার ভাষায় পার্টিবাজি। এর পরে সারা ভারতবর্ষে সঙ্গীত সম্মেলন পূর্বেও হয়েছে, বর্ত্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ-এও হয়ত হবে। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটা নিষ্ঠুর সত্য যে, প্রায় তিরিশ বছরে বহু সঙ্গীত সম্মেলনের বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু পরবর্তী কালের কর্ণধারদের মধ্যে, উপরোক্ত পাঁচজনের মধ্যে চারিত্রিক উদারতার অভাব দেখা গেছে। কারণ পরবর্তীকালের সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ণধারদের, সঙ্গীতকে নিজের অর্থ উপার্জন ও প্রচারের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে দুঃখের কথা, এই বছরেই সঙ্গীত পরিষদের রজত জয়ন্তী সম্মেলন হবার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া অল বেঙ্গল এবং অল ইণ্ডিয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে বিনাটিকিটে এখন সর্ব ভারতীয়

শিল্পীকে ডাকা হয় বম্বে হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে এবং কাশীর সঙ্কট মোচন সঙ্গীত সম্মীলনীতে। যদিও পারিশ্রমিক নামমাত্র দেওয়া হয়। যে হেতু কোন টিকিট হয় না, তার ফলে বৎসরে একবার সঙ্গীত পিপাসুরা শুনবার সুযোগ পায়।

যাক যে কথা বলছিলাম। প্রথমে কাশীর পুরাতন সঙ্গীত পরিষদের কথা বলি। এই হীরক জয়ন্তীতে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানে যন্ত্রে ছিলেন আলিআকবর, রবিশঙ্কর, নিখিল ব্যানার্জি, জয়া বিশ্বাস এবং আমি। গান এবং নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এই সংস্থা বাইশ জানুয়ারী উনিশশো সত্তর সালেই হীরক জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করার পর অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাবার বিষয়ে বই লিখবার জন্য অনেকের সাক্ষাৎকার এর মধ্যে নিলেও, ব্যস্ততার জন্য আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার এই সময় নিতে পারিনি। উপস্থিত আমার বাবার উপর বই লিখবার জন্য উপাদান সংগ্রহ করাই প্রধান কাজ। অবশ্য এর মধ্যে নিজের সঙ্গীতের কার্যক্রমেরও ভাগ নিতে হচ্ছে নিজের ভরণ পোষণের জন্য। আকাশবাণীতে প্রতি সপ্তাহে ন্যাশানাল প্রোগ্রাম নামে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমি এই প্রথম ন্যাশনাল প্রোগ্রামে সরোদ বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করল কিষণ। অনুষ্ঠানটি পরে শ্রোতাদের কাছে শুনেছি মনের মত হয়েছিল। বহু পত্রও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাল বাজান সত্ত্বেও ন্যাশানাল প্রোগ্রামে ওই আমার প্রথম ও শেষ অনুষ্ঠান। তার কারণ সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদের পাতায় পাতায় এত ভূয়সী প্রশংসা হয়েছিল, যা অপরাপর সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি আচার্য বৃহস্পতি দিল্লীর আকাশবাণীর প্রোডিউসার অফ মিউজিক হয়ে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর কাছেই বিরূপ বহু সমালোচনা শুনেছি, যা আমার নিজের লোকেরাই করেছে। আবার তাঁর কাছে আমার গুরু ভাই এর বিরূপ সমালোচনা শুনে প্রতিবাদ করেছি। এই প্রতিবাদের ফলে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি। অথচ যাঁর জন্য প্রতিবাদ করলাম সে ভাল সম্পর্ক রেখেছে।

ইতিমধ্যে আসামের বঙ্গীয় সমাজের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে আবার গৌহাটি গেলাম। গৌহাটির অনুষ্ঠান শেষ করে আবার যেতে হলো কোহিমার সঙ্গীত সম্মেলনে। এর পরে কোহিমা আর কখনও যাই নি। তারপর কাশী ফিরে এলাম।

কাশীতে আসার পরই, রবিশঙ্করের কাশীর বাহন দুবে আমার বাড়ীতে এসে জানাল আগামী সাতই এপ্রিল, কাশীর সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে রবিশঙ্করের পঞ্চদশতম জন্মবার্ষিকী খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালিত হবে। পণ্ডিতজী বলেছেন, 'আপনি যেন ছয় এপ্রিল তাঁর সঙ্গে তাঁর নূতন বাড়ী হেমাঙ্গিনিতে দেখা করেন। আপনার যাবার জন্য আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। এ ছাড়া সাতই এপ্রিল অনুষ্ঠানের দিন আপনি যেন অতি অবশ্য হাজির থাকেন। পঞ্চদশতম জন্মবার্ষিকীর জন্য একটা সুভ্যেনির ছাপা হবে। তার জন্য আপনাকে একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। জলসার আগে, জন্মদিন উপলক্ষে কাশীর প্রতিষ্ঠিত সকলেই পণ্ডিতজীকে মালা পরাবেন। অবশ্য মালা আমরাই দেব। আপনিও মালা পরালে আমরা খুশী হব।'

রবিশঙ্করের বাহন চলে যাবার পরই, দুটো চিঠি পেলাম। দিল্লী থেকে আমার এম.পি. বন্ধু একটা বাজনার অনুষ্ঠান ঠিক করেছে রবিশঙ্করের জন্মদিবসের ঠিক দুদিন পরে। এবং

আর একটা প্রোগ্রামের জন্য হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলন থেকে প্রতিবারের মত নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দ্বৈত অনুষ্ঠানের জন্য। এবারে দ্বৈত অনুষ্ঠানে ভি. জি. যোগের সঙ্গে বাজাবার জন্য লিখেছে। হরিদাস সঙ্গীত অনুষ্ঠান থেকে প্রতিবার অনুরোধ আসা সত্ত্বেও আমি কখনও দ্বৈত সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বাজাইনি, কেননা দ্বৈত অনুষ্ঠানের যে চলন আজকাল হয়েছে, তা আমি পছন্দ করি না। কারণ একগুরুর ছাত্র হলে ডুয়েট হতে পারে। কিন্তু দুজনে ভিন্ন গুরুর ছাত্র হলে, বাজনার ঢং আলাদা হওয়ার ফলে নিজের বাজনা ঠিক হয় না। যদিও আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পূর্বে কোলকাতাতে ভি.জি. যোগের সঙ্গে বাধ্য হয়ে একজনের অনুরোধে লায়েন্স ক্লাবে বাজিয়েছিলাম। সেই বাজনায় কেরামৎ খাঁ সঙ্গত করেছিল। আরো দুইবার ছাপরা এবং মোতিহারিতে সকলের অনুরোধে বাজিয়েছিলাম। প্রতিবার হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে ডুয়েট নাকচ করে দিই, কিন্তু এবার ব্রিজনারায়ণের বিশেষ অনুরোধে বাজাতে রাজী হয়ে চিঠি লিখে দিলাম।

চিঠি লেখবার পর মনে হোল, রবিশঙ্করের উপর একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। অবাক হয়ে ভাবি নিজের আত্মপ্রচারের জন্য কি ব্যাকুলতা। মৈহার ছাড়ার পর কত কিছুই তো দেখলাম। বাবার কাছে কখনও তো এ জিনিষ দেখি নি। মৈহার থাকাকালীন রবিশঙ্করের মধ্যেও দেখি নি। কিন্তু মৈহার ছাড়ার পরই বুঝলাম, আজকের যুগে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। কারণ সঙ্গীতটাও কিছুলোকের কৃপায় বাণিজ্য বস্তু হয়ে গিয়েছে যা আগে ছিলো না। কথায় আছে নিজেকে পেতে চাও যদি, সাহসে বুক বেঁধে দামী কিছু দাও। অর্থাৎ পিটচুলকানি। অন্যের পিট চুলকে আনন্দ দান করো, তাহলে অপর পক্ষও তোমার পিট চুলকে দেবে। কিন্তু সকলেই কি তা পারে? যারা পারে তারা ধাপে ধাপে চড়ে যায়, আর যারা পারে না তারা স্থির হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় বাবার কথা, পার্টি-পার্টি। না, এ আমার দ্বারায় সম্ভব নয়। মিথ্যা প্রশস্তি লিখতে বিবেকে লাগল। আত্মপ্রচারের জন্য এঁরা কেন এত ব্যস্ত। মৈহার ছাড়ার পর বহু রূপ দেখলাম।

ভাবলাম, প্রবন্ধ লিখতে হলে লিখতে হবে, সমুদ্রের উপরি ভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসারে প্রতিদান বলে যে একটা দায় আছে, আজকের যুগে প্রায় অচল। আজকের যুগে যতক্ষণ পারবে ততক্ষণই পেছনে ঘুরবে। পাওয়া ফুরলেই আর তাঁর টিকিটাও দেখা যাবে না। আজকের যুগে যে যত বড় হচ্ছে, তাঁর কাছে প্রতিদান শব্দটা ভুয়ো। এ সেন্টিমেন্টের কোন অর্থ নাই। কি বিচিত্র এই যুগের হাওয়া। নানা, এ কি আবোল তাবোল ভাবছি। যতই হোক নিজের ঘরের লোক, এ লেখা ঠিক হবে না। তাহলে কি লিখব? ভাবলাম নিজের লোককে তো সৎ পরামর্শ দেওয়াই ভালো। এই সবে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হবে, তার মধ্যে এত প্রচারের কি আছে? মনে পড়ল একটা চিঠির কথা। বাংলা ১৩৪৩, ২৫শে আশ্বিনে অর্থাৎ ইংরেজির ১৯৩৬ সনে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। স্যুভেনিরের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীটি দিয়ে রবিশঙ্করকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখলাম স্মরণ রাখবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—

তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের দুই তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়। তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নাই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্য রস সূত্রের নিমন্ত্রণ আজ রয়েছে উন্মুক্ত। অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যাঁরা গ্রহণ করতে আসেন তাঁরা নির্মম। তাঁরা কাল যা পেয়েছে তার জন্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রুকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয় আজ যে টুকু কম পড়েছে তা হিসাব করে। তাঁরা লোভী। তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা নিয়ে, নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে। তাঁরা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বপ্ন যা তাও বেশ।...

এটা জানা কথা যে পাঠকদের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান না দিলে পুরানো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। আকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিলেন সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলছিলো, তারপর তেল ফুরিয়েছে। অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি কেননা আলো জ্বালাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে কেবল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখন যাঁরা তাঁর অভিনন্দন করে তাঁরা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তাঁরা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তাঁরা শরতের আউসধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুশী হয় বলে মানুষটা এক ফসলা নয়।

নিন্দার কুগ্রহ থেকে পাশ কাটিয়ে যায়। জানব প্রশংসার দাম বেশী নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্য বাপ বা মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি, দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি, দুকড়ি যাঁরা, তাঁরা নিরাপদ।

অন্য লেখকরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন অতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়। এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

সাহিত্য উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়। কল্পনা শক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্য শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে।...

না, না, না এটা লেখা ঠিক হবে না। সকলেই এই লেখাটা পড়লে এর প্রতিক্রিয়া রবিশঙ্করের উপর পড়বে। অবশ্য এও ঠিক যে মিথ্যা করে রবিশঙ্করের গুনগান গাইব না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, বাবার উপর একটা প্রবন্ধ লিখব। নিয়ম অনুযায়ী যে হেতু রবিশঙ্করের পঞ্চদশতম জন্মবার্ষিকী হচ্ছে, প্রবন্ধটা তাঁর উপরই লেখা উচিত, কিন্তু সকলের

সঙ্গে আমার প্রভেদ কোথায়? ভাবলাম যে কারণে রবিশঙ্কর হয়েছে, সেই জন্য তাঁর গুরুর উপরই প্রবন্ধ লিখি। বহু চিন্তা করে ইংরেজিতে দু পাতার একটা ছোট প্রবন্ধ একটি শর্তে লিখে বললাম, রবিশঙ্করের বাহনকে, 'যা লিখেছি যথাযথ তাই ছাপাতে হবে।' আমার কথামত ঠিক ছাপিয়েছিল। প্রবন্ধের শীর্ষনাম দিয়েছিলাম 'হোআই সুড নট উই টেক এ লেসন ফ্রম দিস।' এই প্রবন্ধে বাবার কয়েকটা উপদেশ লিখে উপসংহারে লিখেছিলাম, 'আই হ্যাভ রিটিন দিস টু ইনসপায়ার দি ইয়ং স্টারস। মেনি এ্যামাংষ্ট আস আর গোয়িং এ্যাসট্রে। দি ইমপ্যাক্ট অফ দি ওয়েসটারন মিউজিক এ্যাণ্ড কালচার হ্যাজ নট বিন ভেরি হেলদি। ইফ নট চেকড ইন টাইম দিস এনসেন্ট সঙ্গীত অফ ইনডিয়া মাইট ভ্যানিস।'

দেখতে দেখতে রবিশঙ্করের জন্মদিন এসে গেল। একদিন আগে রবিশঙ্করের বাহন আমাকে গাড়ীতে করে রবিশঙ্করের নূতন বাড়ীতে নিয়ে গেল। শুনলাম বাইরে থেকে বহু লোক এসেছে। রবিশঙ্করের বাড়ী খুব বড় নয় কিন্তু লম্বায় চওড়ায় অনেক জায়গা আছে। কথায় কথায় রবিশঙ্কর বলল, 'শেষ জীবনে কাশীতে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত বিদ্যালয় করব। ছেলেদের থাকবার এবং খাবারের বন্দোবস্ত করব অর্থের বিনিময়ে।' ইতিমধ্যে রবিশঙ্করের স্তাবক এসে বলল, 'কমলা ভাবী বাজার করতে যাবে, তাঁর জন্য গাড়ীর দরকার।' কমলা নামটা ইতিমধ্যে লোকমুখে শুনেছি। লোক মুখে শুনেছি, তিনচারবছর একসঙ্গে রবিশঙ্করের সঙ্গে সব জায়গায় যায়। দেখতে দেখতে কমলা ঘরে ঢুকল। রবিশঙ্কর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমার পরিচয় দিল, 'বাবার ছাত্র।' কমলার পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমার বৌদি লক্ষ্মীশঙ্করের ছোট বোন।' বাড়ীতে লক্ষ্মীশঙ্কর এবং তাঁর স্বামী রাজেন্দ্র শঙ্কর, জগু সকলকেই দেখলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার সময় যে ভাবে ক-ম-লা বলে ডাকল, আমার কানে কেমন লাগল। কমলাকে বলল, 'ঠিক আছে গাড়ীটায় তুমি মারকেটিং করে এসো, যতীনের যাবার জন্য আমি অন্য গাড়ী ঠিক করে দেব।' প্রথমেই রবিশঙ্করকে বললাম, 'আগামী কাল আপনার জন্মদিন। প্রার্থনা করি দীর্ঘদিন আপনি বাজিয়ে বাবার সুনাম রাখুন। তবে আগেই বলে রাখি, আগামী কাল আপনার বাজনার শেষ অবধি থাকতে পারব না। কেননা আগামীকাল আপনার বাজনা যখন শেষ হবে, তার আগেই ভোরের ট্রেনে দিল্লী যাব মহন্তজীকে নিয়ে। অবশ্য আগামীকাল রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে মহন্তজীর গাড়ী করে বাজনা এবং জিনিষ পত্র গেটের বাইরে রাখব। ভোর চারটের সময় চলে যাব। সুতরাং আপনার বাজনার পর আর দেখা হবে না, তার জন্য মনে কিছু করবেন না।'

সব শুনে প্রসঙ্গ বদলে রবিশঙ্কর বলল, 'জান তো শুভ উপস্থিত বম্বেতে নেই।' এ কথা শুনে অবাক হলাম। বম্বেতে শুভ নাই কেন? কোথায় গেছে? আমার অবাক হওয়া দেখে রবিশঙ্কর খুব সহজভাবে বলল, 'এই কথাটা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। জানো তো অন্নপূর্ণা শেখাবার সময় খুব কড়া শাসন করে। আজকালকার ছেলে তো। এত কড়া শাসন সহ্য করতে না পেরে একদিন ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। ভাগ্যিস আমি সে সময় বম্বেতে ছিলাম তাই উপস্থিত শুভকে বম্বে থেকে সরিয়ে নিয়ে মাদ্রাজে রেখে এসেছি। পরে আমার সঙ্গে তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব।' এ কথা শুনে আমার

মাথাটা কিরকম হয়ে গেল। বললাম, 'শাসনে রাখেন ঠিকই, কিন্তু অন্য সময় তো খুব উদার। শুনেছি একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য শুভকে সিনেমা দেখতে পাঠান। তা ছাড়া মৈহার থেকেই আমি দেখে এসেছি অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে খুব কড়া শাসনে রাখলেও কোলকাতা এবং বম্বেতে শুভর প্রতি খুব উদার ব্যবহার করতেন। তবে এরকম কেন হোল?' রবিশঙ্কর বলল, 'যা হয়েছে তোমায় বললাম। বম্বে তো যাচ্ছ, গেলেই সব শুনতে পাবে।' বললাম, 'আমি বম্বে যাব আপনি জানলেন কি করে?' রবিশঙ্কর বলল, 'কাগজে দেখেছি।' এইখানে একটা কথা বলে রাখি রবিশঙ্কর বোধহয় ভারতে একমাত্র শিল্পী, যে সকলের খবর রাখে। অর্থাৎ কে কোথায় বাজাচ্ছে, কি রাগ বাজিয়েছে, কেমন বাজিয়েছে? এমন কি বহু শিল্পীর বাজান ক্যাসেট তাঁর লোকজন নিয়মিত সরবরাহ করে।

রবিশঙ্করের কথা শুনে বলেই ফেললাম, 'শুভ এত ভাল বাজাচ্ছিল যে একদিন সে বাবার প্রতিনিধিত্ব করতে পারত, অথচ এ কি অঘটন ঘটে গেল? এ যে আমি কল্পনাই করতে পারছি না।' রবিশঙ্কর বলল, 'এটা কি আমার কম দুঃখ? যাক যা হবার হয়েছে। বাই দা ওয়ে বিমান ও যোগ কোলকাতা থেকে আমার বাজনা শুনতে এসেছে। উঠেছে ক্লার্ক হোটেলে। তুমি আমার গাড়ীতে, বাড়ী যাবার সময় একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করে যাও।' আগামী কাল রবিশঙ্করের বাজনা তাই আর বিশেষ কথা বললাম না।

সোজা গাড়ীতে উঠে বসলাম। এ কি অবিশ্বাস্য কথা শুনলাম রবিশঙ্করের কাছে। এমন এক একটা ঘটনা জীবনে ঘটে, যখন মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা যুক্তি বিচার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায়। সমস্ত বিশ্বাস ধুলিসাৎ হয়ে যায় এক নিমেষে। যদি তা না হ'তো তা হলে মানুষ এমন অনিশ্চিতের দিকে দৌড়ত না। বাধা পেলে সেই বাধাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। হয়ত এই বাধা আছে বলেই বাধা থেকে মুক্তি পাবার এত আনন্দ। হতাশা আছে বলেই হয়ত মানুষ আশা করতে এত ভালবাসে। বেদনাই হয়ত আনন্দের পরমায়ু। সেই বেদনাই বোধ হয় এত পথ চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

আজকের যুগে রাষ্ট্রের সৌধ শিখরে পৌঁছবার উপায় দেখে অবাক হই। এ এক চরম কৌশল। যার ফলে সকলেই তাদের সমীহ করে। তাঁদের সেলাম করবার লোকের সীমা নাই। তারাই এ যুগে বেদ, পুরাণ, বাইবেল প্রবক্তা। তাঁরাই এ যুগে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত রচয়িতা। তাঁদের পুজো করলে ইষ্টলাভ হয়। সুতরাং তাঁদের ভজন করো। তাঁদের সেবা করো, তাঁদের সমীহ করো, তাঁদের সেলাম করো। তাঁদের পার্টিতে ঢোকো। তাঁদের হাঁতে, নাতে না করলে তবেই ভারতে এবং ভারতের বাইরে চরকির মত ঘুরে বাজাবার বা গাইবার সুযোগ পাবে। আর পার্টির মধ্যে না থাকলে? অবাক হয়ে ভাবি একুশটা বছরের মধ্যে পৃথিবীটা রাতারাতি কি ভাবে বদলে গেলো। এখন মানুষ সঙ্গীত নিয়ে ভাবতে চায় না। কি করলে টাকা উপার্জন করা যায় সেই দিকে সকলের লক্ষ্য। আসলে ব্যাপারটা কি? অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না। হঠাৎ গাড়ীটা হোটেলে ঢুকতে নিজেকে ফিরে পেলাম। ড্রাইভারকে রবিশঙ্কর বোধ হয় বলেই দিয়েছিলো, তাই ড্রাইভার সোজা ক্লার্ক হোটেলে গিয়ে গাড়ী দাঁড় করাল। বিমান ঘোষ ও ভি. জি. যোগের সঙ্গে

কিছুক্ষণ নানা কথার পর, বিমান ঘোষকে আলাদা ডেকে বললাম, 'শুভর বম্বেতে কি হয়েছিল জানেন?' বিমান ঘোষ বলল, 'কেন রবু তোমায় কিছু বলে নি?' বললাম, 'বলেছে তবে বিশ্বাস হচ্ছে না। আগামী কাল বাজনা আছে বলে বেশী কথা বললাম না।' বিমান ঘোষ বলল, 'আজ এই মাত্র কোলকাতা থেকে এসেছি, তুমি তো বম্বে যাচ্ছ, তখনই সব শুনতে পাবে।' এই কথা শুনে হঠাৎ রেগে গিয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে রবিশঙ্করের এত কাণ্ডের পরেও, কি করে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছেন? অবাক হচ্ছি এত কাণ্ড হবার পর কোলকাতা থেকে তাঁর বাজনা শুনতে এসেছেন?' হঠাৎ ভি জি যোগ আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, 'রবিজীকে যেন বলবেন না বম্বেতে আমরা ডুয়েট বাজাব। আগে আপনার সঙ্গে বাজিয়েছি বলে রবিজী আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অবশ্য যেহেতু বম্বেতে কথা দিয়েছি সেইজন্য অবশ্যই ডুয়েট বাজাব। তবে একটা অনুরোধ এ কথা যেন রবিজী জানতে না পারেন।' এ-কথা শুনে আমি অবাক হলাম না, কেননা আমার চেয়ে রবিশঙ্করকে কে বেশী চেনে? এ-কথাটা লেখা বোধ হয় আমার উচিত নয়, কেননা এই লেখা পড়লে রবিশঙ্কর এবং যোগ দুজনেই লজ্জায় পড়বে। কিন্তু যখন লিখতে বসেছি তখন সবই লিখব। আশা করি যোগ এ কথা ভুলে যান নি। আমি ভুলিনি কেননা এটা তো মনে রাখবার মতো কথা। তা ছাড়া আগেই লিখেছি আমার স্মৃতিশক্তিটা খুবই তীক্ষ্ণ।

যাক যা বলছিলাম। রবিশঙ্করের জন্মদিনে সাতই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় কাশীতে স্থানীয় সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে জন্মোৎসব পালিত হোল। নিজের সাধনার ক্ষতি হবে বলে দীর্ঘদিন আমি কোন জায়গায় প্রোগ্রাম শুনতে যাই না। এ ছাড়া আমার একটা সিদ্ধান্ত আছে। রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে গেলেও সামনের সোফার টিকিট কিনে, মহন্ত অমরনাথ মিশ্র এবং আমি গিয়েছি। এ যাবৎ পাশ পেলেও, কখনও কোথাও ফ্রি পাশ এ যাই নি। কেবল একবারই ব্যতিক্রম হয়েছিলো। রবিশঙ্করের বিশেষ আগ্রহে দুই বছর পরে প্রথম এবং শেষ, স্টেজে বসে বাজনা শুনতে হয়েছিল। যার মধ্যে রবিশঙ্কর কোলকাতায় স্টেজে বেশীর ভাগ শিল্পীকে নিয়ে বসিয়ে বাজয়েছিল যেমন করে থাকে। এর পরে বম্বেতে ছয় বৎসর পরে রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম। সে সময়ও বম্বের মস্ত বড় ব্যবসায়ী রাজা এল. পি. পিত্তির সঙ্গে টিকিট কেটেই বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম।

যাক এ তো অনেক পরের কথা। সাতই এপ্রিল যথাসময় রবিশঙ্করের প্রোগ্রামে উপস্থিত হলাম। রবিশঙ্করের বাহন আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এক একজনের নাম ধরে ডাকছে এবং সে গিয়ে রবিশঙ্করকে মালা পরাচ্ছে। আমি সোজা নিজের সোফাতে গিয়ে বসলাম। আমার কি মনে হোল, আমি স্টেজের কাছে গেলাম না এবং মালাও পরালাম না। কেননা জন্মদিন পালন করা কোনদিনই আমি পছন্দ করি না। পছন্দ না করার একটা কারণ ছিলো। কোন এক ইংরেজ সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম, ''আই ডু নট অবসারভ মাই বার্থ ডে বিকজ আই ডু নট ওয়ানট টু রিমেম্বার দ্যাট আই এ্যাম নিয়ারিং দি গ্রেভ।' এই কথাটা আমার মনে রেখাপাত করেছিলো বলেই, আমি কখনই জন্মদিন পালন করি না এবং কাউকে বলিও না। বাজনা রাত্রি দশটা থেকে শুরু হোল। সুভ্যেনির পেলাম।

বাজনার শেষে ভোরে যে মুহূর্তে ভৈরবী শুরু হোল সেই সময় ধীরে ধীরে উঠে মহন্তজী এবং আমি মোগলসরাই যাত্রা করলাম।

সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছে পরের দিন বাজালাম। দিল্লীতে বাজিয়েই প্লেনে একদিন পর বম্বে পৌঁছলাম। বম্বে যাবার বহু আগেই অন্নপূর্ণাদেবীকে লিখে দিয়েছিলাম, নির্দিষ্ট দিনে একটা সম্ভাব্য সময়ে দেখা করতে যাব। লিখবার একটা কারণ ছিলো। বম্বেতে অন্নপূর্ণাদেবী নিজের ছাত্র ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করেন না। অন্য কেউ গেলে কলিংবেল বাজালে দরজা খোলেন না। তবে আমি বরাবরই যাবার আগে জানিয়ে দিই, যার ফলে দরজা খোলেন। কেন দরজা খোলেন না সে কথা পরে যথাস্থানে লিখব। নির্দিষ্ট সময়ে বম্বে পৌঁছে প্রণাম করে বললাম, 'আগামী কাল যোগ-এর সঙ্গে ডুয়েট বাজাতে হবে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কিন্তু আজ কোন কথা বলব না কেননা মন খারাপ হয়ে যাবে। কাল রাত্রে বাজিয়ে পরশু দুপুর বেলায় আসব।' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'খেয়ে যান।' বাবার কথায় গুরু গৃহে খাওয়া মানে প্রসাদ পাওয়া। সেইজন্য যখনই বম্বে গিয়েছি প্রথমদিন প্রসাদ হিসেবে খাবার খাই, কেননা অন্নপূর্ণাদেবীও আমার গুরু। এখনও বর্ত্তমানে যখনই যাই সেই নিয়ম পালন করি এবং দুটো দিন যন্ত্র নিয়ে শিখতে যাই। রবিশঙ্করের সুভ্যেনিরটি দিয়ে বললাম, 'আমার লেখাটা পড়বেন।'

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। যাবার কিছুক্ষণ পরেই কলিং বেল বাজল। অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'দরজা খুলবেন না। দেখি কে এসেছে?' আই হোল দিয়ে দেখে, দরজা খুললেন, দেখলাম ভি. জি. যোগ এসেছে। ভি. জি. যোগ আসবার পর অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'যতীনবাবু গতকাল আপনার সঙ্গে কি রকম বাজিয়েছে?' উত্তরে যোগ বললেন, 'যতীনবাবু বাবার কাছে এত শিখেছেন, বাজনার ভাল মন্দর প্রশ্নই আসে না। খুবই ভাল বাজিয়েছেন তবে বাবার মত চামড়াতে ধা মারেন।' এ কথা শুনে বললাম, 'বাবার কাছে শিখেছি, চামড়াতে 'ধা' মারব না। এটা তো বাবার কাছে শেখা। তাছাড়া চামড়াতে যাতে না বাজাই, তার জন্য কি রবিশঙ্কর আপনাকে বলতে বলেছে?' আমার ব্যাঙ্গাত্মক কথা শুনে যোগ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'না, না আমিই ইয়ারকি করে বলেছি।' বললাম, 'রবিশঙ্কর আমাকে বলতে কখনও সাহস করে নি, কিন্তু আমার দুইজন পরিচিত সঙ্গীত শিল্পীকে দিয়ে এই কথা বলিয়েছে। যাঁদের দিয়ে বলিয়েছে, তাঁরাও আমার মেজাজ জানে, তাই তারা স্পষ্ট রবিশঙ্করের নাম দিয়েই বলেছে। আমার এই দুইজন পরিচিতই বলেছে, যে তাঁরা বলছে না। রবিশঙ্কর এই কথাটা বলতে বলেছে, চামড়ায় ধা দেওয়াটা বাবার শোভা পায়, আপনার শোভা পায় না।' ভি. জি. যোগকে আরো বললাম, 'পণ্ডিতজী তো আপনার ঘনিষ্ঠ লোক, কেননা তাঁর বাজনা শুনতে সুদূর কোলকাতা থেকে আপনি ও বিমান ঘোষ যখন কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন আপনাকে বলছি, রবিশঙ্করকে বলে দেবেন, 'সে যখন ঝালা শেষ করে 'ধা' টা তবলার বায়াঁর উপর জোরে স্টান্ট দেন সেটা কি? এ ছাড়া আল্লারাক্খার সঙ্গে নিজের ছবি দিয়ে যখন পোষ্টার লাগান, তার মধ্যে সেতার রেখে দুটো হাত দু দিকে করেন সেগুলো হাসির উদ্রেক করে। সেটাকে শোম্যানসিপ

ছাড়া আর কি বলা যায়? আমি তো এ সব করি না।' আমার বক্রোক্তি শুনে একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আরে, আপনি চটে গেছেন।' বললাম, 'আমি মোটেই চটি নি কেননা বাবা একটা কথা বরাবর বলতেন, 'মন তুমি বুঝ বড়, নিজের ছিদ্রের নাই পারাবার, পরের ছিদ্র তালাশ কর।' যদিও যোগ বাংলা বোঝেন তবুও এর হিন্দি অনুবাদ করে বললাম। এরপর বাবার আর একটা কথা বললাম, 'চালনি বলে ছুঁচকে তোর পুটকিতে কেন গর্ত্ত।' এই কথাটারও হিন্দি অনুবাদ করে বললাম।

এই কথা বলার সময় অন্নপূর্ণাদেবী চা করতে গিয়েছিলেন। যোগ সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'বাবার তুলনা নাই। এ সব, বড় জ্ঞানের কথা।' এ-কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম। অন্নপূর্ণাদেবী চা করতে করতে, কথাগুলি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। উনি চা নিয়ে এসে হেসে যোগাকে বললেন, 'যতীনবাবু বড় রাগী মেজাজের, এঁর সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।' যোগ বললেন, 'না, না বহিনজী, যতীনবাবু বাবার জ্ঞানের কথা, বড় ভাল কথা বলছিলেন। বহিনজী, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্য দুঃখ করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' অন্নপূর্ণাদেবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'ও সব কথা থাক। তবে বিমান ঘোষকে বলবেন, এত ঘটনার পরেও পণ্ডিতজীর বাজনা কি করে শুনতে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন?' এ কথা শুনে যোগ একেবারে চুপ। যোগ হয়ত রবিশঙ্করের হয়ে কিছু বলতে এসেছিলো, কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মুখে এই কথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। বললেন, 'আজই আমি কোলকাতায় চলে যাচ্ছি, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। পরে আবার বম্বে এলে দেখা করব।' আমি যোগকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললাম, 'আমি এখন একটু থাকব, পরে আবার দেখা হবে কোলকাতায়।' মনে মনে বুঝলাম, রবিশঙ্করের কাছে সব কথা শুনে যোগ এসেছিল বোঝাবার জন্য, কিন্তু এমন কথা শুনবেন আশা করেন নি।

যোগ চলে যাবার পর সরাসরি অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'রবিশঙ্করের কাছে শুনেছি শুভ চলে গেছে। যে কারণ শুনেছি তা আমি বিশ্বাস করি না। বলুন তো আসলে কি ব্যাপার?' আমার কথা শুনে বললেন, 'আপনি কি শুনেছেন আগে বলুন তো।' যা কাশীতে শুনেছিলাম সব বললাম। আমার সব কথ শুনে অন্নপূর্ণা সমস্ত ঘটনা বলে যখন শেষ করলেন, দেখলাম চোখে জল চিক চিক করছে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। অন্নপূর্ণাদেবীর মতো মেয়ে আর যাই করুক কাঁদে না কখনও। তবে আজকের চোখের জল দেখে মনে হোল একটু কাঁদলে বোধ হয় হালকা হবেন। কান্নাও একটা বড় পবিত্র সম্পদ। অশ্রু পাষাণ ধুয়ে দেয়, পাষাণ গলিয়ে দেয়, ছোট খাট দুঃখ, ব্যথাবেদনা, আশাহতাশাকে। এ সব পেরিয়ে যেতে পারার নামই তো জীবন। অনেককে দেখেছি কেঁদে নিজের মনটাকে হাল্কা করে, আবার অনেককে দেখেছি কাঁদতে পারে না। এও এক অভিশাপ। একটা শুকনো যন্ত্রণা সর্বদাই তাকে কুরে কুরে খায়। বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন। কিন্তু এই কান্নায় দাহ, দৃষ্টি নাই, দীপ্তি আছে। মাথার মধ্যে দাউ দাউ জ্বলছে যা, বাইরে তার প্রকাশ নেই।

দীর্ঘ দিন ধরে অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখছি। হাজার কষ্টের মধ্যেও কখনও চোখের আর্দ্রতা দেখিনি। যদিও মৈহারে অসতর্ক মুহূর্তে একবার চোখে জল দেখেছিলাম শুভকে মারার পর।

যতই হোক বাবারই তো মেয়ে। ভেতরে কোমল হলেও বাইরে তার প্রকাশ নাই। চোখের জল যখন বের হয়, তখন মনের ঘরের দরজাগুলো খুলে যায়। নইলে চোখের জল বেরোয় কি করে? আর হবে নাই বা কেন? মানুষ ভবিষ্যৎ-এর চিন্তা করে কত কিছুই করে। অন্নপূর্ণাদেবীর স্বপ্ন ছিল মনের মত করে শুভকে তৈরী করার। তৈরী করেও ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ভবিষ্যৎকে যে এভাবে টলিয়ে দেবে স্বপ্নেও কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিলেন। হায় রে মানুষ, আর হায় রে মানুষের সাধ, আহ্লাদ, বাসনা, কামনা। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'একজনকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করতে হলে, নিজের প্রাণটা দিতে হয়, তবে একটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এত কষ্ট করে শিক্ষা দিয়ে যদি সে তৈরী না হয়, তাহলেও তাঁরও দুর্ভাগ্য এবং যে শেখায় তাঁরও দুর্ভাগ্য।' অন্নপূর্ণাদেবীর কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। একে ছেলে, তারপর যাকে জীবনপাত করে শিক্ষা দিয়েছেন, তার যখন বাজাবার প্রায় সময় হয়েছে, সেই সময় পুত্রই হোক বা ছাত্রই হোক যদি চলে যায় তখন এতদিনের পরিশ্রম নষ্ট হলে কার না কষ্ট হবে? অন্নপূর্ণাদেবীর এই প্রথম চোখের আর্দ্রতা দেখে মনে হোল ছেলে বেঁচে থেকেও পুত্র শোকের থেকেও বড় আঘাত পেয়েছেন। কারও বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করেন না। অভিযোগ না করার ফলে ভেতরে কষ্ট জমে জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। আজ সেই পাথরে ফাটল ধরায়, চোখের আর্দ্রতা ক্ষণিকের জন্য ধরা পড়ে গেছে।

অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শুভর সমস্ত ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব অন্ধকার মনে হোল। কোথায় আমি, কে আমি কিছু মনেই রইলো না। কিছুক্ষণ পর মনে হোল, বাপ, ছেলে বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় দেখতে পেলো না পেছনে অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক অশ্রুপাতের বোঝা তাঁরা অন্নপূর্ণাদেবীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চলে গেলো। কিন্তু কাকে অন্নপূর্ণাদেবী বোঝাবে এ ত্যাগ নয়, এ তাঁর যন্ত্রণা। মনে হোল, অন্নপূর্ণাদেবীর পায়ের তলার মেঝেটা যেন টলছে। মনে হোল অতীতের সব জানা, সব দেখা, আবার না জানা, না দেখা হয়ে গেল। এমনি করেই হয়ত একটা সংসারের সব কিছু একদিন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এখন মনে হোল অন্নপূর্ণাদেবীর কেউ নাই। ছেলে সম্বল ছিলো, সেও চলে গেল। কে আর থাকবে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে, নির্জন এই এত বড় ফ্লাটে। পৃথিবীতে অন্নপূর্ণাদেবীর মত মেয়ের কাছে হয়ত কেউ থাকে না। কেউ পাশে থাকবার জন্য অন্নপূর্ণাদেবীর মত মেয়েদের হয়ত জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকবে তাহলে মানুষের মুক্তি কি করে আসবে? কি করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে?

নিজের মনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম সব কথা শুনবার পর। এরকম ঘটনা কি সম্ভব? চমক ভাঙ্গল অন্নপূর্ণাদেবীর কথায়। হেসে বললেন, 'পণ্ডিতজীর কাছে যা শুনেছেন সেইটা ঠিক মনে হয়েছে, না আমার কথাটা মিথ্যা বলে মনে হোল?' এত দুঃখের মধ্যেও অন্নপূর্ণাদেবীর হাসি দেখে মনে হোল সেটা ঠিক হাসি না। যেন কান্নারই আর এক রূপ। বাবার কথা মনে পড়ে গেল। হায় রে মানুষের আশা, আর হায় রে মানুষের স্বপ্ন। মানুষ কত আশা করেই না সংসার গড়ে, আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণভাবেই না সেই সংসার আবার ভাঙ্গে। কিন্তু বাবা কি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে একদিন তাঁর

আদরের কন্যা, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বম্বের একটা ফ্লাটে এক অন্ধকার ঘরে জীবন কাটাবে। কি বিচিত্র মানুষের নিয়তি।

অন্নপূর্ণাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'পণ্ডিতজীর সঙ্গে এতদিন সম্বন্ধ রেখেছি কেবল একটা মাত্র কারণেই। এবং সেই কারণটা হোল যদি আপনাদের সব ঠিক হয়ে যায়। এ বিষয়ে চেষ্টা করেছি এবং অদূর ভবিষ্যতে করবও বাবার মুখ চেয়ে, নইলে দীর্ঘ চোদ্দ বছর আগেই সব সম্বন্ধ ত্যাগ করতাম। বাবার কথা ভেবেই এখনও সম্বন্ধটা রেখেছি। পণ্ডিতজীর জন্য বাবার একবার স্ট্রোক হয়েছে, এর পর আবার যদি এই সব শোনেন তাহলে আর বাঁচবেন না। তাই শেষ চেষ্টা করব যাতে বাবার কানে এ সব না যায়। হাঁ, কথা হোল বিশ্বাস অবিশ্বাসের? রবিশঙ্করকে যেমন এককালে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালবাসতাম, ঠিক তার বিপরীত অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস করি বহু সত্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। যদি জিজ্ঞাসা করেন মনের এই পরিবর্তনের কারণ কি? তাহলে বলব, স্রেফ ডিডাকসান বাই কমনসেন্স।

বাবার একটা কথাই মনে পড়ছে। বাবার কাছে বহুবার শুনেছি 'পুত্রকে মূত্র জ্ঞান করবে, তাহলে মনে কোন কষ্ট পাবে না। বাবার সেই কথা ভেবেই একটা কথা বলতে পারি অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভাল। বর্ত্তমানকেই প্রাধান্য দেওয়া ভালো। কোন কিছুকেই গভীরে ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়। কোন জিনিষের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। যেখানে প্রত্যাশা সেখানেই হতাশার আঘাত। গতকাল আর আজই তো জীবন নয়। ভবিষ্যৎ তো এখন পড়ে আছে। তাঁকে ভুললে চলবে কি করে? আসলে কি জানেন, আজকের যুগে ভালবাসা জিনিষটা আর নাই। ভোগ বিলাস, স্বার্থ আর লোভে মানুষ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই যে ভাবে পারে সুযোগকে এক্সপ্লয়েট করাই মানুষের সবচেয়ে বড় আর্ট। যতদিন ভাল লাগলো, কাছে থাকল, তারপর নিজের রাস্তা দেখলো। কেউ কারো জন্য হাহাকার করে না। এই জাতীয় লোকেরাই আজকের যুগে নমস্য। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এতদিনে এইটি বুঝতে পেরেছি। যাক, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ভাববার কিছু নাই। যাক যা আপনার মনোমত নয় সে সব কথা আমি শুনতে চাই না।' উত্তরে করুণভাবে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আমার আর মন বলে কি কিছু আছে?' বললাম, 'আবার সেই কথা। আপনার সব কিছুই আছে। কিছুই হারায় নি। মিছে ভাবছেন আপনি। সঙ্গীতই আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। সঙ্গীত-এর মধ্যেই আপনি মনে শান্তি পাবেন এবং সুখী হবেন।' আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে যে কথা বললেন, সে কথা শুনে শুভর বম্বে থেকে চলে যাওয়ার আসল কারণটা কি বুঝলাম। এও কি সম্ভব? এই অসম্ভব সম্ভব হবার কারণ হোল বাবা। বাবা মেয়েকে সহিষ্ণুতার আদর্শে এমনই শিক্ষা দিয়েছিলেন যার জন্য স্বামী দেবতার বিরুদ্ধে কোনদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত? যাক যথাস্থানেই আসবে সে কথা। যাক যে কথা বলছিলাম। অন্নপূর্ণাদেবীর জন্য সম্ভব ছিলো কিন্তু যাঁরা চতুর তাঁদের জন্য অসম্ভব বলে কোন কথা তাঁদের অভিধানে নাই। কিন্তু চতুর লোকেরা বোঝে না সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করা কিছুদিন চলতে পারে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি। বুঝলাম কত পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে

অঘটন ঘটেছে। কিন্তু এই অঘটনের আগে একটা পটভূমি আছে। সেটা না বললে, শুভর চলে যাওয়াটা বোধগম্য হবে না। ঘটনার পটভূমিটা হোল অন্নপূর্ণাদেবীর কোলকাতা থেকে বম্বে গিয়ে পাভলোভা বাড়ীর ফ্লাটে যাবার কিছুদিন পর।

৫৪

কথায় আছে, পেট, প্রেম আর পাপের হিসেব রাখতে নাই। কতখানি খাবার খেলে কতটা পেট ভরবে, খাবার সময় এ কথা যে ভাবে তা হলে বুঝতে হবে তার শরীর খারাপ। জীবনে তার স্বাস্থ্য ভাল হবে না। হিসেব করে যে প্রেম করে সে রোগী। নিশ্চয়ই তাঁর রোগ আছে। পাপের কোন প্রকৃত অর্থ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। একদেশে মদ্যপান করাটা পাপ আর একদেশে সেটা হল পুণ্য। তাই এক যুগে যা 'ভারচু' অন্য যুগে তাই আবার 'ভাইস'। কিন্তু জীবন? মানুষ এবনরম্যাল না হলে যে ফ্লাটে নিজের স্ত্রী এবং ছেলে থাকে, সেই ফ্লাটের একটা ঘরে দুজন নর্মসহচারীকে নিয়ে কেউ থাকতে চায়? যার আত্মসম্মান এবং লোকনিন্দা আছে, সেই বলবে বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছা করো কিন্তু বাড়ীর পবিত্রতা ভঙ্গ কোরো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

একদিন দুই নর্মসহচরীর ঝগড়া চরমে ওঠে, যার ফলে রসিক প্রবরের জামা ছিড়ে একটা প্রহসন খাড়া হোল। রসিক প্রবর, বাড়ীতে পাহারা দেবার জন্য একজন ছাত্র অমিয় এবং একজন বন্ধুকে রেখেছিল। বন্ধুটি বিপদে রসিক প্রবরকে বহু বিপদ আপদে সাহায্য করেছিল। ইতিমধ্যে বাড়ীতে একদিন পুলিস হানা দিল। পুলিস আলমারির চাবি চাইল। অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আলমারির চাবি তো আমার কাছে থাকে না। এ ছাড়া আলমারিতে কি আছে তাও আমার জানা নেই। আলমারির চাবি ছেলের বাবার কাছেই থাকে।' পুলিস আলমারি ভেঙ্গে পারমিট ছাড়া কয়েক বোতল মদ পেল। নানা অশ্লীল বই এবং ফটো পাওয়া গেল। আইন অনুসারে বাড়ীর মালিককেই গ্রেপ্তার করা হবে। অন্নপূর্ণাদেবী যেহেতু ফ্লাটের মালিক সে হেতু তিনিই অপরাধী। তবে রবিশঙ্করের বন্ধুর কাছে অন্নপূর্ণাদেবীর বংশ পরিচয় আদি গুণাবলীর কথা শুনে পুলিস অন্নপূর্ণাদেবীকে নিষ্কৃতি দিলেন। এর পর এক নর্মসহচরী চলে গেলো এবং দ্বিতীয় নর্মসহচরী কোলকাতায় রবিশঙ্করের কাছে টেলিফোনে উল্টো খবর দিলো। বলল, 'অন্নপূর্ণা তোমার নামে দুর্নাম রটাবার জন্য এই কাণ্ড করেছে।' খবর পেয়েই রবিশঙ্কর শুভকে কোলকাতায় যেতে বলল। রবিশঙ্কর চিরকালই কানপাতলা। এত বুদ্ধিমান হয়েও, সে এতদিন ঘর করেও বুঝতে পারল না যে, এতদিন বাবার কথা স্মরণ করে নীরবে সব সহ্য করেছে, সে অন্ততঃ এ কাজ করতে পারে না। রবিশঙ্কর বম্বে ফিরে প্যাভলোভাতে না উঠে হোটেলে উঠল। অন্নপূর্ণাদেবী শুভকে নিয়ে প্যাভলোভার ফ্লাট ছেড়ে ওয়ারডেন রোডের নতুন ফ্লাট 'আকাশ গঙ্গায়' উঠে গেলেন। নূতন ফ্লাটে স্থানান্তরকরণের ব্যাপারে একজন কেউই সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। রবিশঙ্কর শুভকে ডেকে বলে দিল, 'তোমার মায়ের জন্য প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবো।' সেই ব্যবস্থাই চলতে লাগল। রবিশঙ্কর সর্বসমক্ষে কমলার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মত থাকতে লাগল।

এবারে দেখা গেল কাল বৈশাখী ঝড়ের ইঙ্গিত উনিশশো সত্তর সালে। উপস্থিত বাবার

শরীর ভালো নেই। বাবা নিয়েছেন বিছানায় আশ্রয়। আর বম্বেতে একজন নিয়েছে ছলনার আশ্রয়। এতক্ষণ তো লেগে গেল পটভূমি বোঝাতে। আমি যতই শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। আসল ঘটনা আমার কাছে এখনও স্বপ্নাতীত, বোধগম্যের বাইরে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মনে হোল অন্নপূর্ণাদেবী বোধহয় পুরানো দুঃখস্মৃতির রোমন্থন করছেন। বললেন, 'বছরের প্রথমেই পণ্ডিতজী একদিন শুভকে টেলিফোন করে বলল, 'শুভ, শুনছি তুমি নাকি খুব ভাল সেতার বাজাচ্ছ? তোমার মা যদি অনুমতি দেয় তাহলে একদিন আমার হোটেলে এসে বাজনা শুনিয়ে যাও।' এতটা বলার পর অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'এ কথা শুনে তখন আমি সরল ভাবেই শুভকে বললাম, 'তোমার বাবা যদি শুনতে চায় নিশ্চয়ই শোনাবে। শুভর তখন ঘড়ি দেখে এক ঘণ্টা সপাট তান এবং এক ঘণ্টা ঝালার রিয়াজ চলছে।' শুভ বাজাতে গেলো পণ্ডিতজীর হোটেলে তাঁর এক অনুচরের সঙ্গে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শুভ ফিরে এলো। শুভর আসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বাবা বাজনা শুনে কি বলল?' শুভকে খুব নিরুৎসাহী মনে হোল। শুভ বললো, 'বাবা বাজনা শুনে বললো, ' এ সব তো ভাল বাজনা শিখেছো। তবে এই বাজনা আজকাল কেউ নেবে না। তা ছাড়া সঙ্গীতের মধ্যে এখন খুব ষড়যন্ত্র চলছে। যে ভাবে তুমি মানুষ হয়েছো, এই ষড়যন্ত্র আর দলবাজীর যুগে তুমি টিকে থাকতে পারবে না। তার বদলে তুমি ছবি আঁকো এবং সেই লাইনটা তোমার পক্ষে ভাল।' শুভর কথা শুনে আমি তো অবাক। শুভকে বললাম, 'ঠিক আছে, আরো ছয়টা মাস তুমি আমার কথা মত বাজিয়ে বাইরে বাজাবে। যদি শ্রোতারা তোমার বাজনা পছন্দ না করে তা হলে ছেড়ে দিও।'

এর দুদিন পরেই পণ্ডিতজী আবার শুভকে সেতার নিয়ে যাবার জন্য ডাকলেন তাঁর হোটেলে। অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। যদি শুভকে একবার বাইরে বাজাতে দিতাম তাহলে সে বুঝতে পারত নিজে কেমন বাজায়। আসলে আমি চেয়েছিলাম শুভকে পুরানো প্রথায় সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়ে তারপর বাজাবার অনুমতি দেবো, যখন সে নিজেই নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার শুভকে যখন পণ্ডিতজী ডেকে পাঠালেন, তখন ভাবলাম বাপ ছেলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কি দরকার? তাই শুভকে বললাম, 'ঠিক আছে যাও।' শুভ সে দিনও গেল এবং তিন ঘণ্টা পরে এলো। শুভ আসবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কি হোল?' তখন শুভ বললো, 'বাবা জিজ্ঞেস করলো, সে দিনে যে কথাগুলো আমাকে বলেছিলো, তা তোমাকে বলেছি কিনা?' একথা শুনে বললাম, 'হাঁ বলেছি।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'আরে, আমি তোমাকে সে রকম ভাবে বলি নি। তুমি তো এত ভাল বাজাচ্ছ, কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে নোংরামী এসে গেছে বলেই তোমাকে এই লাইনে রাখতে চাই না। ঠিক আছে আমার সঙ্গে বাজাও বলে, বাবা সেতার নিয়ে বসলো।' বাবা বললো, 'এই রাগটির নাম তিলক শ্যাম। এটা আমার রচনা।' এই বলে বাবা আলাপ জোড়, ঝালা হয়ে যাবার পর এই ক্যাসেটটা দিয়ে বললো, 'এই ক্যাসেট শুনে গৎটা ঠিক কোরো।' আসবার আগে কমলা মাসীও বলল, 'তোমার বাবা তোমার ভালোর জন্যই বলছে। শখের জন্য সেতার বাজাও এবং প্রোফেসন হিসাবে পেন্টিংটাকে টেক আপ করো।'

শুভর সব কথা চুপ শুনে বললাম, 'ঠিক আছে, আর তোমার বাবার কাছে যাবার দরকার নেই সেতার নিয়ে।' প্রায় একমাস পরে, শুভকে চা নিয়ে ঘরে আওয়াজ করতে, প্রত্যেক দিনের মত দরজা খুললো না। একটা গোঙ্গানির আওয়াজ পেলাম। খুব জোরে ডাকলাম, অথচ ওদিকে শুভর গোঙ্গানির আওয়াজ বাড়তে লাগল। আমি ভয় পেয়ে লোক ডাকাডাকি করতে লাগলাম। লিফটম্যান সেই ডাক শুনতে পেয়ে ভেতরে এসে, কয়েকজন লোক ডেকে এনে দরজা ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করল। দরজা ভাঙ্গবার পর দেখলাম, অনেকগুলো ওষুধের বড়ি শুভর বিছানায় পড়ে আছে। শুভর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। শুভ কোনও রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'মা তুমি আমাকে এত কঠিন শাসনে রেখে রিয়াজ করাও তাই আমি স্লিপিং পিলস্ খেয়েছি। মরবার আগে এই টেলিফোন নম্বরে একবার বাবাকে ডেকে দাও।' টেলিফোনে খবর দেওয়া হোল। ওধার থেকে পণ্ডিতজীর আওয়াজ পেয়ে শুভ বলল, 'বাবা আমি মারা যাচ্ছি। একবার এসো, তোমাকে শেষবারের মত দেখব।' এ অবস্থা দেখে আমি তো পাথর, মুখে কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিতজী এসে আমাকে যে মুহূর্তে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?' দেখলাম হঠাৎ শুভ দাঁড়িয়ে উঠল। সুটকেসটা হাতে নিয়ে পণ্ডিতজীকে বললো, 'বাবা তুমি আমাকে নিয়ে চলো, নইলে আমি মরে যাব। মা আমাকে অত্যন্ত শাসনের মধ্যে রিয়াজ করায়, যার জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।'

এই কথা শুনেই আমার চোখের থেকে পরদা সরে গেল। সব বুঝতে পারলাম, কেননা পণ্ডিতজীর অভিনয় আমার থেকে আর কে বেশী বুঝবে? হঠাৎ পণ্ডিতজীর উপর রাগে ফেটে পড়ে বললাম, 'তুমি বলেছ শুভর বাজনা কেউ নেবে না? আসলে বাজনা শুনে তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে তোমার উপরে চড়ে বাজাবে। সেটা তুমি সহ্য করতে পারলে না। বাবা ঠিকই বলতেন, আগেকার কালে গুরুরা ছেলেকেও পুরো শেখাত না, কেননা যদি কখনও প্রয়োজন হয় তখন শেষ অস্ত্র ছাড়বে। তাই তাঁদের বলা হ'তো মিরাশি। এই কালে তোমাকেই মিরাশি দেখলাম। বাজনা শুনেই বুঝেছ, তোমার ছেলে তোমার উপর চড়ে বাজাবে। তাই তাঁকে ছেলেমানুষ পেয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে এই ঢং করবার কি দরকার ছিলো?' পণ্ডিতজী কাঁচুমাচু হয়ে আমাকে বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি এ সব বিষয়ে কিছু বলি নি।' এ কথা শুনে বললাম, 'চুপ করো, তোমাকে চিনতে আমার বাকী নাই।' এই বলার পরই শুভকে বললাম, 'তোর বাবার রক্তই তোর মধ্যে রয়েছে। তুই আর কি করে ভাল হতে পারবি? তোকে তোর বাবার থেকে আলাদা করে মানুষ করেছিলাম, পাছে তার প্রভাব পড়ে কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ যাবে কি করে? এতক্ষণ গোঙ্গাচ্ছিলি, আর তোর বাবাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালি। সুটকেসও গুছিয়ে রেখেছিস? ঠিক আছে, চলে যা তোর বাবার সঙ্গে, জীবনে আর আমার কাছে মুখ দেখাবি না।' এ কথা শুনে পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না, শুভর হয়ত মেনটালি ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছে। আমি কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি, পরে আবার তোমার কাছে শুভকে রেখে যাব।' সেই সময় বোধ হয় আমি আর পারছিলাম না। পণ্ডিতজীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'চিরদিন তোমার নাটক দেখেছি। আমি আর তোমাদের কাউরই মুখ দেখতে চাই না। ভুলে যেও না আমি কার মেয়ে? আমি মরব না।

হাঁ তোমার কাছে টাকা আমাকে নিতেই হবে। যদি আমার কাছে টাকা থাকত তাহলে তোমার টাকা ছুঁতাম না, কিন্তু স্ত্রীর অধিকারে ইচ্ছা হলে যা হয় দিও।' আমার কথা শুনে পণ্ডিতজী অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'তুমি অযথা আমাকে ভুল বুঝছ। আমি তোমাকে মাসে মাসে তিনহাজার টাকা পাঠিয়ে দেব এবং শুভকেও পরে পাঠিয়ে দেব।' এই বলেই শুভকে নিয়ে চলে গেল। এক নাগাড়ে সব কথা বলতে বলতে অন্নপূর্ণাদেবীর গলা ভারী হয়ে গেল।

জানি না সব বীজে একরকমের গাছ হয় না। শুধু তাই নয়, সব মাটিতেও এক বীজে এক রকমের ফলও ধরে না। মাটির গুণের তারতম্যের জন্য ফলের গুণেরও হের ফের হয়। রবিশঙ্কর বুঝতে পারে নি যে তাঁর চালাকি ধরা পড়ে যাবে। চিরকাল যাঁকে বোকা সরল ভেবেছে, তাঁর কাছে যে নিজে বোকা বনে যাবে ভাবতে পারে নি। তা সত্ত্বেও কোমল স্বরে অবাক হবার ভান দেখিয়েছে। অবাক হয়ে ভাবলাম, রবিশঙ্কর এত চতুর হয়েও কেন এই ভুল করলো? মানুষ তো কোন ছার। বন্যপ্রাণীর সাধারণ একটা বিড়াল প্রসব করবার পর নিজের সন্তানকে কি রকমভাবে পাহারা দেয়? সেই রকম তার কাছে কেউ গেলেই বিড়াল বাঘের মত ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বুঝলাম এখানেও তাই হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম অন্নপূর্ণাদেবীর চোখে জল। তবে আজ চোখের জল দেখে মনে হোল, একটু কাঁদলে বোধহয় হাল্কা হবেন। চোখের আর্দ্রতা দেখে মনে হলো যাঁকে তিল তিল করে নিজের রক্ত দিয়ে গড়েছেন, সে যখন পর হয়ে গেল তখন বুক ভেঙে চোখ থেকে জল তো পড়বেই। মনে হোল রবিশঙ্কর এবং শুভ একদিন বুঝবে যারা নিজের ঘরকে অস্বীকার করলো ভবিষ্যৎ কখনও তাঁদের ক্ষমা করবে না।

ঝড় চলে যায় কিন্তু পৃথিবীর বুকে সে চিহ্ন নিশ্চয়ই রেখে যায়। রবিশঙ্কর ছেলেকে নিয়ে চলে যাক কিন্তু রবিশঙ্কর যে চিহ্ন বুকে রেখে গেল, তার জন্য একদিন তার অনুতাপ হবে। যে ছেলের জন্য সে গৌরবান্বিত হতে পারতো, তা থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে।

এক মহামনীষীর উক্তি আমার মনে পড়লো—

হোয়েনএভার গড ইরেকটস এ-হাউস অফ প্রেয়ার
দি ডেভিল অলওয়েজ বিলডস এ-চ্যাপেল দেয়ার
এণ্ড ইট উইল বি ফাউণ্ড আপঅন এক্সামিনেশন
দি লেটার হ্যাজ দি লারজেসট কনগ্রিগেশন।

আজকের যুগে কি কেউ এ ধরনের ঘটনা উপন্যাসে পড়েছে? বাপ হয়ে ছেলেকে প্রথমেই মাদ্রাজে নিয়ে গেছে। যে ছেলে মা ছাড়া কোন মেয়ের সংস্পর্শে আসে নি, রবিশঙ্কর সেই ছেলেকে নিয়ে সেখানে সুইমিং পুল-এ সাঁতার শেখাচ্ছে মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেকে আলট্রা মডার্ন তৈরী করছেন। শুভর চলে যাবার খবর পেয়ে, ধ্যানেশ তাঁর এক বন্ধুকে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে রেখে গেছে কেননা এত বড় ফ্লাটে তাঁর পিসিমা একলা কি করে থাকবে?

সব কথা শোনার পর আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার বিস্ময় ভাঙ্গবার আগেই অন্নপূর্ণাদেবী নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন হয়ে যাবার পর

বললাম, 'টাকা ঠিকমত পাচ্ছেন?' উত্তরে বললেন, 'এই বাড়ীর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এডভোকেট বাটলিওয়ালার অফিস আছে। তাঁর আবার নিজস্ব সঙ্গীতের একটা সংস্থান আছে। তাঁরই মারফৎ মাসোহারা টাকা পাঠাচ্ছেন যবে থেকে আকাশগঙ্গার ফ্লাটে এসেছি। এই মাসের প্রথমেই তাঁর মারফৎ টাকা পেয়েছি। রবিশঙ্করের দীর্ঘদিন এই ফ্লাটে না আসার কারণ বুঝলাম। এ যাবৎ দেখে আসছি, যা করবে তার পরিকল্পনা পাঁচ বছর আগে থেকে করে রাখে। মৈহার ছাড়ার একবছর পর থেকে, আজ চৌদ্দবছরের সব ঘটনা ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইতিমধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল। বললাম, 'দেখুন কে টেলিফোন করছে?' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'টেলিফোন এলে আমি কখনই ওঠাই না। কত কিছু কলকাঠি নাড়ছে যাতে আমি আত্মহত্যা করে মরে যাই। কিন্তু বাবার কথা ভেবে আমি তো মরতে পারব না।' অবাক হলাম। হীন চক্রান্তেরও একটা সীমা আছে। এর পর আরো যে সব শুনলাম তা আর লিখতে নিজেরই সঙ্কোচ হচ্ছে। সব কথা শুনে আমার একটা কথাই মনে হোল, কানে শোনা আর চোখে দেখার মধ্যে অনেক তফাৎ। সবচেয়ে বেশী আঘাত আসে, মানুষের সব থেকে আপনজনেরা অন্যের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থবুদ্ধি, হীন মনোবৃত্তিতে রাগ হয়, আক্রোশ আসে, বিরক্তি আসে। কিন্তু আপনজনের হৃদয়হীনতাই ক্ষত সৃষ্টি করে। মানুষকে বিশ্বাস করে যিনি বাঁচতে চান, অমানুষরাই শুধু পারে তাঁকে হত্যা করতে কেননা আমার জীবনে এমন এক সঙ্গীতজ্ঞকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, যার উপাধি দিয়েছি সঙ্গীতের প্রতারক। সে দেখায় ঈশ্বরের উপাসক, সঙ্গীতেই প্রাণটা অর্পণ করেছে এমনি ভাব, কিন্তু টাকা তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নাই। তাই তাঁর উপাধি দিয়েছি সঙ্গীতের প্রতারক। অবশ্য সে সঙ্গীতের যে যে ডিগ্রি পেয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। নাম, যশ, অর্থ, সম্মান, সবই পেয়েছে। কিন্তু কি ভাবে পেয়েছে? বাবার ভাষায় এরই নাম বোধ হয় পার্টি, পার্টি, পার্টি। রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর এই কাহিনী, ভালোবাসার কাহিনী না প্রতিশোধের কাহিনী। না নিছক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কাহিনী। তাও বুঝতে পারি নি। এখনও বুঝি না। কাহিনী যেমন ঘটে ছিল সেইরকম লিখে গেলাম।

অন্নপূর্ণাদেবী চা করে আনলেন। ইতিমধ্যে কলিংবেলের আওয়াজ হোল। 'আইহোল' দিয়ে দেখে অন্নপূর্ণাদেবী দরজা খুলে দিলেন। দেখলাম একটা ছেলে এল। ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হোল ধ্যানেশের বন্ধু। আমার কাছে থাকে এবং একটা চাকরি করে। ছেলেটিকে দেখে মনে সান্ত্বনা পেলাম। কিছু বিপদ আপদ হলে তো ছেলেটি দেখতে পারবে। চা খেয়ে বললাম, 'আজ যাচ্ছি। আগামীকাল আসব।' লল্লার বাড়ীতে যাবার জন্য টাক্সিতে উঠলাম।

মনটা আমার অজান্তেই অন্য দিকে মোড় ঘুরছে। ব্যাপারটা এরকম ঘটলো কেন? এক দুঃখদ কাহিনী, অন্য পটভূমিকা, অন্যই জগৎ। বাবা দিব্যি দিয়েছেন তাঁর জীবনের সব সত্য কথা লিখতে। যে ঘটনার কথা এতক্ষণ ধরে শুনলাম, সেটা তো বইএর জন্য মস্তবড় উপাদান। কিন্তু এ কথা কি করে লিখবো? কত কিছুই তো দেখলাম। যশ, অর্থ, সম্মান, অনেককেই পেতে দেখেছি। সব পেয়েও কিন্তু তাঁরা জীবনের কাজে লাগাতে পারে নি। তার

চেয়েও মূল্যবান হোল শান্তি। বাবা এ সব কথা শুনলে সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যে এর থেকে কি বেশী আশা, বেশী আনন্দ? একজনে বাবার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যারা চক্রান্ত করেছে, তারা জানে বাবার শরীরের কথা। বাবা এখন নামেই বেঁচে আছেন। মাঝে মাঝে স্মরণশক্তি থাকে, আবার পরমুহূর্তেই শরীরের সকল কলকব্জা বিকল হয়ে যায়। বাবা যদি শক্ত সমর্থ থাকতেন তা হলে কি অঘটন ঘটতে পারত? চতুর পণ্ডিত সব আট ঘাট বেঁধেই কাজ করেছে, কারণ সে সর্বদাই বড় হবার স্বপ্ন দেখেছে। বড় না হতে পারলে তো জীবনটাই ব্যর্থ। দৌড়ে ফার্স্ট না হলে বেঁচে থাকার কি লাভ? চিরকালই এই হোল তাঁর জীবন দর্শন। যেন তেন প্রকারেণ লোকের কাছে চর্চার বস্তু হতে হবে। বম্বেতে এসে এবার এক নূতন অভিজ্ঞতা হোল। মনে হোল এখানে টাকা, টাকা নয়, যৌবন, যৌবন নয়, হয়ত জীবনও জীবন নয়। সেই প্রথম যা দেখেছিলাম, আজও তাই, কোন পরিবর্তন নেই। যেমন প্রথমে দেখেছি, আজও সেইরকম দেখছি।

যতই কাজ থাক, একটা জিনিষ দিনরাত আমার পেছনে তাড়া করছে শয়নে স্বপনে। সে কাজটা হচ্ছে কোন রকমে বাবার আজ্ঞায় বইটা লিখে বাবাকে উপহার দেওয়া। কিন্তু এ কাজ তো বহু সময় লাগবে। বাবার ইতিবৃত্ত যদি দেখা যায়, তা ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সেই ইতিহাস তো ভুল তথ্যে ভরা। সেই ভুল তথ্যে ভরাকে, সাকার দেবার চেষ্টা করতে হবে, যার দ্বারায় ইতিহাসে, ভবিষ্যৎ এ যেন ভুল ইতিবৃত্ত প্রবেশ না করে, কারণ ইতিবৃত্ত ইতিহাস নয়।

যাত্রার শুরুতে যে চিন্তা নিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে পাড়ি জমিয়েছিলাম, শেষটুকু যে এমন হবে ভাবি নি। দেখতে দেখতে লল্লার বাড়ী এসে পৌঁছে গেলাম। বাড়ীতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে গর্গ জিজ্ঞাসা করল, 'মাতাজীর বাড়ী গিয়ে সব শুনলে?' বললাম, 'তুমি সব জানতে অথচ আমি বম্বেতে তিন দিন আসা সত্ত্বেও কিছু বল নি?' গর্গ বলল, 'তুমি বাজাতে এসেছ, এ সব শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে বলে এ সব কথা বলি নি। তুমি তো জান আমি দুপুরবেলায় ঘুম থেকে উঠি। আজ আমার ওঠার আগেই তুমি চলে গিয়েছিলে বলে বলতে পারি নি।' এই কথা বলার পর আমাকে বলল, 'তুমি যে ঘরে রয়েছ তার কোন পরিবর্তন দেখো নি?' আমার অবাক হওয়া মুখ দেখে বলল, 'আমার ঘরে পণ্ডিতজীর একটা বড়ো ফটো রেখেছিলাম, যে হেতু আমার গুরু। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' দেখলাম সত্যই তো ঘরে যেখানে ফটোটা ছিলো সে ফটোটা নাই। এর পর লল্লার কাছে আরো ঘটনা শুনলাম। লল্লা শুভকে খুব ভালবাসত।

লল্লা যদিও খুব মেপে, অল্পের মধ্যে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, তবুও শুভর সঙ্গে ওর হৃদ্যতা ছিল। শুভর কথা ওঠাতে লল্লা বলল, 'অবাক হয়ে যাই, এত ভাল বাজাচ্ছিল, অথচ পরের কুমন্ত্রণায়, শুভ যার বয়স প্রায় আঠাশ হতে চলল, নিজে বুঝতে পারল না সে কি রকম বাজাচ্ছে? মনে হয় শুভকে কেউ যাদুটোনা করেছিলো।' রাত্রে লল্লার সঙ্গে, বাবার উপরে বই লিখবার যে আজ্ঞা পেয়েছি সেই সব বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা হোল। যতই হোক লল্লা এ যাবৎ বহু বই সঙ্গীতের উপর লিখেছে এবং ছোট বয়স থেকে সঙ্গীত পত্রিকার

সঙ্গে জড়িত, সেইজন্য বই লেখার ব্যাপারে অনেক কথা বলল। চিরকাল বই পড়েছি কিন্তু এই বই লিখে বেরোবার আগে কত জিনিষের দরকার হয় তা জানা ছিলো না। অনেক তথ্য জানলাম।

উপস্থিত বেশ কিছুদিন হোল লল্লা অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে বাজনা শেখে। রাত্রে বাজায় এবং তারপর প্রায় সকাল অবধি সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করে। পাশের ঘরে লল্লার বাজনা শুনতে পেলাম। বাজনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাজনা বন্ধ হবার পর, রাত্রে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এখনও কত লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বইটা যে দিন ছেপে বেরোবে সেইদিন বাবার হাতে দিতে পারবো তো? নানা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরের দিন দুপুরে আবার অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। কে বলবে এত বড় ঝড় বয়ে গেছে এই ফ্লাটে। গতকাল যা দেখেছিলাম তার নাম গন্ধও নেই। যতই হোক বাবার মেয়ে তো। নিজের মনে সঙ্কোচ হচ্ছে অথচ অন্নপূর্ণাদেবীকে সেই আগের মতই দেখলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম কত বড় মনের জোর। অন্য কোন মেয়ে হলে, সেই পুরানো কাসুন্দিই ঘাঁটতেন, কিন্তু সে ধার দিয়েও গেলেন না। আমিও সেই প্রসঙ্গ না উঠিয়ে, প্রথমেই বাবার গুরুদক্ষিণার কথা বললাম। তারপর বাবার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পত্র পত্রিকা যোগাড় করবার কথাও বললাম। সব কথা বলার পর বললাম, ‘এ যৎসামান্য ছাড়া বাবার সঙ্গে যাঁদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল, যতটা আমি জানি ইতিমধ্যে তাঁদের ইন্টারভিউ নিয়েছি এবং আশা করি কোলকাতায় গিয়ে সবচেয়ে বেশী বিষয়বস্তু পাব। এই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে, আমাকে দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, কটক, বম্বে, রামপুর এবং কাশী প্রভৃতি জায়গাগুলোতে আগে যেতে হবে, কারণ এই সব জায়গায় বাবা গান বাজনার সূত্রে অনেকবার গিয়েছেন।’ অন্নপূর্ণাদেবী চুপ করে আমার কথা শুনলেন। মনে মনে স্থির করলাম, এখন অন্নপূর্ণাদেবীর মনের অবস্থা ভাল নয় বলে পরের বারে বম্বে এলে সাক্ষাৎকার নেবো।

ট্যাক্সিতে চড়ে লল্লার বাড়ীতে যেতে যেতে মনে হোল, মানুষের সবটা দেখা যায় না। বাইরে থেকে যা দেখা যায় সেটা আসল রূপ নয়। কি বিচিত্র মানুষ, আর কী বিচিত্র মানুষের জীবন। প্রত্যেক মানুষই ভাল মন্দের মিশ্রণে তৈরী, এটা ভুললে চলবে না। কোনটা অভিনয়, কোনটা অভিনয় নয়, সেটা ধরতে পারার মত চোখ কি সকলের থাকে? কোন মানুষই পারফেকসানের শেষ বিন্দুতে পৌঁছতে পারে না। ভালো মন্দ নিয়ে একটা গোটা মানুষ তৈরী হয়। কিন্তু বাবার এত সান্নিধ্য পেয়েও এরকম কেন হোল? ভুল থেকে জন্ম নেয় সমস্যা। সমস্যা সৃষ্টি করে জটিলতা। জটিলতা ফিরেয়ে নিয়ে যায় আবার সেই ভুলের উৎস মুখে। এখানেও তাই হয়েছে।

ভালো সন্তান পাওয়া মানুষের একটা সৌভাগ্য। কারণ সন্তানই তো মানুষের শেষ বয়সের নির্ভরতা। শেষ বয়সের সান্ত্বনা। শেষ বয়সের আশ্রয়স্থল। তা শেষ বয়সের সেই আশ্রয় স্থল সন্তান নিয়ে কি এমন দুর্বিপাক হোল, যে শুভকে তার মায়ের আশ্রয় ছাড়তে

হয়েছে। সে তো ছেলেমানুষ নয়। বাবার সব কিছু জেনেও, বাপের সঙ্গে চলে গেল? এ আমার কাছে বিস্ময়।

আশ্চর্য! সংসারে এক একজনকে অকারণে ভালো লাগে, আবার অকারণে খারাপ লাগে। সংসারে ভালো লাগা আর খারাপ লাগার মধ্যে ফাঁকটা বোধ হয় খুবই সামান্য। সেইজন্য বোধ হয় একজনের ভাললাগার সঙ্গে আর একজনের খারাপ লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখন মনে হয়, মানুষের জীবনে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তিই এত সহজে হয় না। আসলে মানুষের জীবনে সমস্যাটা প্রথমে ছোট হয়েই উদয় হয় বটে, কিন্তু তারপর তাকে বাড়তে দিলে তা আর ছোট থাকে না।

বাইরের বয়সটাই বুঝি সব? মনের বয়সটা? কত ঝড় ঝাপটা যে জীবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতো এতদিনে। মনে হয়, অন্নপূর্ণাদেবী যে বেঁচে আছেন জীবনের শেষটা দেখবেন বলে। তা সে যতই দুঃখের হোক আর যত কষ্টেরই হোক। দেখি ভাগ্য কোন ঘাটে নিয়ে তোলে। এখনই এত মুষড়ে পড়লে চলে? এখনও যে অনেক বাকী। এখন অনেক দূরে যেতে হবে। আর জীবনটা শুধু সুখের যারা মনে করে তাদের কথা আলাদা। আবার যাঁরা মনে করে, তাঁদের কথাও আলাদা কিন্তু আসলে জীবনটা যত দুঃখের ততই মধুর। দুঃখের মধ্যে দিয়েই সুখকে খুঁজে বার করে নিতে হবে। তা না করলে যে উপায় নাই।

অবাক হয়ে ভাবি আজকের যুগে আসল আর নকল চেনা কঠিন। সকলেই নিজেকে ভালবাসে। তা সত্ত্বেও অনেকে আছেন যাঁরা আন্তরিকভাবে অন্যকে ভালবাসে, তাঁদের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক নিজের আরাম চায় বলে ভালবাসার ভান করে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের কাছে ভালো সাজে। আসলে ভেতরে ভেতরে তারা হোল নীচ, হীন, পশু। কিন্তু এই পশুদের ভালবাসার ভান দেখে সাধারণ লোক বুঝতে পারে না।

সব মানুষেরই একটা না একটা অবলম্বন থাকে। সেই অবলম্বনটাই হোল সম্পদ। সেই অবলম্বনটা আঁকড়ে মানুষ বেঁচে থাকে। সে সম্পদ তাঁর একার, তাঁর একান্ত নিজের। সেই সামান্য অবলম্বনটা হারিয়ে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? এ কথা কেউ বুঝলো না।

হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষাতে বুঝলাম লল্লার বাড়ীতে এসে গেছি। বাড়ীতে গিয়েই শুয়ে পড়লাম। অলস চিন্তাগুলো আমার মনটা কুরে কুরে খাচ্ছে। এতদিন জানা ছিলো, প্রেম এবং ত্যাগ দুটো আলাদা জিনিস নয়। প্রেমহীন ত্যাগ যেমন হয় না, তেমনি ত্যাগহীন প্রেমও হওয়ার নয়। ত্যাগ মানেই প্রেম আর প্রেম মানেই ত্যাগ। কিন্তু কি দেখলাম? আজ এই পৃথিবীর সংসার থেকে প্রেম আর ত্যাগ দুটো জিনিষই উঠে গেছে। এখনকার সংসারে ও দুটো জিনিষকে তাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যাখ্যা করলে আজকের লোকে উন্মাদ বলবে। দুঃখ হয় ভেবে এ কথা জীবনের শেষে এসেও কেন বুঝতে পারল না, যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকে টানে, নিজের অহঙ্কারকেই জয়ী করবার জন্য ব্যস্ত, সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না। প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

পরের দিন সকালেই কাশী যাত্রা করলাম। কাশীতে এসেই মৈহার থেকে দীপচন্দ জৈন এর চিঠি এসেছে। দীপচন্দ জৈন প্রতিবছর সকলের কাছে চাঁদা সংগ্রহ করে বিনা টিকিটে বাবার নামে সঙ্গীত সমারোহ করে। দীপচন্দ লিখেছে, 'এবারে উনিশে এপ্রিলে পদ্মভূষণ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীত সমারোহ তিনদিন হবে। এবারেও সমারোহে আলিআকবর কোলকাতা থেকে সব শিল্পীদের নিয়ে আসবে। আপনাকেও এই সমারোহে বাজাতে হবে। আপনার সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য যদি কাউকে উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তাঁকে আনতে পারেন।' সঙ্গতের জন্য সঙ্কটমোচনের অমরনাথ মিশ্রকে নিয়ে গেলাম। মৃদঙ্গের সঙ্গে সঙ্গত একটা নূতন জিনিষ হবে বলেই, কয়েকদিন পরেই মৈহার গেলাম। মৈহারে গিয়ে বন্ধু অরুণের বাড়ী গিয়ে উঠলাম। অমরনাথ মিশ্রের গেস্ট হাউসে করে দিলাম। অনেকের কাছে শুনলাম মৈহারের রাজকুমারকে যে হেতু প্রেসিডেন্ট করা হয় নি, তাই সে কোর্ট থেকে আদেশ নিয়ে অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে, কারণ ছেলেদের পরীক্ষার ব্যাঘাত হবে। সকলেই চেষ্টা করছে কি করে রাজকুমারকে দিয়ে মামলাটা উঠিয়ে নেওয়া যায়। আসলে দীপচন্দ জৈন বরাবরই বাবার নামে এই সমারোহ করে অথচ রাজকুমারকে দিয়ে উদঘাটন করায় না বলেই রাগের চোটে অনুষ্ঠান স্থগিত করিয়েছে। এ কথা শুনে অবাক হলাম।

এ কি জঘন্য দলাদলি। পরের দিন সকালে বাবার কাছে গেলাম। দেখলাম চুপচাপ বারান্দায় শুয়ে আছেন। দেখলাম আলিআকবরকে। আলিআকবরের কাছে গিয়ে যখন রাজকুমারের ব্যাপারটা জানতে পারলাম তখনই বললাম, 'চলুন আমার সঙ্গে রাজকুমারের কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। তা ছাড়া রাজকুমার তো আপনাকে ছোটবেলা থেকে চেনে।' আলিআকবরের গাড়ীতে রাজকুমারের বাড়ী গেলাম। আমাদের সঙ্গে ধ্যানেশ ও নিখিলও গেল। রাজকুমার আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। রাজকুমার আলিআকবরকে দেখেই বললেন, 'সেই ছোটবেলায় দেখেছি এবং একসঙ্গে খেলাও করেছি, আর আজ এতদিন পরে দেখছি।' আমি বললাম, 'সেইজন্য বাবার নামে সমারোহটা বন্ধ করেছেন।' আমার কথা শুনে রাজকুমার থতমত খেয়ে বললেন, 'আসলে তিনদিন সারারাত গান বাজনা হোলে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য পড়ায় অসুবিধা হবে। সামনেই তো পরীক্ষা। এ ছাড়া বাবার নামে এত বড় সমারোহ হয় অথচ দীপচন্দ আমাকে ডাকে না।' বললাম, 'এই সমারোহ করাটা তো আপনারই কাজ। দীপচন্দ ভুল করতে পারে কিন্তু বাবার কথা ভেবে আপনারই সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসা উচিত। এ ছাড়া প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ মানুষের কাছে আসে, তারপর প্রয়োজনের মেলামেশার মধ্যেই ভালবাসা শুরু হয়। আপনি রাজবাড়ী থেকে বেরোন না, আর দীপচন্দ ব্যবসার খাতিরে দোকান থেকে বেরোতে পারে না। তা সত্ত্বেও নিজের ব্যবসার ক্ষতি করেও এত বড় আয়োজন করে। হতে পারে তাঁর ভুল হয়েছে, কিন্তু জানেন সংস্কৃতে একটা কথা আছে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা উচিৎ নয়। যা হোক আমি কথা দিচ্ছি, আপনি সভাপতিত্ব করবেন এবং আজ সকালেই কোর্ট থেকে কেসটা উঠিয়ে নিন।' অনেক কথার পর রাজকুমার বললেন, 'ছাত্রদের কথা ভেবে, ভোর সাড়ে চারটের মধ্যেই সম্মেলন কিন্তু শেষ করতে হবে।' বললাম, 'ঠিক আছে তাই হবে।' আলিআকবর, ধ্যানেশ এবং নিখিল চুপ করে আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। এর পর রাজকুমার চায়ের কথা বলল। বললাম, 'এই সময় চায়ের দরকার নাই, এখন অনেক কাজ। সমারোহ শেষ হবার পর এসে একদিন চা খাব।' রাজকুমার তখন আলিআকবরকে বললেন, 'সমারোহের পর একদিন আসবেন এবং প্রাতঃরাশে যোগ দেবেন। সে দিন আমার বাবার নিজের গলায় গাওয়া রেকর্ড আপনাদের বাজিয়ে শোনাব।' আমার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল মহারাজ কি রকম গাইতেন জানবার জন্য, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'নিশ্চয়ই সম্মেলনের পর আলিআকবরকে নিয়ে আসব এবং মহারাজের গানের রেকর্ডও শুনব।' সব ঠিক করে চলে এলাম। ফিরবার পথে আলিআকবরকে বললাম, 'রাজকুমারের সঙ্গে আপনার ছোট থেকে আলাপ অথচ একটা কথাও বলতে পারলেন না।' আলিআকবর বলল, 'আসলে কি জান ছোটবেলা থেকেই মহারাজের দরবারে ঢুকলেই সেলাম করতে হ'তো। বাবাকেও করতে দেখেছি। রাজদরবারে এটাই নিয়ম। এর পর আমি যখন যোধপুর মহারাজার দরবারে সভা বাদক হয়ে গেলাম আমাকেও সেলাম করতে হ'তো। যদিও খুব খারাপ লাগত, তাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কথা বলতে জড়তা আসে।' আলিআকবরের কথা শুনে বললাম, 'ছ বছর আগে জববলপুরে বাজাতে গিয়ে, মৈহারের মহারাজার আমন্ত্রণে, আমার ছাত্র লখন শর্মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় মৈহারের মহারাজা আপনার এবং রবিশঙ্করের বাজনার নিন্দা করাতে, কিরকম কড়া দাওয়াই দিয়েছিলাম জানেন?' এই কথা বলতে বলতেই বাড়ীতে এসে পৌঁছে গেছি। বাড়ীর সামনে সকলেই উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লখন শর্মাকে দেখেই বললাম, 'ছয় বছর আগে মৈহারের মহারাজকে কি বলেছিলাম আলিআকবরকে বলো।' লখন শর্মার কাছে সব কথা শুনে আলিআকবর আশ্চর্য হয়ে গেল কিন্তু মনে মনে খুশী হোল বুঝতে পারলাম।

যাই হোক তিনদিন সমারোহ হোল, কিন্তু রাজকুমার এলো না। প্রথম দিন অর্কেষ্ট্রার মধ্যে বাবাকে কোন রকমে ধরে আমি ও অরুণ মঞ্চে নিয়ে এলাম। বাবা একটু ভায়োলীন বাজালেন। হঠাৎ এবারেও মা'কে সামনের সারিতে বসে থাকতে দেখে বাবা আমাকে বললেন, 'তোমার মাকে বাড়ী যেতে বলো।' সাত বছর আগেও বাবা সম্মেলনে মা'কে দেখে ঠিক এই কথা বলেছিলেন। সেইসময় যা বলেছিলাম আজও তাই বললাম, 'আপনার নামে এত বড় সমারোহ হচ্ছে আর মা থাকবেন না।' ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডের একজন বেসুরো বাজাতেই, বাবা বলে উঠলেন, 'লাঠি সে মারেঙ্গে।' কোন রকমে বাবাকে সামলে নিয়ে অর্কেষ্ট্রা শেষ হলে, আমি এবং অরুণ বাবাকে ধরে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলাম। রাত্রি সাড়ে চারটেয় উৎসব শেষ হোল। শেষ দিনে আমি বাজালাম। আমার সঙ্গে মৃদঙ্গে সঙ্গত করলেন অমরনাথ মিশ্র। শ্রোতাদের অনুরোধে আমার নির্দিষ্ট সময় থেকে একটু বেশী সময় লেগে গেল। আমার পর মুনব্বর আলি গাইলেন। এবং তারপর আলিআকবর ঠিক সাড়ে চারটে সময় দেখে বাজনা শেষ করলেন। এই তিনদিনের উৎসবে মায়া চ্যাটার্জি, নিখিল, ধ্যানেশ, নলিন মজুমদার, সনৎ এবং রণজিৎ এর দ্বৈত বাজনা, রাম অন্নপূর্ণার যুগল নৃত্য, শঙ্কর ঘোষ ছাড়াও আরো অনেকে গিয়েছিলো। তিনদিন সঙ্গীত সমারোহর পরে রাজকুমারের কাছে

আলিআকবর, ধ্যানেশ এবং আমি গেলাম। রাজকুমার আমাদের দেখে বললো, 'শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো বলে সমারোহে যেতে পারি নি।' যাই হোক এর পর মৈহারের মহারাজের রেকর্ড শোনাল। এর পর চা জলপান করে আমরা চলে এলাম। রাজকুমারের সঙ্গীত অনুষ্ঠান নাকচ করার জন্য, মৈহারের কিছু ছেলে রাগ করে রাজকুমার আসবে জেনে মঞ্চের কিছু জায়গায় বিচুটি পাতা সাজিয়ে রেখেছিল যা গায়ের সঙ্গে লাগলেই চুলকায়। যে হেতু আলিআকবরের মোটরে রাজকুমার আসবে সেইজন্য মোটরেও বিচুটি পাতা ছেলেরা রেখে দিয়েছিল। কিন্তু রাজকুমার না আসার ফলে আলিআকবর মোটরে চড়তেই চুলকানিতে কষ্ট পেলেন। সব ব্যাপারটা বুঝবার পর আলিআকবর বলল, 'আর কখনও এখানে বাজাব না। এত পলিটিক্স এখানে ঢুকে গেছে।' আলিআকবরকে বুঝিয়ে বললাম, 'ভুলবেন না, এটা বাবার নামে সমারোহ। সকলে মিলে আয়োজন করে দিচ্ছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিছু দুষ্টু ছেলে রাজকুমারের উপর রাগ করে দুষ্টুমি করে এ রকম করেছে, তাই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন না, এবং ভবিষ্যৎ-এ অংশ গ্রহণ করবেন।' আমার কথা শুনে আলিআকবর চুপ করে গেল। ভেবেছিলাম এই বারে আলিআকবরের ইন্টারভিউ নেব কিন্তু সময় কম বলে নেওয়া হোল না।

এই অনুষ্ঠানের পর, দেড় মাসের মধ্যে কয়েকবার মৈহার গিয়েছি। মৈহার গেলেই অরুণের দুই মেয়ে পিতু আর ঋতু আমার কাছে সেতার এবং সরোদ শিখত। আমার অবর্ত্তমানে ডেভিড গিয়ে শেখাত। মৈহারে যে কয়েকবার গিয়েছি, অরুণ আমার জন্য সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতো। বাবার কাছে গিয়ে বরাবরই তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেছি। নিজের অজান্তে তাঁর আঙ্গুল চলছে। মনে হয় যেন তবলা বাজাচ্ছেন। যখনই গিয়েছি সেই সময় বাবা বরাবর বলেছেন, 'বই লিখছো তো?' বাবাকে বলতাম, 'লিখছি।' এই কথা শুনে বাবা খুব খুশী হতেন। উপস্থিত তো এখন সব যোগাড় করছি। হঠাৎ বাবা এবারে বললেন, 'তুমি বিয়ে করেছ অথচ বৌমা ও নাতিকে তো আমাকে দেখালে না।' বললাম, 'এবার যখন আসব তখন নিয়ে আসব।' বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার নাতির বয়স কত হোল।' বললাম 'সাত বছর হয়েছে।' বাবা বললেন, 'এবারে আমার নাতিকে সরোদ শেখাও। ছোট থেকে করলে তবেই হবে। এখন কি বাজাচ্ছে?' বললাম, 'গলায় পাল্টা করাই।' বাবা বললেন, 'এবারে সরোদ তৈরী করিয়ে শেখাও।' চুপ করে রইলাম। এরপর কাশী চলে গেলাম। মৈহারের অনুষ্ঠানের দুই মাস পরে মহন্ত অমরনাথ মিশ্রকে একদিন বললাম, 'বাবা আমার ছেলে এবং তার মাকে দেখতে চেয়েছেন। বহু আগেই বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। এক কাজ করুন, আপনার গাড়ী করে সকলকে নিয়ে যাই এবং এই ফাঁকে আপনারও মৈহারের সারদাদেবীর দর্শন হয়ে যাবে।' মহন্তজী রাজী হয়ে গেলেন। পনেরো জুনে মহন্তজীর গাড়ীতে সকলে মৈহার সকালে পৌঁছলাম। মৈহারে গিয়ে অরুণের বাড়ীতে সকলে স্নান সেরে, প্রথমে মৈহার দেবী দর্শন করলাম। তারপর সকলকে নিয়ে বাবার কাছে গেলাম। মহন্তজী বাবাকে সঙ্কটমোচনের মালা পরিয়ে দিলেন এবং প্রসাদ দিলেন। বাবা খুব খুশী হলেন। বাবা আমার ছেলে এবং তার মাকে দেখে

বললেন, 'আমার নাতির কি নাম রেখেছ?' বললাম, 'অমিত'। বাবা খুশী হয়ে ছেলেকে নিজের বিছানায় বসালেন। বাবা জুবেদা বেগমকে বললেন, 'বৌমা এসেছে, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাও। আমার বৌমা এবং নাতিকে বাড়ীর সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাও।'

ছেলের মা'কে জুবেদা বেগম এবং মা এসে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর বাবাকে বললাম, 'আমি এবং মহন্তজী এখন অরুণের বাড়ী যাব।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন, 'দুপুরে এসে তুমি এখানে খাবে। তবে মহন্তজীর খাবারের কি ব্যবস্থা করবে?' বললাম, 'মহন্তজী রেঁধে খাবেন। তাই এখন যাচ্ছি। আমি দুপুর বেলায় আসব, তবে আগামীকাল মহন্তজীর গাড়ীতে আমরা দুপুরে চলে যাব।' বাবা বললেন, 'ঠিক অছে। মৈহার থেকে ট্রেনে যেতে আমার নাতির কষ্ট হবে, নইলে বৌমা ও নাতিকে কয়েকদিন রাখতাম।'

দুপুরে যখন বাবার কাছে গেলাম, দেখি এই খারাপ শরীর নিয়েও বাবা আমার ছেলেকে গলায় গেয়ে বলছেন, বল তো 'স'। ছেলে গাই। বাবা বললেন, 'বা বা'। এর পর ক্রমান্বয়ে বাবা গলায় পালটা গেয়ে ছেলেকে গাইতে বললেন, ছেলেও সমানে গাইতে লাগল। বাবা ছেলে মানুষের মত খুশী। ছেলেও দাদুর স্নেহ পায় নি, সুতরাং সেও মজা পেয়েছে। হঠাৎ খুব দ্রুত লয়ে যে মুহূর্তে পাঁচসুরের একটা পালটা গেয়ে ছেলেকে গাইতে বললেন, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দাদু ধীরে ধীরে বলুন।' বাবা হেসে বললেন, 'দাদু তুমি হেরে গেলে।' এর পরই বাবা যখন কম লয়ে ছয় সুরের পালটা বললেন, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে গাইল। আমি নির্বাক স্থির হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি। বাবার নজর এতক্ষণে আমার প্রতি পড়েছে। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সকালে যখন থেকে এসেছে, তখন থেকেই নাতির সঙ্গে গল্প করেছি। এর মাথা ভাল। একে এবারে সরোদ শেখাও। ছোট সরোদের জন্য কোলকাতায় লেখো। দেখো তুমি বড় রাগী, আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আমার নাতিকে কখনও মারবে না। দেখবে এ খুব বড় হবে, আমি আশীর্বাদ করছি। এই বয়স থেকে বাজালে তবেই হবে। একটা কথা বলোতো, ছেলে কি পড়ছে?' বললাম, 'ক্লাস ফোরএ ইংলিস স্কুলে পড়ছে।' বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'লেখাপড়া খুব করাবে এবং বাকী সময়ে বাজাবে।' পর মুহূর্ত্তেই বাবা আবার বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো ছেলেকে কখনও মারবে না, দরকার হলে নিশ্চয়ই শাসন করবে।' বাবা বারবার বলাতে পা ছুঁয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। আপনার আদেশ পালন করব।' বাবার আজ্ঞানুযায়ী এখনও পর্যন্ত ছেলের গায়ে কখনও হাত তুলি নি। শারীরিক শাসন করবার মত সময় হলেও আমি নিজেকে সংযত করে নিয়েছি।

খাওয়া দাওয়া করে বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে অরুণের বাড়ী চলে গেলাম। বিকেলে আমার বন্ধু ও আমি বাবার কাছে যখন গেলাম, দেখি বাবার মেজাজ খুব ভাল। বাবা খুশী হয়ে আমার ছেলের সঙ্গে গল্প করছেন। মা'য়ের কাছে শুনলাম, আজ দুপুরে বাবা ঘুমোন নি। সারাদিন নাতির সঙ্গে গল্প হয়েছে এবং গান হয়েছে। পরের দিন দুপুরের আগেই বাবার ওখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, বাবা ছেলে এবং তার মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি

প্রণাম করেই মা'য়ের কাছে গেলাম, কেননা ছেলের মা যখন বাবার কাছে বসে আছে, তখন থাকা ঠিক নয়। জানি বাবা এতে খুশীই হবেন। কেননা বাবার মেজাজ তো আমার জানা আছে। কিছুক্ষণ পর মা'কে ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি এদের খাইয়ে দাও কেননা এরা আজই একটু পরে চলে যাবে।' মনে হোল বাবার শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে। বিদায়ের আগে ছেলে এবং ছেলের মা'কে বাবা আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমার তো কিছুই নাই, আশীর্বাদ করি স্বামী পুত্র নিয়ে রাজরাণী হও।' সঙ্গে সঙ্গে মা'কে বললেন, 'আরে আরে আমার বৌমা প্রথম এসেছে, ওকে সাড়ী দিয়েছ কি না?' মা বললেন, 'বৌমা (অর্থাৎ জুবেদা বেগম) সাড়ী কিনে আনিয়ে দিয়েছে।' বাবা খুশী হলেন। ঠিক দুটোর সময় মহন্তজী গাড়ী নিয়ে এলেন। মহন্তজীর সঙ্গে বাবা কিছুক্ষণ গল্প করলেন। পরে বাবা এবং মা'কে প্রণাম করে আমরা কাশী চলে এলাম।

৫৫

দুই মাস পরে লক্ষ্ণৌতে ভাতখণ্ডে কলেজে বাজাতে গেলাম। লক্ষ্ণৌতে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে বাবার সম্বন্ধে নানা তথ্য পেলাম। প্রায় তিন মাস পরে কোলকাতায় গেলাম চার পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। বাজাবার ফাঁকে ফাঁকে কোলকাতায় কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নিলাম এবং কিছু ছবিও জোগাড় করলাম কোলকাতায়। এর মধ্যে একদিন বিমান ঘোষ-এর কাছে গিয়ে দেখা করলাম তাঁর অফিসে। বিমান ঘোষ, অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। বললাম, 'বসবার জন্য আসি নি। একটা কথা বলুন তো, বোম্বে থেকে ভি. জি. যোগ এসে আপনাকে কিছু বলে নি?' বিমান ঘোষ বলল, 'বলেছে। আসলে আমি, রবুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছি এই কারণে যাতে তাঁদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে পারি।' বললাম, 'আপনার তুলনা আপনিই। আমি বুঝতে পারি না, এত কাণ্ডের পর কি করে আপনি রবিশঙ্করের এত বড় অনুগত হলেন, যার জন্য কাশীতেও আপনি গেলেন তাঁর জন্মোৎসবে। সত্যই আপনাদের চেনা ভার।' এই কথা বলে বাড়ী চলে এলাম। এরপর বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির সঙ্গে দেখা করে কিছু তথ্য পেলাম। কয়েকটা জিনিষের প্রয়োজন বলাতে বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরি আমাকে দেখা করতে বললেন তাঁর ভাগ্নের সঙ্গে। সব চেয়ে বেশী তথ্য দিলেন বিমলাকান্ত রায় চৌধুরি। এ যাবৎ বাবার সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য প্রচারিত হয়েছিলো, তার সমস্ত কিছু বিমলাকান্ত রায় চৌধুরি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেগুলি তিনি আমাকে দিলেন।

বছর শেষ হবার চারদিন আগেই হেমেন অর্ডার অনুযায়ী ছেলের সরোদ দিল। সত্যই, ছোট সরোদ এত ভাল করেছে যার তুলনা নাই। সরোদ নিয়ে পরের দিন কাশী যাত্রা করলাম। কাশীতে এসেই বাবার সম্বন্ধে সব তথ্যগুলি কালানুক্রমিক ভাবে পর পর সাজিয়ে নিলাম। এ সমস্ত তথ্যই বাবার জীবনী লেখবার কাজে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করলাম। তবু তখনও অনেক কাজ বাকী। দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে গেল। কোলকাতা থেকে কাশী আসার একদিন পরই ইংরেজী নববর্ষের শুরু অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর। বছরের প্রথমদিনেই বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ছেলেকে সরোদে হাতে খড়ি দিলাম।

মৈহার থেকে অরুণের চিঠিতে জানলাম, পান্নার মহারাজ পনেরো দিন পর গোয়ালিয়রে রাজমাতার দরবারে আমার বাজনার ব্যবস্থা করেছেন। পান্নার মহারাজের সঙ্গে গোয়ালিয়রের রাজ পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আসলে গোয়ালিয়ারের রাজমাতার পুত্রবধূ অর্থাৎ মাধবরাজ সিন্ধিয়ার স্ত্রীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে, কথায় কথায় পান্নার মহারাজ কথা বলেছেন গোয়ালিয়রের রাজমাতা সিন্ধিয়াকে। সেইজন্য জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে বাজাতে হবে।

চিঠি পেয়ে লিখলাম, বাজনার চারদিন আগেই মৈহার পৌঁছব। ছেলেকে দশদিন রোজ নিয়মিত শিক্ষা দিয়ে মৈহার পৌঁছলাম। মৈহার পৌঁছে বাবার সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম বাবার শরীরের কোন উন্নতি হয়নি। যে লোকের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত সব কাজ চলত, তা বিকল হয়ে গিয়েছে। সময়মত কিছুই হয় না। অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে নিজের থেকে জেগে ওঠেন। বাবাকে বললাম, 'আপনার আদেশে আপনার নাতিকে সরোদ শুরু করিয়ে দিয়েছি, বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'খুব ভাল করে শেখাও। আমার গুরুকুলের নাম যাতে রাখতে পারে তার জন্য আশীর্বাদ করি। আমার তো আর সে বয়স নাই। নইলে আমিই শেখাতাম।' বললাম, 'আপনার আশীর্বাদ পেয়েছে, তাই আপনার নাতির মূলধন।' কথায় কথায় বাবাকে বললাম, 'আজ রাত্রে গোয়ালিয়ার রাজমাতার কাছে বাজাবার জন্য যাব।' এ কথা শুনে বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'আমার আদাব জানিও।' গোয়ালিয়রে গিয়ে রাজমাতার বাড়ীর সামনেই অতিথি ভরনে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবলায় আমার ছাত্র ডেভিড, আমার বন্ধু অরুণ সপরিবারে সেখানে গিয়ে উঠেছিল। রাত্রে বাজনা হোল। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন পান্নার মহারাজ, গোয়ালিয়ারের রাজমাতা তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, ছতরপুরের মহারাজ, এবং নিজের রাজনৈতিক পার্টির দশবারোজন। পান্নার মহারাজকে সেরবানীতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া বড় মাপের হীরের বোতাম বসান দেখলাম। পান্নার মহারাজই আমার বিষয়ে গোয়ালিয়ারের রাজমাতাকে বলেছিলেন, তাই রাজমাতা বাবার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বারার খবর এবং আদাবের কথা বললাম। কথায় কথায় রাজমাতা বললেন, 'বড় আকারের দরবার হল আছে। সেখানে বেশী শ্রোতা হোলে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু অল্প সংখ্যক শ্রোতা বলে ছোট হল ঘরে বাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' তিনঘণ্টা বাজনা হোল। পরের দিন চায়ের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। রাজমাতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?' রাজমাতার গেস্ট হাউস মানে হোটেল, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, দেখবার ম'তো। বললাম, 'এমন পরিবেশে কষ্টের কোন প্রশ্নই আসে না।' রাজমাতা সঙ্গীতের জন্য যে সম্মান আমাকে দিলেন তা আমার জন্য বড় পুরস্কার। সঙ্গীতের এত আদব, আমি রাজপরিবারে একমাত্র গোয়ালিয়ার ছাড়া, ত্রিপুরার মহারাজ মহারাণীর এবং নেপালের মহারাজ বীরেন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীর কাছেও পেয়েছি। এঁরা সঙ্গীতের সম্মান যা দিয়েছেন তাতে রাজ পরিবারের অহঙ্কার ছিলো না। এটাকে বলব, সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা। পরের দিন সকালে চায়ের নিমন্ত্রণে বহু কথা হোল। রাজমাতা বললেন, 'আগেকার দিনে মহারাজাদের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ, পালোয়ান,

ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি বহু রকমের আভিজাত্যের উপাদান রাখা হ'তো। সব মহারাজদের মধ্যেই এই ধরনের প্রদর্শন বাতিক ছিলো। এই ব্যাপার নিয়ে মহারাজাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলত। আমি কি কারও থেকে কম?' সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন, 'একমাত্র রামপুরের মহারাজের দরবারে যত সংখ্যক সঙ্গীত গুণী ছিলেন, আর কোন মহারাজের দরবারে এত সঙ্গীত গুণী ছিলো না। অন্যান্য স্টেটে একজন করেই সঙ্গীতজ্ঞ থাকতেন। যেমন গোয়ালিয়ারে সঙ্গীত গুণী ছিলেন উস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ। কিন্তু রাজাদের অবস্থা বা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব হবার পর থেকেই কেবল বাইরের জাঁকজমকটাই আছে কিন্তু রাজাদের সামর্থ্য একেবারে কমে গেছে।' এই স্পষ্ট উক্তিতে স্তম্ভিত হলাম। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'জিতেন্দ্রপ্রতাপ নামে আপনার কোন আত্মীয় কি উস্তাদ বাবার কাছে মৈহারে সেতার শিখতে গিয়েছিলেন?' রাজমাতা একটু চিন্তা করে বললেন, 'শুনেছি বহু দূর সম্পর্কের আমার এক আত্মীয় উস্তাদ বাবার কাছে শিক্ষার জন্য গিয়েছিল।' বুঝলাম জিতেন্দ্রপ্রতাপের নিজেকে রাজকুমার বলার রহস্যটা কি?

চা খাবার পর রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। বাড়ীটা গোলাকার। যেখান থেকে ঘর দেখাতে লাগলেন, একের পর এক ঘর দেখাবার পর যথাস্থানে অর্থাৎ যেখান থেকে ঢুকেছিলাম, সেইখানেই এসে শেষ হোল। প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বললেন, 'গোয়ালিয়ারের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমার অতিথিদের দেখাল।' সেক্রেটারি সব দেখিয়ে চম্বল ভ্যালির বর্ডার দেখিয়ে বললেন, 'চম্বলের ডাকাতরা রাজমাতাকে এবং তাঁর পূর্বসুরীদের প্রতি তখনও খুব শ্রদ্ধাবান। এই শ্রদ্ধার কারণ আর কিছু না, কারণ একটাই। সেই কারণটা হোল এই যে, গোয়ালিয়ার রাজবংশ তাঁদের প্রজাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং তাঁর দারিদ্র মুক্তির জন্য অনেক কিছু দান করেছেন। সেইজন্য রাজার বিরুদ্ধে এখানে কোন বিদ্রোহ হয় নি।'

মৈহারে বাবার সঙ্গে দেখা করে কাশী ফিরে তিনটি চিঠি পেলাম। একটা এসেছে হায়দ্রাবাদ থেকে। অপরটা এসেছে বম্বে থেকে, অন্যটা এসেছে আমেদাবাদের বৌদির কাছ থেকে। তিনটেই প্রোগ্রামের ব্যাপার। যে চিঠি এসেছে হায়দ্রাবাদ থেকে, সে প্রোগ্রামটা ঠিক করেছেন মিলিটারি ডাক্তার কর্ণেল পাল। ডাক্তার গৌহাটিতে আমার বাজনা শুনবার পর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নিজে তবলা বাজাতেন। হায়দ্রাবাদে রবীন্দ্রালয়ে বাণী সঙ্ঘ সুরমণ্ডল-এর তরফ থেকে প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন। তবলায় সঙ্গতের জন্য মহাপুরুষ মিশ্রকে ঠিক করেছেন। সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলাম। দ্বিতীয়টা হোল বম্বে থেকে। বম্বেতে বীরেন্দ্র মাথুর মোমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর বার্ষিক অধিবেশনে হবে। এই ট্রাস্ট-এর নাম আগেই শুনেছিলাম বলে স্বীকৃতি জানালাম। এর পর আমেদাবাদের চিঠি। আমার মেজদা ডায়িং মাষ্টার হওয়ায়, বাঙ্গালী সমাজ সকলে এক নামে চিনতেন। আমেদাবাদ থেকে আমার মেজ বৌদির চিঠি পড়ে আকাশ থেকে পড়লাম। বৌদি লিখেছে, 'এখানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের যিনি ম্যানেজার, তাঁর নাম প্রমথেশ চন্দ্র সেন। তিনি একজন সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ, তাই গত কয়েক বছর ধরে তিনি এখানে সঙ্গীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করে আসছেন। আগে যখন তিনি দার্জিলিং এবং পাটনায় ছিলেন, সেখানে তিনি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

উপস্থিত আমেদাবাদে এসেও সঙ্গীত সম্মেলন করছেন। সেই সম্মেলনে ভারতের সমস্ত গায়ক বাদকের নিমন্ত্রণ করে আনেন। আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি যখন দার্জিলিং এবং পাটনায় ছিলেন, তখন প্রমথেশ সেনের বাড়ীতেই উঠতেন। আমেদাবাদে সঙ্গীত সম্মেলনের সময় তাঁরা ওঁর বাড়ীতেই ওঠেন। প্রমথেশ সেন নিজে, এবং গুজরাটের স্টেট ব্যাঙ্ক-এর যিনি ডিরেকটার তিনিও খুব সঙ্গীতপ্রেমী। তাঁরও উপাধি সেন। এঁরা দুজনেই তোমার গতবছরে আকাশবাণীর ন্যাশানাল প্রোগ্রাম শুনেছেন। সেই প্রোগ্রাম তাঁদের অত্যন্ত ভাল লাগায় তোমাকে আগামী সম্মেলনে শিল্পী হিসেবে পেতে চায়। কথা প্রসঙ্গে প্রমথেশ সেন একদিন আমার দাদাকে বলেছেন, মশায় আমার তো চাকরি রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে, কেননা আমার হেডবস, তিনিও যেমন যতীনবাবুর বাজনা রাখতে চান, আমিও তেমনি তাঁর বাজনা রাখতে চাই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, সেই কাশীর শিল্পী নাকি মহিলাদের সামনে সরোদ বাজান না। আপনি তো কাশীর লোক। আপনি কাশীর যতীন ভট্টাচার্যকে চেনেন? তোমার দাদা ভেবেছে কি জানি তুমি কোন অপরাধ করে ফেলেছ? তাই তোমার দাদা জিজ্ঞেস করেছেন, কেন বলুন তো? তখন সেন বলেছেন, যতীন ভট্টাচার্যর স্বভাবের জন্য এখানে আনা যাচ্ছে না। আপনি যদি কোনরকমে এখানে আনতে পারেন তাহলে আমার মুখরক্ষা হয়। আপনি কাশীর লোক বলেই আপনাকে বলছি। আপনি কি যতীন ভট্টাচার্যকে চেনেন? তোমার দাদা বলেছেন, চিনি। সেন এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করেছেন, কি রকম চেনেন? তোমার দাদা বলেছেন, আমার মায়ের পেটের ভাই হয়। সেন বলেছেন, 'আপনার ভাই কি মেয়েদের সামনে বাজান না?' তখন তোমার দাদা বলেছেন, 'এ কথা আপনাকে কে বলল?' তখন সেন বলেছেন, 'খুব বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমি এই খবর পেয়েছি।' তখন তোমার দাদা বলেছেন, 'ওটা মিথ্যা কথা। আমার ভাইকে আমি চিনি না?' সঙ্গে সঙ্গে সেন বলেছেন, 'দয়া করে আপনার ভাইকে একটা চিঠি লিখুন আমেদাবাদে আগামী দশই মে টেগোর হলে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে একটা প্রোগ্রাম করা হবে এবং এর পরই স্বাধীনতা দিবসে একটা সম্মেলন হবে। তাতেও তাঁকে বাজাতে হবে। আপনার চিঠি লেখার পর আমাদের তরফ থেকেও আপনার ভাইকে দুটো অনুষ্ঠানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হবে।'

টেগোর হলে যে অনুষ্ঠান হবে সেটা সম্পূর্ণ বিনা টিকিটে আয়োজন করা হবে। স্টেট ব্যাঙ্কের তরফ থেকে অনুষ্ঠানটি করা হবে। তার জন্য তোমাকে দু হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে যে সম্মেলন হবে তাতে অনেক বেশী টাকা দেওয়া হবে। সেই অনুষ্ঠানে ভীমসেন যোশী, মীরা ব্যানার্জি, নিখিল ব্যানার্জি এবং অনেকে আসবেন।' বৌদির চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানে বাজালে আমার দাদা, বৌদি, ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। প্রায় তেরো বছর আমার আমেদাবাদে যাবার সুযোগ হয়নি কারণ কাশী থেকে আমেদাবাদ অনেক দূরের রাস্তা। এই সূত্রে রথ দেখা এবং কলা বেচা একসঙ্গেই হয়ে যাবে। এমন সুযোগ আমি ছাড়ব না মনস্থ করলাম।

বিকেল বেলা কাশীর ঠালুয়া সেক্রেটারি বিশ্বনাথ মুখার্জি এসে বললেন, 'ঠালুয়া ক্লাবের'

মিটিং এ ঠিক হয়েছে, তিন মাস পরে ঠালুয়া ক্লাবের সব সদস্যরা মৈহারে গিয়ে বাবাকে সম্বর্দ্ধনা দিতে চান।' এখানে কাশীর 'ঠালুয়া ক্লাব' সম্বন্ধে একটু না বললে, এই ক্লাবের উদ্দেশ্য লোকে বুঝবে না। কাশীর কিছু প্রতিষ্ঠিত লোক 'ঠালুয়া ক্লাব' নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান করেছে, যার মধ্যে বছরে প্রায় দুবার ভারতের গুণী লোকেদের বেদ পাঠ, শঙ্খধ্বনি করে কিছু উপহার দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করেন, যার মধ্যে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ঞদেরই কেবল সম্বর্দ্ধনা করেন। বিশ্বনাথ মুখার্জিকে বললাম, 'বাবার শরীর এখন তো খুব খারাপ। বাবা বিছানায় শুয়ে থাকেন যদিও ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়।' বিশ্বনাথ মুখার্জি বললেন, 'যখন উস্তাদ বাবার এই অবস্থা, তাহলে তো যেমন করেই হোক এই অনুষ্ঠান মৈহারে গিয়েই করতে হবে। কাশী থেকে প্রায় দশ থেকে পনেরো জন সদস্য যাবে। তাঁদের একদিনের কেবল থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুপুরে তাঁরা মৈহার পৌঁছবে এবং রাত্রে সম্বর্দ্ধনা দিয়েই পরের দিন সকালে তাঁরা কাশী চলে আসবে।' আমি সম্বর্দ্ধনা কিছু দেখেছি, কিন্তু ঠালুয়া ক্লাবে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করে তার তুলনা নাই। সুতরাং বললাম, 'ঠিক আছে, মৈহারে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করছি।' বিশ্বনাথ মুখার্জি বললেন, ' যেমন ভাবেই হোক করতেই হবে।' মনে মনে ভাবলাম মৈহারে থেকে সিকান্দ্রাবাদ চলে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে অরুণ এবং দীপচন্দকে লিখলাম বাবার সম্বর্দ্ধনা বিষয়ে। অরুণ ভাইকে লিখলাম, 'বাবাকে বোলো যাতে রাজী হোন। এটা যেমন করে হোক সব বিষয় বুঝিয়ে আমার নাম করে বোলো।'

হঠাৎ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখলাম, তাতে পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, 'তিনি মৈহারে গিয়ে দেখে এসেছেন যে ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ অসুস্থ হয়ে তাঁর বাড়ীতে বিনা চিকিৎসায় এবং অযত্নে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। তাঁর সেবা ও চিকিৎসার কোন যথাযথ ব্যবস্থাই নাই। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর উপযুক্ত পুত্র, কন্যা, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকা সত্ত্বেও তিনি এইভাবে দিন কাটাচ্ছেন। সরকার বা রাজারও তাঁর দিকে কোন দৃষ্টি নেই। আমি নিজেও উস্তাদজীর বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখে এসেছি যে সেখানে তাঁর কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি।' কিছুদিন পরে আবার দেখলাম এই সংবাদদাতার রিপোর্টের প্রতিবাদ করেছেন জুবেদা বেগম। তিনি লিখেছেন, 'সংবাদদাতার সংবাদ পুরোপুরি সত্য নয়। বাবা বরাবরই সরল এবং সাধাসিধে জীবন যাপনের পক্ষপাতী। তিনি বিলাসবহুল জীবন যাত্রার বিরোধী তাই তাঁর চিকিৎসাও হচ্ছে অত্যন্ত সাধাসিধে ভাবে।' এটা ঠিক যে 'আনন্দবাজারের' সংবাদদাতা বাইরে থেকে দেখে যা লিখেছে, তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আবার জুবেদা বেগমও প্রতিবাদে যা লিখেছে, তাও সত্য।

আমি শেষ যখন মৈহার গিয়েছিলাম তখনও দেখেছিলাম তিনি অসুস্থ। আমার বন্ধু অরুণ ও তাঁর স্ত্রী ইলা বাবার সেবা করে যাচ্ছে অক্লান্তভাবে। কিছুদিন পরে অরুণের চিঠি পেলাম। অরুণ এবং তার স্ত্রী আমার চিঠির বক্তব্য বুঝিয়ে সম্বর্দ্ধনার জন্য বাবাকে রাজী করিয়েছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বনাথ মুখার্জিকে বললাম, 'সম্বর্দ্ধনার সব ব্যবস্থা করুন।'

কিছুদিন পরই বম্বের হিন্দি নবভারত টাইমস-এর মদনলাল ব্যাস-এর একটা চিঠি

পেলাম। তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ বম্বেতে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। ব্যাস হাথরসের সঙ্গীত পত্রিকার জন্য বম্বেতে যত সঙ্গীত অনুষ্ঠান হ'তো তার বিবরণ পাঠাত। মদনলাল ব্যাস চিঠিতে জানিয়েছে, তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা যে সে মৈহারে বাবাকে একবার দর্শন করে। এ ছাড়া তাঁর আরও ইচ্ছা যে সে বাবাকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখে। রবিশঙ্করের 'মাই মিউজিক, মাই লাইফ' থেকে বাবার জীবন সম্বন্ধে কিছু উপাদান পেয়েছে, কিন্তু তাঁর আশা যে আমার কাছে থেকেও সে আরও অনেক উপাদান পাবে। সুতরাং সে লিখেছে, আমার মৈহার এ যাওয়ার আগে যেন আমি তাঁকে চিঠি লিখে আগাম জানিয়ে দি যে কবে নাগাদ আমি মৈহার যাব। তা হলে সেও সেই সময় ওখানে উপস্থিত হতে পারবে।

প্রথম যখন বাবা আমাকে তাঁর জীবনী লিখতে অনুমতি দেন, তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে বইটি, আমি আমার মাতৃভাষাতেই লিখব, কিন্তু ব্যাসের চিঠি পেয়ে আমি ঠিক করলাম, ব্যাসের সাহায্য নিয়ে আমি বইটি হিন্দিতে লিখব কারণ ব্যাস হিন্দিভাষী হলেও বাংলা পড়তে ও লিখতে পারে এবং লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ হিন্দীভাষী বলে প্রকাশ করতে অসুবিধা হবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে মদনলাল ব্যাসকে লিখলাম, 'আগামী সাতাশে মার্চ মৈহার আসুন। এলে বাবার সঙ্গে দেখা হবে এবং বাবার সম্বর্ধনাও দেখবেন।' তা ছাড়া তাকে প্রস্তাব দিলাম, 'বাবার উপর প্রবন্ধ না লিখে, যদি বাবার নির্দেশে যে কঠিন দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়েছে, তা যদি আপনি বই-এর আকারে লেখেন তাহলে খুবই ভাল হয়। এই চিঠিটা লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গকে দেখাবেন এবং পত্রপাঠ নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন।' এও লিখলাম, 'রবিশঙ্করের ইংরাজী বই থেকে বাবার জীবনী যেটুকু পেয়েছেন, সেটা কিছুই নয়, কেননা রবিশঙ্কর সে বইতে নিজের উপরেই লিখেছে। গুরুর বিষয় লিখতে হয় বলে শতকরা এক ভাগ মাত্র বাবার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে। বইটি রবিশঙ্করের আত্মজীবনী। আমার এ-বইটা হবে বাবার বিষয়ে একটা প্রামাণ্য বই যা ইতিহাস বলে গণ্য হবে। যাক পত্রপাঠ গর্গ-এর সঙ্গে কথা বলে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।' আমার চিঠির জবাবে মদনলাল লিখলে, 'যদি বাবার জীবনী লিখবার সুযোগ আমি পাই, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। তা হলে প্রবন্ধ আর লিখবো না। আমি ঠিক সময়ে মৈহারে এসে পৌঁছবো।'

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলে রাখি, বাবার কাছে দীর্ঘ সাত বৎসর থাকার ফলে যেমন ভাল গুণ পেয়েছি তেমনি বদগুণও পেয়েছি। অবশ্য আমার মতে এটা বদগুণ নয়, কিন্তু আজকালকার যুগে সকলেই বদগুণ বলে, স্পষ্ট বক্তা, এবং মিথ্যা কথা শুনলে রেগে যাওয়াকে। কিন্তু ভাল গুণের মধ্যে একটা জিনিষ নিতে পারি নি। বাবা যে মুহূর্তে কারো চিঠি পেতেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমি বরাবরই কুঁড়ে। মৈহার থাকাকালীন বাবার চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে লিখতাম সে কথা আগেই লিখেছি। কিন্তু মৈহার ছাড়ার পরই বাবার এই গুণটা হারিয়েছি যার জন্য অনেকেই আমাকে ভুল বোঝে। চিঠি লিখতে গেলেই, আমার মনে হয় জ্বর এসে গেছে। আজকের যুগে পত্র দিয়ে যোগাযোগ রাখাটা বিশেষ প্রয়োজন। যদি সেই সময় আলাদা লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গকে চিঠি দিতাম তা হলে মদনলাল ব্যাসের প্রসঙ্গটার কোন প্রয়োজনই হ'তো না। গর্গকে চিঠি না দেওয়ার ফলে

আমাকে কি পরিমাণে বিব্রত হতে হয়েছিল সে পরের কথা পরেই বলব। কেবল গৌরচন্দ্রিকাটা করে রাখলাম।

বাবার সম্বর্দ্ধনার দুই দিন আগেই মৈহার পৌঁছলাম। অরুণের বাড়ী গিয়ে শুনলাম, দীপচন্দ সব ব্যবস্থা করে রেখেছে সম্বর্দ্ধনার জন্য। এ ছাড়া অরুণ ও ইলা সম্বর্দ্ধনার ব্যাপারে থাকায় বাবাকে বলে রাজী করিয়েছে। অরুণের বাড়ীর উপরতলায় মদনলাল ব্যাস-এর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দীপচন্দ ঠালুয়া ক্লাবের সদস্যদের জন্য একটা ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করেছে। সকালে উঠেই বাবার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, বাবার অবস্থা সেইরকম রয়েছে। চিনতে পারেন, কথাও বলেন কিন্তু কথার মধ্যে একটু জড়তা আছে। বাবাকে ঠালুয়া ক্লাব সম্বন্ধে সব বললাম। বাবা প্রথমে বললেন, 'এই বয়সে এ সবের কি দরকার?' বললাম, 'আপনার দরকার নাই কিন্তু আমার দরকার আছে। বইতে এই ঘটনাটা লিখব। আপনাকে সম্বর্দ্ধনা দেবার জন্য জব্বলপুর ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার আসছেন। এ ছাড়া সাহিত্যিকও আসছেন। সম্বর্দ্ধনার সময় যে ছবি উঠবে সেই ছবিগুলি বইতে ছাপাব।' হঠাৎ বাবা ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। যা ভাল বোঝো তাই করো। আগামী কাল কটার সময় যেতে হবে?' বললাম, 'আগামীকাল বিকেলে এসে বলে যাব কোন সময় আপনাকে যেতে হবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে আপনাকে গাড়ী করে নিয়ে যাব।' এই কথা বলে দীপচন্দের কাছে গিয়ে দেখা করলাম। সত্য দীপচন্দ যা ব্যবস্থা করে রেখেছে তার তুলনা নাই। নিজে খরচা করে মৈহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সাজসজ্জা এবং মঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাবার প্রতি কত শ্রদ্ধা অথচ সে শিষ্য নয়। নিঃস্বার্থে সব করেছে, তবুও এমন লোক যাঁর কাছে আমাদের ঘরের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু পরিবর্তে এ বিষয়ে তাঁর কপালে বরাবর বদনামই জুটেছে।

রাত্রের ট্রেনে মদনলাল ব্যাস মৈহার এসে পৌঁছল। তাঁর সঙ্গে রাত্রে দীর্ঘ সময় ধরে আমার বই-এর ব্যাপারে সব বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার প্রস্তাবের কথা গর্গকে সব বলেছেন কি?' উত্তরে বলল, 'গর্গজী শুনে খুব খুশী হয়েছেন।' জানি খুশী হবেই কেননা গর্গ-এর সঙ্গে আমার একেবারে পারিবারিক সম্বন্ধ। ব্যাস-এর সঙ্গে বই লেখার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোল। পরের দিন আঠাশে মার্চ সকালে ব্যাসকে বাবার কাছে নিয়ে গেলাম। বাবাকে বললাম, 'কাশী থেকে আজ দুপুরবেলায় সকলে আসবে। আর আজ বোম্বে থেকে আপনার সম্বর্দ্ধনা দেখবার জন্য একজন এসেছে।' বাবা বললেন, 'বেশ বেশ'। কটার সময় তৈরী হয়ে থাকব?' বাবার সময়ের একটু এদিক ওদিক হলেই জানি অনর্থ হবে। তাই বললাম, 'বিকেলে এসে বলব কটার সময়ে আপনাকে নিয়ে যাব।' এর পর মা'র সঙ্গে দেখা করে বাড়ী চলে এলাম। দুপুরবেলায় কাশী থেকে ক্লাবের দশজন সদস্য এসে পৌঁছলেন। ঠালুয়া ক্লাবের সেক্রেটারি বিশ্বনাথ মুখার্জি, উদবোধক ডাক্তার ভানুশঙ্কর মেহেতা এবং কিছু সাহিত্যিক এবং কিছু উদ্যোগপতি এসেছেন। এ ছাড়া কাশীর হিন্দি দৈনিক 'আজ' সংবাদপত্রের বিখ্যাত কারটুনিষ্ট মনোরঞ্জন কাঞ্জিলাল এসেছেন। কাঞ্জিলাল

বাবাকে সম্বর্দ্ধনা দেবার সময় একটা সরোদ এঁকেছেন, যার মধ্যে বাবার অভিনন্দন লেখা হয়েছে। এক কথায় অপূর্ব হয়েছে। ঠিক হোল প্রথমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শঙ্খ দিয়ে শুরু হবে। তারপর বেদপাঠ হবে। এরপর অভিনন্দন পাঠ করবেন ডাক্তার ভানুশঙ্কর মেহেতা। এরপর আমার উপরই ভার পড়েছে সঙ্গীত আয়োজনের। সঙ্গীতের মধ্যে মৈহারে বাবার অর্কেষ্ট্রা দিয়ে শুরু হবে এবং মধ্যে কিছু গান বাদ্য হবে এবং সর্বশেষে আমাকে বাজাতে হবে। বিকেল থেকে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সব ব্যবস্থা শুরু হোল। ইতিমধ্যে জববলপুর ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার রাজবলী তিবারি নিজের গাড়ী করে এসে বিকেলে পৌঁছলেন। ঠিক হোল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বাবাকে নিয়ে আসব। সেক্রেটারিকে বললাম, 'সময় ঠিক করে বলুন, কেননা বাবাকে যে সময় বলব তাঁর এক ঘণ্টা আগেই বাবা তৈরী হয়ে থাকবেন। তারপর যদি দেরী হয় বাবার মেজাজ বিগড়ে যাবে।' সময় ঠিক হোল। বাবাকে বিকেলে গিয়ে বলে এলাম, সময় যদিও ঠিক হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিন্তু যদি দেরী হয় তাহলে চিন্তা করবেন না।' মা'কে গিয়ে বললাম, 'মা আপনাকেও নিয়ে যাব।' আমার কথা শুনে মা অবাক হয়ে বললেন, 'বল কি বেডা। তোমার বাবা আজ পর্যন্ত আমাকে কোথাও নিয়ে যান নি। আমি গেলে তোমার বাবা চটে যাবে।' মার কথা শুনে বললাম, 'যা কখনও হয়নি তাই আজ করব। আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন।' মা শুনে খুশী হলেও, ঘাবড়ালেন। সব ব্যবস্থা করতে একটু দেরী হয়ে গেলো। বাবার কাছে অরুণ ও ইলাকে নিয়ে বাবাকে আনতে গেলাম। বাড়ীতে ঢুকতেই মা বললেন, 'তোমার বাবা পায়জামা পরে অনেকক্ষণ আগে তৈরী হয়ে ছিলেন কিন্তু সময় পেরিয়ে যেতে কিছুক্ষণ হোল সব খুলে ফেলেছেন।' এ কথা শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত। অরুণ ও ইলাকে নিয়ে বাবার কাছে যেতেই বললেন, 'তোমাদের সময়ের ঠিক নাই, তাই যাবো না।' বাবাকে বুঝিয়ে বললাম, 'আপনার শরীর খারাপ, আগে নিয়ে গিয়ে বসালে আপনার কষ্ট হবে বলে আসি নি। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে বলেই আপনাকে নিতে এসেছি। জববলপুরের ভাইস চ্যান্সেলারও এসে গেছেন।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাবা না যাবার গোঁ ধরে বসে রইলেন ঠিক সময়ে যাই নি বলে। আমার বন্ধুপত্নী ইলার কথা তিনি শোনেন। ইলাকে বললাম, 'তুমি যেমন করে হোক বাবাকে সামলাও।' ইলা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জামা, পায়জামা, টুপি পরাতে সাহায্য করে মানিয়ে নিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবাকে ধরে দরজার কাছে গাড়ীতে চড়ানর সময় যে সময়ে মা'কে পাশে বসাচ্ছি, হঠাৎ বাবা বললেন, 'আরে আরে এ-কি?' বললাম, 'মা না থাকলে সম্বর্দ্ধনার কোন মানে হবে না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে মা'য়ের ছবিটা আমার বইএর মধ্যে থাকবে।' হঠাৎ কি হোল, বাবা বললেন, 'যা ভাল বোঝ তাই করো।' বাবার শরীর খারাপ বলেই এটা সম্ভব হোল, নইলে এটা কোন মতেই সম্ভব হ'তো না। যাক বাবা এবং মা'কে নিয়ে গেলাম। বাবা এবং মা'কে ধরে অরুণের সাহায্যে ডায়াসে বসালাম। যে মুহূর্তে শঙ্খ বেজে উঠল বাবার অদ্ভুত অভিব্যক্তি হোল। বাবা বলে উঠলেন, 'বা-বা, এই শঙ্খের আওয়াজে দেশের কথা মনে পড়ে গেল।' এরপর যথারীতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করে বাবাকে যখন মানপত্র পড়ে শোনান হল, দেখি

বাবার চোখে জল। তারপর সরোদের চিত্রের মধ্যে মানপত্র লেখা দেখে খুশী হলেন। বাবার এই সম্বর্দ্ধনার ব্যাপারে যাঁরা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রাজস্থানের চিফ মিনিষ্টার সুখাডিয়া, কোলকাতার হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ বিষ্ণু শাস্ত্রী এবং ভারতের বহু শিল্পীর শুভেচ্ছা পড়ে শোনান হোল। এর পর, পরের পর ফটো ওঠান শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ বাবা জীবনে যা করেননি তাই করলেন। হঠাৎ মা'কে হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে একটু কাছে এসে বসো, তোমার আমার ফটো ওঠাচ্ছে।' মা একটু ঘোমটা টেনে খুব ধীরে বললেন, 'লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ।' মাইকে এ কথাটা শোনা গেল। কাশীর থেকে যাঁরা এসেছেন অল্প বিস্তর বাংলা বোঝে। তাঁরা মা'য়ের কথা শুনে হাসতে লাগল। এর পর সেক্রেটারি একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে বাবাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। বাবা অস্পষ্ট জড়তায়, ধীরে ধীরে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'আমার এখন কথা বলতে কষ্ট হয়। আমার কাছে সঙ্গীতই ভগবান। আমি একটা গান রচনা করেছি। গানটা হোল গুনন কা চর্চা কিজিয়ে।' এইটুকু বলেই বাবা আমাকে বললেন, 'গানটা বলে মানে বুঝিয়ে বলো।' বাবার কথায় আমি বাবার রচিত গানটা বললাম।

গুনন কা চর্চা কিজিয়ে।
অবগুন দুর কর ধীরজ ধরিয়ে।
প্রথম সুরন তাল কো সাধে, ফির গুরু সে রাগ ভেদ শিখে
জনম জনম করে, সো ফল পাওয়ে।

গানটির অর্থ বুঝিয়ে বললাম, 'বাবা এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছেন। সুতরাং উপস্থিত বাবাকে বাড়ী নিয়ে যাব। তারপর সঙ্গীত অনুষ্ঠান হবে।' এই কথা বলেই বাবা এবং মা'কে বাড়ীতে রেখে এলাম। বাড়ীতে বাবাকে শুইয়ে বললাম, 'আপনি বিশ্রাম করুন। আমি এখন যাব কেননা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে।' বুঝলাম, 'বাবা এই সম্বর্দ্ধনা দেখে খুবই অভিভূত হয়েছেন, যার জন্য আমার কথা শুনে বললেন, 'এঁরা খুব ভাল লোক। বহুদিন পরে শঙ্খের আওয়াজ শুনলাম। যা ছোটবেলায় আমার মা প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই বাজাতেন। এ ছাড়া কি সুন্দর ছন্দে বেদপাঠ হোল। যাও তুমি গিয়ে তাদের সম্বর্দ্ধনা করো।' মা'র সঙ্গে দেখা করতেই মা বললেন, 'বেডা তোমার জন্যই জীবনে এই প্রথম, তোমার বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বসলাম। খুদা তোমার মঙ্গল করুক।' দেখে মনে হোল মা খুব খুশী হয়েছেন।

এর পর মৈহারে একদিন থেকে মদনলাল ব্যাসকে নিয়ে কাশীতে নিজের বাড়ী এলাম। কাশীতে এসে ব্যাসকে সব খবরের কাগজের কার্টিং এবং সমস্ত উপাদান, এ অবধি যা সংগ্রহ করেছি সব দিলাম। বললাম, 'এখনও অনেক সামগ্রী জোগাড় করছি এবং করতেও হবে। এ যাবৎ আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় নি। পরের বছর প্রথম দিন এঁরা আসবে। এর মধ্যে যে তথ্যগুলি দিলাম তা সাজিয় কি কি পরিচ্ছেদ হবে বলে বললাম, 'আপনি একটা খসড়া বা ছক করুন। এবং এর মধ্যে বাবার সঙ্গীতের সম্বন্ধে যা লিখবার সেটা লিখে রাখব। উপস্থিত এখন 'ভৈরবী'র একটা সরগম দিচ্ছি, এর হিন্দি নোটেশান আপনি করে রাখবেন। কেননা সঙ্গীত সম্বন্ধে না লিখলে বাবার জীবনী লিখবার কোন

মানেই হয় না। বাবার সঙ্গীতের মধ্যে কি বিশেষত্ব ছিল, বাবা কি কি রাগ তৈরি করেছেন, এ সবই লিখে রাখব। যদিও বাবা আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখবার জন্য কিছুই আদেশ দেননি। কিন্তু ঠিক করেছি কেবল কষ্ট করে শিখেছেন, কার কাছে শিখেছেন, কি মানপত্র পেয়েছেন সেটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। এ সবের চেয়ে বড় কথা হোল সঙ্গীতে বাবার অবদান কি? এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এ ছাড়া বাবার সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেগুলি প্রমাণ সহিত সত্য কথা লিখতে হবে।' বই-এর মধ্যে কি কি উপাদান থাকবে এই সব নিয়ে সাতদিন সব বোঝালাম। বললাম, 'এই সব ঘটনাগুলি বম্বে গিয়ে গর্গকে সব জানাবেন।' ইতিমধ্যে আপনি পরিচ্ছেদ করে লিখুন। তারপর সব সামগ্রী এবং ফটো জোগাড় করে যখন বম্বে যাব তখন গর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। এ ছাড়া যে ভুল থাকবে, সেগুলো আমি বম্বে গিয়ে ঠিক করবার পর বই ছাপাব। যে হেতু আমাকে সেকেন্দ্রাবাদে যেতে হবে তাই আমার যাত্রার একদিন আগেই মদনলাল ব্যাস যে উপাদান এ যাবৎ জোগাড় করেছি, সব নিয়ে বম্বে চলে গেল।

ব্যাস-এর যাবার পর দিনই আমি সেকান্দ্রাবাদের পথে পাড়ি দিলাম। সেকান্দ্রাবাদ পৌঁছবার পরই ডাক্তার কর্ণেল পালকে স্টেশনে দেখলাম। বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় দুজনেই খুশী হলাম। তাঁর গাড়ী করে মিলিটারি এরিয়ার মধ্যে পৌঁছলাম। কর্ণেল পাল আমাকে একজন মেজর মুখার্জির বাড়ীতে রাখলেন কেননা, প্রথম তাঁরা সঙ্গীতপ্রেমী এবং মেজরের স্ত্রী কোলকাতার মেয়ে আধুনিক গান করেন, যার নাম ইন্দ্রাণী মুখার্জি। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনার কাছে অন্ততঃ গানের কিছু প্রারম্ভিক শিক্ষা নেবে। কর্ণেল পাল বললেন, 'যে হেতু আমি এবং আমার স্ত্রী সঙ্গীত কার্যক্রমের ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত থাকবো তাই যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য মেজরের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করেছি।' যাঁরা সেকান্দ্রাবাদে মিলিটারি ক্যাম্পে গেছেন, তাঁরাই জানেন সেখানে মিলিটারির লোক বা তাঁদের কোন অতিথিই কেবল যেতে পারেন। অন্য কাউকে যেতে অনুমতি দেয় না। মিলিটারি চাকরিতে সমস্তই নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা জীবন।

৫৬

বাবার উপর বই-এর সামগ্রী যোগাড়ের জন্য যেখানে যাই, সেখানেই চেষ্টা করি যদি কোন লোকের কাছে কিছু পাই। আমি জানি বাবা একবার হায়দ্রাবাদে বাজাতে গিয়েছিলেন। তবলায় সঙ্গত করেছিলেন শেখ দাউদ, যিনি রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। শুনেছিলাম গুণী এবং বয়স্ক লোক। ভাবলাম তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করব। আমার বাজনার দিন রবীন্দ্রালয়ে মিলিটারির এবং সঙ্গীত মহলের সব লোকের উপস্থিতিতে হলটি ভর্ত্তি হয়ে গেল। দাক্ষিণাত্যে তালির উপর গায়ক বাদকের খুব দখল। অবশ্য ওঁদের তালি দেওয়ার পদ্ধতি আলাদা। তিন ঘণ্টা বাজনা হোল। এর পর কর্ণেল পাল একজন মেজরের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি পরের দিন তাঁর বাড়ীতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। মেজরের স্ত্রীর জন্ম এলাহাবাদে। তিনি এলাহাবাদ থেকে সঙ্গীত নিপুণ পদবী নিয়ে গায়িকা হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু ঘটনা চক্রে তিনি বিবাহসূত্রে এমন একজন পুরুষের সঙ্গে

জড়িত হয়ে যান, যিনি পুরোপুরি সঙ্গীত বিরোধী মানুষ। বিবাহের পরে তার পক্ষে সঙ্গীত চর্চা করবার অবসর হয়নি। আমি রবীন্দ্রালয়ের আসরে বাজাবার পরই এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আমাকে বাড়ীতে আলাপ করবার জন্যই চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পরের দিন কথা প্রসঙ্গে মেজরের স্ত্রী, তাঁর জীবনের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা স্মরণ করে আমাকে বললেন, 'আমার এই বিয়ে হবার পর থেকেই, সঙ্গীত চর্চা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' এই কথা বলে আমাকে খাটের তলা থেকে তানপুরা বের করে দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন আমার তানপুরা। এতে এখন ধুলো জমেছে।' তাঁর মেজর স্বামী রবীন্দ্রালয়ে আমার বাজনা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল। আমার সামনে মেজর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সঙ্গীত যে এত মধুর হয় আমার অজানা ছিলো, তাই আজ থেকে আর আমি তোমাকে সঙ্গীত চর্চা করতে বাধা দেবো না। তুমি এখন থেকে স্বাধীনভাবে সঙ্গীত চর্চা করে যাও।' সেই ঘটনায় সেদিন আমার মনে হোল যেন আমি সঙ্গীতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

রবীন্দ্রালয়ের প্রোগ্রামে হায়দ্রাবাদের রেডিওর স্টেশন ডাইরেক্টর এসেছিলেন। তিনি পরের দিনই দুপুরে আমাকে রেকর্ড করতে বললেন। আমি রাজী হলাম। পরের দিন ইন্দ্রাণী মুখার্জি আমাকে নিজের গাড়ী করে নিয়ে গেলেন। তিনি নিজে লাইট ক্লাসিকাল রেডিওতে গান। সেখানে শেখ দাউদ আমার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করলেন। এই শেখ দাউদই একদিন বহুকাল আগে বাবার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে ছিলেন। কথাচ্ছলে শেখ দাউদ বাবার সঙ্গীতের সম্বন্ধে খুবই প্রশংসা করলেন, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে তাঁর কাছে থেকে নূতন উপাদান পাওয়া গেল না। আর তাঁর তখন অনেক বয়েস হয়েছে। কিন্তু আমার বাজাবার মধ্যে নানা রকমের ছন্দ, গৎ-এর বন্দিস, লয়ের কাজ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, যে এ সমস্তই উস্তাদ বাবার কাছে শেখা। তাই বলে উঠলেন, 'শুভান আল্লা, শুভান আল্লা।' তিনি প্রাচীন কালের তবলা বাদক বলেই সে দিন লয়ের কাজ, গৎ-এর বন্দিস এবং ছন্দের কাজের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন। কিন্তু বর্তমান কালের তবলা বাদকের মনোভাব অন্য রকম। তাঁরা যখন ঠিকমত সঙ্গত করতে পারে না তখন অন্তরালে গায়ক বা বাদকের নিন্দা প্রচার করে। এ যুগের ধর্ম, এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। প্রাচীন প্রবীন তবলা বাদক কঠিন বন্দিস ধরতে না পারলেও, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে এবং নিজের ভুল স্বীকার করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। প্রবীন তবলা বাদক যাঁদের সঙ্গে আমার বাজাবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের মধ্যে কণ্ঠে মহারাজ, আহমদজান থিরকুয়া, হবিবুদ্দিন, হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি, সামতাপ্রসাদ, অনোখেলাল এবং কেরামৎ খাঁর মধ্যে যে ঔদার্য দেখেছি তা বিরল।

রেডিওতে বাজিয়ে আসবার পর, ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে সঙ্গীতের গোড়াকার সূত্রগুলি দুই দিন শিখিয়ে দিলাম। তাঁর গলা ছিল ঈশ্বরদত্ত কিন্তু শিক্ষা পান নি। তাঁকে বলেছিলাম, 'ভিতটা মজবুত করুন, তাহলেই আধুনিক গানই দেখবেন কত ভাল হয়ে যাবে।' এর পরের দিন মেজরের স্ত্রী যাঁর বাড়ীতে চা খেয়েছিলাম তাঁর তানপুরার তার ঠিক করে লাগিয়ে বলেছিলাম, 'ঠিক করে সাধনা করুন।' এই দুই সঙ্গীত প্রেমীর সাক্ষাৎ করে বাবার কথা মনে

পড়েছিলো। ভারতবর্ষে কত প্রতিভাধর ছেলে এবং মেয়ে আছে কিন্তু শিক্ষার অভাবে তাদের সঙ্গীতে বাধা পড়ে। তখন কি জানতাম ইন্দ্রাণী মুখার্জির ছেলে এবং স্বামী যে রিটায়ার হয়ে গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে দীর্ঘ যোল বছর পর কোলকাতায়। ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে যে সব পালটা লিখে দিয়েছিলাম সেগুলি সাধনা করে বর্ত্তমানেও সে গান করে এবং আমার শেখান সেই খাতাটা সযত্নে রেখে দিয়েছে।

সেকান্দ্রাবাদে দুই দিন থাকবার পরই আমেদাবাদে যাত্রা করি। আমেদাবাদে গিয়ে প্রমথেশ সেনের সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলাম প্রমথেশ সেন, তাঁর স্ত্রী এবং দুইটি ছোট মেয়ে সকালেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রেমী। কথায় কথায় যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে কে বলেছে, যে আমি মেয়েদের সামনে বাজাই না?' উত্তরে সেন যা বললেন, শুনে স্তম্ভিত হলাম। আমার জীবনে এরকম নানা প্রকারের অপবাদ অনেকেই দিয়েছে আর সেই সময়ে আমার মনে হয়েছে, 'নো বডি এভার কিকস এ ডেড ডগ।' তাই সেই শিল্পীর নাম লিখে লজ্জা দেব না, যে আমার নামে এই অপপ্রচার করেছে। আমি তো কারো সাতে পাঁচে থাকি না, কিন্তু আমার পেছনে কেন এই অপপ্রচার?

প্রমথেশ সেনের সঙ্গে সেই যে আলাপ হোল তারপর তাঁর চাকরিকালীন দীর্ঘ এগার বছর, বরাবর আমাকে আমেদাবাদে ডেকেছেন সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য।

আমেদাবাদে স্টেট ব্যাঙ্কের সৌজন্যে বাজনার পর আলাপ হোল ডাক্তার ডিগ্নভির সঙ্গে। একদিকে ডাক্তার আবার অপরদিকে সংবাদপত্রে সঙ্গীতের সমালোচক। আমার মৈহার থাকাকালীন বাবা আমেদাবাদে কনফারেন্সে যখন বাজাতে এসেছিলেন সেই সময় বাবার বাজনা ডিগ্নভি শুনেছিলেন। সঙ্গীত নিবেদক মণ্ডলের নিমন্ত্রণে বাবা বাজাতে এসে যে সেক্রেটারির বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন, সেই ভদ্রলোকের আগ্রহে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। বাবার প্রশংসা করে সেক্রেটারি এবং ডিগ্নভি বললেন, 'জীবনে এক নিরহঙ্কারী, বিনয়, সহজ জীবন যাপন কোন বড় উস্তাদের মধ্যে আমরা দেখিনি।' বাবা যে ঘরে ছিলেন সে ঘরও দেখলাম। আসলে প্রমথেশ সেন যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীর মালিকের উপর তলায় বাবা ছিলেন।

আমেদাবাদে আমার বাজনা শুনে, এক বড় শিল্পপতি, যাঁর সাতটি কাপড়ের মিল ছিল, আমাকে তাঁর বাড়ীতে বাজাবার অনুরোধ করলেন আমার দাদার মারফৎ। সেই মিল মালিকের এখানে আমার দাদা ডায়িং মাস্টার ছিল। রাজী হলাম বাজাতে। গুজরাটি শিল্পপতি শাহ তাঁর বাড়ীর বড় প্রাঙ্গণে যে সঙ্গীতের বাতাবরণ করেছিলেন তা অকল্পনীয়। বাড়ী গিয়ে মনে হোল, কোন প্রাচীন বাঙ্গালী বনেদী জমিদারের বাড়ি গিয়েছি। বাঙ্গালীদের মতো আল্পনা দিয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ হয়েছিল। চৌকির উপর আমার বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। দীর্ঘ প্রাঙ্গণের একদিকে সব শেঠ, মিলের ম্যনেজার এবং তাঁদের পরিবারের বসার আয়োজন করা হয়েছিল। অপর দিকে আমেদাবাদের সব সঙ্গীত রসিক এবং গুণীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেহেতু বাজনা শুরু হবে রাত্রি সাড়ে নয়টায় সেইজন্য এক ঘণ্টা আগে বুফে সিস্টেমে সকলকে খাওয়ালেন। জানি খুব বেশী যদিও দেড় দুই ঘণ্টা

বাজনা হবে তাই কিছু খেলাম না। বাজাতে যাবার আগে মিস্টার শাহর বৃদ্ধা মা আমার হাত ধরে মঞ্চে গিয়ে বসালেন। যাক যথাসময়ে বাজনা শুরু হোল। একটা বাজনা শেষ হবার পরই রাগের ফরমাইস হোল। অবাক হলাম। ভেবেছিলাম সাতটি মিলের মালিক সখ করে বাজনা রেখেছিল, কিন্তু তখন জানতাম না একদিকে সঙ্গীত মহল বসেছে এবং অপরদিকে মিলের শেঠেদের সঙ্গে বহু বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রেমী আছেন। সকলের ফরমাইসের রাগ বাজাবার পর যে মুহূর্তে তরফ মেলাচ্ছি ভৈরবী বাজাবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'এখন ভৈরবী শুনব না।' ভাবলাম এঁরা তো সাধারণ শ্রোতা নন। নিশ্চয়ই গান বাজনা করেন। ইতিমধ্যে নূতন রাগের ফরমাইস হয়েছে। ভোর পাঁচটার সময় বাজনা শেষ হোল। বাজনার শেষে জানতে পারলাম, একদিকে সঙ্গীত বিভাগের প্রোফেসার এবং গায়ক বাদক ছিলেন। তবলায় সহযোগিতার জন্য দুজনকে ঠিক করা হয়েছিল। যে বাতাবরণের মধ্যে সঙ্গীত হয়েছিল এবং যে সব রাগের ফরমাইস হয়েছিল তার জন্য বারেবারে বাবার কথাই স্মরণ হয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবে শ্রদ্ধায় চোখ বুজে এসেছিল, যখন শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কঠিন বন্দিসের প্রশংসা, বারেবারে শুনতে পেয়েছিলাম।' পরের দিন আমেদাবাদে রেডিওর কর্তৃপক্ষ আমার রেকর্ড করে নিল।

এর পর যথারীতি বম্বে যাত্রা করলাম বীরেন্দ্র মাথুর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট-এ বাজাবার জন্য, গর্গকে আগেই চিঠি লিখেছিলাম বম্বে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকব, কিন্তু চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম, আমি যে সময় বম্বে যাব, সেই সময় সে বম্বের বাইরে থাকবে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কারণ বাবার উপর যে বইটা লিখছি সেই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে বই সম্বন্ধে নানা কথা বলতে পারত।

বম্বেতে ট্রাষ্টের তরফ থেকে এবং আমার পরিচিত কাশীর কমল মিশ্রকে স্টেশনে দেখতে পেলাম। আমাকে নিয়ে তাঁরা হোটেলে রাখল। কমল মিশ্রের কাছে বীরেন্দ্র মাথুর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে পারলাম। কমল মিশ্র কাশীর লোক কিন্তু দীর্ঘদিন বম্বেতে আছে। কমল মিশ্রর ডাক নাম কালিন্দ্রি। এই নামেই বহু জায়গায় পরিচিত। কালিন্দ্রি, গায়িকা হীরা দেবীর স্বামী এবং নিজে সারা ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় নর্তক নতর্কীদের সঙ্গে পেছনে বসে গান করেন। কালিন্দ্রি নিজের মেয়েকে নাচ শেখায় এবং ট্রাষ্টের সর্বেসর্বার মেয়ের সঙ্গে তবলা বাজায় নাচের সঙ্গে।

ট্রাষ্ট সম্বন্ধে কমল মিশ্র বললো, 'বীরেন্দ্র মাথুর যে সরোদ বাজাত, সে রাজা সাহেবের বাড়ীতে থাকত। রাজা সাহেব বীরেন্দ্র মাথুরকে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর কাছে রাজা সাহেব নিজেও সরোদ শিখতেন। রাজা সাহেব হায়দ্রাবাদের অধিবাসী। বংশানুক্রমে তাঁরা রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। রাজা সাহেবের বাবা এবং ভাই হায়দ্রাবাদে থাকেন, কিন্তু রাজা সাহেব বম্বেতে থাকেন। বিরাট শিল্পপতি এবং উলের মিলের কর্ণধার। এত বড় শিল্পপতি হয়েও সময় করে রাত্রে কিছু সময় সরোদ বাজান। বীরেন্দ্র মাথুর মারা যাবার পর, তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বীরেন্দ্রনাথ মাথুরের স্ত্রী নিজের বাড়ীতে ছাত্র ছাত্রীদের সেতার বাজান। রাজা সাহেব বীরেন্দ্র মাথুরের মারা যাবার পর,

বীরেন্দ্র মাথুর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট করে, তাঁর নামে প্রতি বছরে একটা সঙ্গীত সম্মেলন করেন এবং নিজের বাড়ীতে গুণী গায়ক বাদকের বাড়ীতে বাজনা শোনেন। গায়ক বাদকের, টেপ করে নিজের লাইব্রেরীতে রাখেন এবং তাঁর জন্য সঙ্গীতজ্ঞদের পারিশ্রমিকও দেন। রাজা সাহেব অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমী। রাজা সাহেবের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। বড় মেয়ে কত্থক নাচ শেখে এক ভদ্রমহিলার নর্তকীর কাছে। সেই মেয়ের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করবার জন্য আমি প্রায় রোজ রাজা সাহেবের বাড়ী যাই।' কালিন্দ্রির আরো বলল, 'আপনার ন্যাশান্যাল প্রোগ্রাম শুনেই আপনাকে বাজাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাষ্টের তরফ থেকে।'

বম্বে পৌঁছেই প্রথমে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। গিয়ে শুনলাম, ধ্যানেশের বন্ধু আছে। সময় অসময়ের জন্য একটা ছেলে আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। প্রতিবারের মত যেমন বম্বে গিয়ে প্রথম দিনই খাবার খাই, এবারেও তার ব্যতিক্রম হোল না। খাবারের পর বললাম, 'আপনিও খেয়ে নিন।' বললেন, 'আমি সারাদিনে বিকেল পাঁচটার সময় চান করে একবারই কেবল খাই।' কথায় কথায় জানালাম ধ্যানেশের বন্ধুর জন্য মাছ, মুরগি সবই করেন কিন্তু দীর্ঘদিন নাকি তিনি নিরামিষ খান। মৈহার থাকাকালীন শুনেছিলাম পাঁঠার মাংস খেতেন না, কেননা ছোটবেলায় পাঁঠা কাটবার সময় তাজা রক্ত বেরোন দেখে কখনও খাবার ইচ্ছা হয়নি। মৈহারেও আমি বরাবর দেখেছি পাঁঠার মাংস কখনও খেতেন না, কিন্তু মাছ, মুরগি, ডিম সবই খেতেন। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ নিরামিষ এবং সারাদিন বিকেলে কেবল একবারই খান। এ ছাড়া একটা নূতন কথা শুনলাম। ডাক্তার নারায়ণ মেননের অনুরোধে, সপ্তাহে দুই দিন ন্যাশান্যাল সেন্টার ফর দি পারমারমিং আর্টস এ নিজে গিয়ে, গুরু শিষ্য পরম্পরা হিসাবে কয়েকজনকে শিক্ষা দেন। শিক্ষার সময় সেখানে কারো প্রবেশ করবার অধিকার থাকে না। এ ছাড়া কিছু ছাত্র ছাত্রীদের দুপুর থেকে বিকেল অবধি শেখান। আবার সন্ধ্যার পর রাত্রি নয়টা অবধি শেখান। তারপর আর শিক্ষা দেন না। বুঝলাম, 'সকাল থেকে রাত্রি অবধি ঘড়ির কাঁটার মত নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। সপ্তাহে দুই দিন বাড়ীতে কাউকে শিক্ষা দেন না, কেননা ন্যাশান্যাল সেন্টারে শেখাতে যান বলে। সব শুনে বললাম, 'সারাদিনে একবার খেলে তো গ্যাসট্রিক হবে।' বললেন, 'গ্যাসট্রিক তো আছেই। যেমন করে হোক যে কটা দিন চলে যায়, ভয় নাই। এত সহজে মরব না।' বললাম, 'আপনি তো নিজের মতো চলবেন, বোঝান বৃথা। কিন্তু সুস্থ হয়ে থাকাটা প্রয়োজন। নইলে এই রকম করে শরীরকে কষ্ট দিলে সবকিছু তো নিজেকেই করতে হবে।' এ কথা শুনে চুপ করে রইলেন। কে শোনে কার কথা। মনে মনে ভাবলাম, পরে এ বিষয়ে কথা বলব। বললাম, 'বম্বেতে আগামী কাল বাজাবার জন্য এসেছি। অন্নপূর্ণাদেবী আগেই আমার বাজনার কথা শুনেছেন, তাঁর এক বৃদ্ধ ছাত্রর কাছে যে গীটার বাজায়। যে ট্রাষ্ট এর সৌজন্যে বাজাতে এসেছি, তার কর্ণধারের বিষয়েও নিজের ছাত্রের কাছে শুনেছেন। হোটেলে যাবার আগে বললেন, 'খুব ভাল করে বাজাবেন বাবাকে স্মরণ করে।'

পরের দিন বাজাতে গেলাম। বাজাবার আগে কমল মিশ্র আলাপ করিয়ে দিলেন ট্রাষ্টের রাজা সাহেবের সঙ্গে। দেখলাম পায়জামা পাঞ্জাবী পরা। কোন বাহ্যিক আড়ম্বর নাই, কিন্তু

আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। বাজনা হোল যথাসময়ে। বাজাবার পর রাজা সাহেব আমাকে বললেন, 'আগামী কাল আপনার রাত্রি আটটার সময় কি কোন কাজ আছে?' বললাম, 'কেন বলুন তো?' বললেন, 'যদি কোন জায়গায় যাবার না থাকে, তাহলে দয়া করে আমার বাড়ীতে রাত্রে এসে খাবার খাবেন এবং তারপর যদি একটু বাজান তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।' এতবড় শিল্পপতি অথচ এত অমায়িক ব্যবহার কল্পনা করতে পারি নি। কমল মিশ্রর কাছে আগেই সব শুনেছিলাম, তাই রাজী হয়ে গেলাম। রাজা সাহেব বললেন, 'রাত্রি আটটার সময় আপনার হোটেলে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।' সম্মতি জানালাম। রাজা সাহেব কমল মিশ্রকে বললেন, 'যতীনবাবুকে হোটেলে পৌঁছে দিন।' হোটেলে যাবার সময় কমল মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাজা সাহেবের নাম কি?' জানতে পারলাম 'রাজা সাহেবের নাম লক্ষ্মী প্রসাদ পিত্তি।' রাজা সাহেবের বড় ভাই বদ্রীবিশাল পিত্তি হায়দ্রাবাদে তাঁর পিতার সঙ্গে থাকেন। বদ্রীবিশাল পিত্তি যদিও কিছু গান বাজানা করেন না কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমী।

রাত্রে বারবার মনে পড়তে লাগল তিনজন শিল্পপতি সঙ্গীতজ্ঞর কথা। এ যাবৎ তিনজন শিল্পপতির সাক্ষাৎ হয়েছে , যাঁর মধ্যে একজন হারমোনিয়াম বাজান এবং বাকী দুজনে গান করেন। আসলে এই শিল্পপতিরা নিজের বাড়ীতে আসর বসিয়ে গান করেন। এই আসরে বহু গুণী শিল্পী, শিল্পপতির প্রশংসা করে নিজের আখের গোছান, বারবার মিথ্যা প্রশংসা করে। মনে মনে ভাবলাম, এই রাজা সাহেব কোন শ্রেণীর? তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, অন্য শিল্পপতিরা যেমন চামচেদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকেন, রাজা সাহেব তার ব্যতিক্রম। যাক আগামীকাল তাঁর বাড়ী গেলেই বুঝতে পারব।

পরের দিন অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গিয়ে রাজাসাহেব পিত্তির কথা বললাম। বুঝলাম, তিনি রাজা সাহেবের কথা জানেন, কেননা তাঁর বৃদ্ধ ছাত্র ঘাসওয়ালা রাজা সাহেবের সঙ্গে পরিচিত। রাজা সাহেবের কাছে বাজাবার আমন্ত্রণ পেয়েছি শুনে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবেন এবং খুব ভাল করে বাজাবেন।' আমি বাবার গুরুদক্ষিণার কথা সব বললাম। এ যাবৎ যা যা সংগ্রহ করেছি এবং মদনলাল ব্যাসের কথাও বললাম। উপস্থিত বম্বেতে দুই তিনজনের সাক্ষাৎকার নেব। আমাদের ঘরের আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার সময়াভাবে এ যাবৎ নিতে পারি নি। আগামী বছরের প্রথমে, বিদেশ থেকে এলেই তাঁদের সাক্ষাৎকার নেব। এরপর যে মুহূর্তে খাতাটি বার করে অন্নপূর্ণাদেবীকে সাক্ষাৎকারের কথা বললাম, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দাদা এবং পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎকার নেবেন। আমি কি বলব?' আমি তো অন্নপূর্ণাদেবীকে চিনি। তাঁর মুখ থেকে যে কথা বার করাটা খুবই কঠিন। শুভর যাবার কারণটা যে দিন বলেছিলেন, সেই দিনটাই ছিল ব্যতিক্রম। আবেগের ঝোঁকে নিজের অজান্তে এক নাগাড়ে যা বলেছিলেন, আজ পর্যন্ত কখনও সেরকম কোন কথাই বলতে দেখি নি। যেহেতু বাবার আজ্ঞায় বইটা লিখছি, সেইজন্য অনেক বোঝানর পর আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই বললেন, 'আজ থাক। আজ আপনাকে রাত্রে বাজাতে হবে।' বুঝলাম আর কিছু বলববেন না। সাক্ষাৎকার নেবার আগে আমি কয়েকটা প্রশ্ন আগে থেকেই লিখে রাখতাম লোক হিসাবে। অন্নপূর্ণাদেবীর জন্যও আগে থেকে প্রশ্ন তালিকা

লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু নামমাত্র উত্তর পেলাম। যাই হোক ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর বাবার দোহাই দিয়ে বার করতে হবে। কিন্তু হয়েছে একটা বিপদ। আসলে সন, তারিখ অন্নপূর্ণাদেবী ঠিক মত স্মরণ করে বলতে পারেন না। অবশ্য এ জিনিষটা মৈহার থাকাকালীনও দেখেছি। যাক কিছুক্ষণ কথা বলে হোটেলে চলে গেলাম।

সন্ধ্যা বেলায় ঠিক ঘড়ি দেখে, কমল মিশ্র আমাকে নেবার জন্য হাজির। আগেই শুনেছিলাম রাজা সাহেব সময়ের নিয়মানুবর্তিতা বিশেষ ভাবে পালন করেন। গাড়ীতে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'সঙ্গত করবার জন্য তবলাবাদক কাকে ঠিক করা হয়েছে।' শুনলাম, সঙ্গত করবার জন্য বম্বের সব থেকে ভাল মৃদঙ্গবাদক সেজবালকে ঠিক করা হয়েছে। সঙ্গত করার জন্য মৃদঙ্গ বাদক ঠিক করা হয়েছে শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'রাজা সাহেব তবলার বদলে মৃদঙ্গ কেন ঠিক করলেন? উনি কি ধ্রুপদ, ধামারের অনুরাগী?' উত্তরে কমল মিশ্র বলল, 'আমিই রাজা সাহেবকে বলেছিলাম, ভারতবর্ষে একমাত্র আপনিই সঙ্কটমোচনের অমরনাথ মিশ্রের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজান। এ ছাড়া অন্য কোন যন্ত্রবাদককে মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজাতে দেখি নি। এই কথা শুনেই রাজা সাহেব মৃদঙ্গের ব্যবস্থা করেছেন। রাজা সাহেব আসলে আলাপ শুনতে ভাসবাসেন। সঙ্গতের সময় তবলার সঙ্গে লড়ন্ত পছন্দ করেন না। সঙ্গতের সময় তবলা বাদক সুন্দর ঠেকা লাগালে এবং পরিমিত সঙ্গত করলে রাজা সাহেব খুশী হন।' এ কথা শুনে ভালই লাগল। এরপর কমল মিশ্র বলল, 'রাজা সাহেব দুপুরে অফিসে কেবল কফি এবং ফল খান। যার জন্য রাত্রে ঠিক ঘড়ি দেখে নয়টার সময় খাবার খান। আমাদের সঙ্গে খাবার খেয়ে বাজনা শুনবেন।' বললাম, 'খাবার পর আমার বাজাবার অভ্যাস নাই। আপনারা সকলে খেয়ে নেবেন। আমি বাজাবার পরই খাব।' একথা শুনে কমল মিশ্র বলল, 'আপনি খাবার না খেলে কি রাজা সাহেব খেতে পারেন? এক কাজ করবেন, খাবার খেয়ে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে তারপর বাজাবেন।' চিন্তায় পড়লাম। খাবার খেয়ে বাজনা বাজান কল্পনা করতে পারি না, কেননা এ যাবৎ করি নি। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম যে লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল নামমাত্র ফল খান, তাঁর জন্য রাত্রি করে খাওয়া নিশ্চয়ই কষ্টকর। যা হোক গিয়ে দেখা যাবে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম সমুদ্রের ধারেই বাড়ী। লিফ্‌ট চড়ে নির্দিষ্ট ফ্লাটে গিয়ে কমল মিশ্র কলিং বেল বাজাল। চাকর দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে দেখলাম রাজা সাহেব। নিজে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের এক অদ্ভুত শীতলতা আমাকে স্পর্শ করল। আর তার সঙ্গে অনুভব করলাম জমাট বাঁধা একরাশ বিস্ময়। এতদিন বহু সম্ভ্রান্ত লোকের কক্ষে প্রবেশ করার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু এমন অমায়িক সরল ব্যবহার স্বামী-স্ত্রীর, সুসজ্জিত সঙ্গীতের চিত্র ও অলংকৃত বিলাসবহুল কক্ষ এর আগে কোথাও চোখে পড়ে নি। কয়েক সেকেণ্ড হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পুরু কার্পেটের ওপর অতি সন্তর্পণে পা ফেলে, ধীরে ধীরে এগিয়ে প্রথমেই সরোদটি একটি সোফার উপর রাখলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে বসবার পর প্রথমেই মৃদঙ্গবাদক সেজবালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর এক বৃদ্ধ

বয়স্ক লোককে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি অন্নপূর্ণাজীর কাছে বাজনা শেখেন।' ভদ্রলোক নিজের থেকেই বললেন, 'আমার নাম জি. এল ঘাসওয়ালা। আমি মাতাজীর কাছে গিটার শিখি। এই বয়সে আর কি বাজাব? সঙ্গীতকে আমি ভালবাসি বলেই মাতাজীর কৃপা পেয়েছি। ব্যবসা করে যেটুকু সময় পাই একটু বাজাই। গতকাল আপনার বাজনা শুনেছি। আজ রাজা সাহেবের কৃপায় একান্তে আপনার বাজনা শুনব।' ঘাসওয়ালার কথা শুনে অবাক হলাম। এত বয়স হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত শিখবার কত বড় স্পৃহা। এর পর রাজা সাহেব নিজের পারিবারিক বন্ধু এবং অফিসের সেক্রেটারি এ. পি শুক্লার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজা সাহেব পারিবারিক বন্ধু বললেও এ. পি শুক্লাকে দেখলাম, রাজা সাহেব বলেই সম্বোধন করছেন। ইতিমধ্যে ঘরে প্রবেশ করল দুটি ছোট মেয়ে এবং একটি ছেলে। রাজা সাহেব আমাকে দেখিয়ে তাদের বললেন, 'নমস্কার কর।' বুঝলাম, রাজা সাহেবের ফুলের মত ছেলে এবং দুই মেয়ে। রাজা সাহেব নিজে থেকেই বললেন, 'খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনার বাজাতে কষ্ট হবে না তো? যদি কষ্ট হয় তাহলে বাজনার শেষেই সকলে খাব।' কমল মিশ্রের কাছে আগেই শুনেছিলাম রাজা সাহেব দুপুরে নাম মাত্র কিছু খান এবং সেইজন্য নয়টার সময় খাবার খেয়ে নেন। আমার জন্য সকলের অসুবিধা হবে বলে বললাম, 'যদিও বাজাবার আগে কখনও খাই না, কিন্তু আপনার নিত্য নৈমিত্তিক কার্যক্রমের কথা শুনেছি বলেই, খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাজাব।' রাজা সাহেবকে বললাম, 'প্রথমে আপনার বাজনা শুনব তারপর আমি বাজাব।' রাজা সাহেব বললেন, 'আমি আপনার সামনে কি বাজাব? অফিস থেকে আসবার পর অফিসের চিন্তা মাথায় ঠাঁই দিই না। সেইসময়ে সখে একটু বাজাই এবং অধিক রাত্রি অবধি বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ি। বই এবং সঙ্গীত আমার অবসর সময়ের সাথী।' মনে মনে ভাবলাম, যে তিনজন সঙ্গীত শিল্পপতিদের দেখেছি তাদের থেকে রাজা সাহেব ব্যতিক্রম। ইতিমধ্যে চাকর এসে বলল, 'রাণী সাহেবা খাবারের জন্য ডাকছেন।'

এতক্ষণ যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হোল, নিঃসন্দেহে তাঁরা পরিমার্জিত ভদ্রলোক কিন্তু সকলের সন্তর্পণ উপস্থিতিতে যিনি পরিচিত পর্বের পরেই অন্তর্দ্ধান হয়েছিলেন, সেই ভদ্রমহিলা অর্থাৎ শ্রীমতি উর্মিলা পিত্তিকে আমার এক মর্যাদাময়ী বিস্ময় বলে মনে হোল। পরিচয়ের ফাঁকে জেনে নিয়েছিলাম কানপুরের বিশিষ্ট শিল্পপতি জে. কে. ইন্ডাস্ট্রিজ পরিবারের মেয়ে ইনি। সোনার ঘর থেকে সোনার ঘরে এসেছেন এবং তাঁর মধ্যে চন্দনের এই মর্যাদাপূর্ণ শীতলতা, নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে নানা কারণে।

সর্বসাকুল্যে দশজনে বিরাট ডিনার টেবিলে খাবারের নানা প্রকরণ দেখলাম। খাবার খেয়ে ড্রয়িং রুমে এসে দেখি, ভোল পালটে গেছে। বাজাবার জায়গায় দেখলাম মোটা তোষকের উপর ডানলাপ। যদিও বিশেষ অসুবিধা হবে না, তাহলেও ডানলাপ হঠিয়ে দিতে বললাম। মিনিটের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাজাবার আগে রাজা সাহেব নিজের হাতে কাশীর মঘই পান কিমাম দিয়ে খেতে দিলেন। এত ভাল কিমাম জীবনে খাই নি। পরে শুনেছিলাম কিমামটা তৈরী করেন রাণী সাহেবা। মৃদঙ্গ মেলাবার পর, বাজাবার আগে

রাজাসাহেব এবং রাণী সাহেবাকে 'পিত্তিজি' এবং 'ভাবি' সম্বোধন করে বললাম, 'বলেন তো এবারে শুরু করি।' পিত্তিজি সম্মতি জানিয়েই, একজনকে দেখলাম, চোখের ইসারায় কি নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা নীল আলোয় ঘরের পরিবেশটা বদলে গেল। সম্পূর্ণ আলাপ বাজিয়ে যে মুহূর্তে শেষ করলাম, দেখলাম টিউব লাইট জ্বলে উঠল। পিত্তিজি বললেন, 'আলাপের সময় নীল আলো পরিবেশের জন্য জ্বালিয়েছিলাম। উপস্থিত আপনাকে গৎ বাজাবার সময় দেখতে পাব বলে টিউব লাইট জ্বালালাম। মনে মনে শিল্পীর রুচির প্রশংসা করলাম। পিত্তিজি বললেন, 'যেখানে বসে আপনি বাজাচ্ছেন, এইখানে দীর্ঘ ষোল বছর আগে আপনার উস্তাদ বাবা 'শুদ্ধ বসন্ত' বাজিয়েছিলেন। আজ এতদিন পরে এই প্রথম 'শুদ্ধ বসন্ত' শুনলাম। এ যাবৎ এই রাগটি কারো কাছে শুনি নি।' মনে মনে অবাক হলাম। দ্রুপদ অঙ্গের এই অপ্রচলিত রাগটি দীর্ঘদিন আগে শুনেও, পিত্তিজি মনে রেখেছেন ভেবে বিস্মিত হলাম। যেখানে বসে বাজাচ্ছি সেইস্থানে বাবা বাজিয়েছেন ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে গেলাম।

যন্ত্র এবং মদৃঙ্গ আবার মেলাচ্ছি, হঠাৎ পিত্তিজি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'গৎ কি শুদ্ধ বসন্তেই বাজাবেন?' মনে হোল পিত্তিজি বোধ হয় পরীক্ষা করছেন। হয়ত ভাবছেন মৃদঙ্গ দেখে গৎ এবং তাল আগের থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তাই বললাম, 'আপনার যদি কোন রাগ শুনবার বাসনা থাকে তাহলে বলুন? আমি সেই রাগ বাজাব।' পিত্তিজি বললেন, 'আপনার যদি মেজাজ হয় তাহলে শ্রী রাগে গৎ বাজান আর নইলে যা আপনি ভেবেছেন তাই বাজান।' বললাম, 'ঠিক আছে 'শ্রী' রাগই বাজাব।' ভাবলাম, 'যে রাগের ফরমাইস করেছেন তার ফলে কোন সুর বদলাতে হবে না একমাত্র কোমল 'র' কে সাকারত্মক 'র' করতে হবে। অর্থাৎ কি না আদলের রূপে অতি কোমল 'র' থেকে আর একটু পেলব অর্থাৎ 'শ্রী' এর আলোয় আলোকিত।' এ ছাড়া তরফে শুদ্ধ ধৈবতকে কোমলে মেলাতে হবে। আবার একটু চমক লাগল। ভাবলাম এ যাবৎ যে কটা মুদ্রা রাক্ষস দেখেছি, তাঁদের ভিতর তো ইনি ভিন্ন। এঁর কিন্নর জ্ঞান আছে। যন্ত্রকে বিরক্ত না করে সমাশ্রিত পরিবর্তন অনুরোধ করেছেন। বাজানর আগ্রহটা আমার আরো তীব্রতর হোল।

কিন্তু ওই এক ব্যামো। ঠেকে শেখার তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাই পরের ঝামেলা আগেই পাট সারব ভেবে মৃদঙ্গ বাদককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন তালে বাজাব?' মৃদঙ্গ বাদক সেজবাল বললেন, 'যন্ত্রের সঙ্গে বাজানর অভ্যাস নাই, কেননা কোন যন্ত্রকারই এখন মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজান না। তাই যদি কোন ভুল ত্রূটি হয় তা হলে ক্ষমা করবেন।' সেজবালের এই বিনয় উক্তি শুনে বললাম, 'আপনার প্রশংসা শুনেছি, বম্বের গুণী মৃদঙ্গ বাদক। আপনার জন্য যন্ত্রের সঙ্গে যে কোন তালে বাজাতে অসুবিধার তো কোন কারণ নাই।' সেজবাল বললেন, 'চৌতালেই প্রথম বাজান।' বললাম, 'ঠিক আছে। বিলম্বিত চৌতালে বাজিয়ে দ্রুত 'শুলতালে' বাজালাম। দ্রুত গৎ বাজাবার আগে অবশ্য 'শুল' তালের ঠেকা বলবার পরেই বাজালাম। এর পর ধামার বাজিয়ে শেষ করলাম। বাজনা শেষ হবার পর পিত্তিজি বললেন, 'আগামী কাল কি আপনার সন্ধ্যাবেলায় কোন কার্যক্রম আছে?' বললাম, 'তিনদিন পরে

টিভিতে রেকর্ডিং হবে। এ ছাড়া কোন কার্যক্রম নাই। টিভির প্রোগ্রাম করে কাশী চলে যাব।' পিত্তিজি বললেন, 'আগামীকাল যদি বাড়ীতে আসেন তা হলে মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজনা শুনব।' বাজনার পরিবেশ দেখে সম্মতি জানালাম। পরক্ষণেই বললাম, 'আপনার কথায় বুঝলাম, আমার মৈহার ছাড়ার দুই বছর আগেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সনে বাবা আপনার বাড়ীতে এই ঘরে বাজিয়েছিলেন। একটা কথা বলুন তো, বাবাকে কি করে আপনার বাড়ীতে আনিয়ে কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন?' পিত্তিজি বললেন, 'আমার বাড়ীতে বীরেন্দ্র কুমার মাথুর থাকত।' বাবা বীরেন্দ্র মাথুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেইসময় পুনা থেকে বাজিয়ে বাবা বম্বেতে আসেন। বীরেন্দ্র মাথুর বাবাকে অনুরোধ করে আমার এখানে বাজানর জন্য। বাবা রাজী হয়ে আমার এখানে বাজাতে আসেন।' এই কথা শুনে মনে হোল আমার বই-এর জন্য কিছু উপাদান পেতে পারি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবার সঙ্গে তবলায় কে সহযোগিতা করেছিল?' পিত্তিজি বললেন, 'তবলার সহযোগিতা করেছিল সুদর্শন অধিকারী এবং তানপুরা ছেড়েছিলো রবিশঙ্কর।' যতটা জিজ্ঞাসা করি তারই কেবল উত্তর পাই। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই বাজনার সময় কোন স্মরণীয় ঘটনা কি কিছু হয়েছিলো?' পিত্তিজি হেসে বললেন, 'বাজাবার আগে বাবাকে দুধ এবং ফল খেতে অনুরোধ করেছিলাম। সে কথা শুনে বাবা বলেছিলেন, 'যদি ভাল বাজাতে পারি তাহলে দুধ এবং ফল খাব, কিন্তু বাজনা ভাল না হলে খাব না। বাবার এই সরল স্বভাব দেখে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বাবা সেই এক কথা বলে 'শুদ্ধ বসন্ত' বাজিয়েছিলেন, এবং পরে বিহারী বাজিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত 'শুদ্ধ বসন্ত' গায়ক বা বাদকের কাছে শুনি নি। এ ছাড়া বিহারী যেরকম শুনেছি, সেই রকম বিহারী পূর্বে কখনও শুনি নি। আমার কাছে বহু পুরোনো গায়ক বাদকের রেকর্ড আছে। বিহারী যদিও শুনেছি এবং রেকর্ডও আছে, কিন্তু সেই বিহারীর সঙ্গে বাবা যে বিহারী বাজিয়েছিলেন তা ছিল স্বতন্ত্র। বাবা খুব মেজাজে শুদ্ধ বসন্ত বাজিয়েছিলেন। কিন্তু বাজনা শেষ হবার পরই, বাবা যখন বিহারীর আলাপ করেই গৎ বাজাতে যাবেন সেই সময়ে সুদর্শন অধিকারী বাবাকে বলে, ফিরদোস্ত তালে বাজাতে। এই কথা শুনেই বাবা চটে যান। বাবা বলেন, 'ত্রিতালই ঠিক বাজাতে পার না, ফিরদোস্ত তালে বাজাতে চাও।' এই কথা বলেই বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।' এর পর বাবা যখন বাজান তখন সুদর্শন অধিকারীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।' কথার মাঝখানে হঠাৎ শ্রীমতি পিত্তিজি বলেন, 'বাবা ফিরদোস্ত শুনে বলেছিলেন, 'বাচালতা কর।' শ্রীমতি পিত্তিজির মুখে বাংলা কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাংলা বোঝেন?' উত্তরে হেসে বললেন, 'আমি তো ছোটবেলা থেকে কোলকাতায় মানুষ হয়েছি। বাংলা ভালই বুঝি তবে ভাল বলতে পারি না।' কি জানি কেন, কৌতুহল হোল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোলকাতায় যখন ছিলেন, গান বাজনা কিছু করেছেন নাকি?' হেসে বললেন, 'বাজনার আমি ভক্ত চিরকালই। কোলকাতায় কিছু দিন সেতার শিখেছিলাম। কিন্তু সেটা কিছুই নয় যা পরে বুঝতে পেরেছি। তবে বাজনা শুনতে ভালবাসি।' এ কথা শুনে মনে হোল, গুণে এবং রূপে তিনি অপরূপা। সচরাচর ধনী শিল্পপতিদের মধ্যে এরকম দেখা যায় না। এবারে পিত্তিজিকে বললাম, 'তারপর কি হোল?' পিত্তিজি বললেন,

'বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাজনার শেষে যখন দুধ এবং ফল খাবার জন্য অনুরোধ করলাম, বাবা বললেন, 'বাজনা ভাল হয় নি তাই দুধ খাব না।' বাবার এই সারল্য দেখে বারবার অনুরোধ করবার পর দুধ এবং ফল খেলেন। বাজনা বাজিয়ে যাবার সময়, আমি বাবাকে সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলাম, আপনাকে শ্রদ্ধা ছাড়া দেবার মত আমার তো কিছু নাই, তাহলেও আমার এই সাধারণ জিনিষটা গ্রহণ করুন। এই বলে একটা খামের মধ্যে যৎসামান্য অর্থ জোর করে বাবার বাজনার বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম। বাবা আপত্তি করলেও বীরেন্দ্র মাথুরের অনুরোধে আর কিছু বললেন না।' এর পর কিছুক্ষণ গল্প করে দেখলাম, ইংরেজীর তারিখ বদলে গেছে। কমল মিশ্রের সঙ্গে হোটেলে পরের দিন আবার আসব বলে বিদায় নিলাম।

হোটেলে এসে কি জানি কেন আমার ঘুম এলো না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, বাবার বই লেখার ব্যাপারে ডাক্তার রতনজানকারের সাক্ষাৎকার নেবো। কারণ দীর্ঘদিন মরিস কলেজে থাকার ফলে বাবার সম্বন্ধে বহু তথ্য পেলাম। বর্ত্তমানে বম্বেতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন শুনেছি। এক একজনে এক এক ঠিকানা বলেন তাই দেখা করা সম্ভব হয় নি। আরও কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হোল না, কেননা বম্বেতে কোন জায়গায় চিনে একলা আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রহের ফের, ঠিক এই সময় গর্গ এবং ব্যাস বম্বেতে নাই। গর্গ এবং ব্যাস থাকলে বই সম্বন্ধে আলোচনা করতাম এবং তাঁদের নিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতাম। যদিও দুই তিনজনের সঙ্গে দেখা করলাম, কিন্তু বিশেষ কোন মূল্যবান তথ্য পেলাম না। পরের দিন সকালে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গিয়ে দেখা করলাম, এবং পিত্তিজির বাড়ীর সঙ্গীত ঘটনার কথা বললাম। অন্নপূর্ণাদেবী বাজনার কথা শুনে খুশী হলেন। ঘাসওয়ালাজী সম্বন্ধে বললেন, 'এ ধরনের শিক্ষার্থীকে, না করতে সঙ্কোচ লাগে কিন্তু তাঁর ফলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তবে সঙ্গীতে অনুরাগ আছে বলে নাও করতে পারি না।' এবারে কথায় কথায় বাবার কিছু ঘটনা জানবার জন্য কিছু প্রশ্ন করলাম, কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর কাছ থেকে, কথা বার করা অসাধ্য ব্যাপার। আসলে নিজের বিষয়ে কিছুই বলতে চান না, কিন্তু কথার ছলে কিছু কিছু ঘটনা জানতে পারি, কিন্তু দীর্ঘ সাতবছরে প্রতিবছর বম্বে গিয়ে বাবার দোহাই দিয়ে কিছু সংবাদ যোগাড় করেছি। অবশ্য এ অনেক পরের কথা।

পরের দিন ঘড়ি দেখে পিত্তিজির বাড়ী বাজাতে গেলাম। সেজবাল আমার সঙ্গে সঙ্গত করল। অন্য তালে বাজাবার অভ্যাস না থাকাতে, যখন ঠেকা বলে দিলাম কোনরকমে সঙ্গত করলেন। পনেরো, সতেরো এবং তেরো মাত্রার তালে বাজালাম। পরের দিন ঠিক হোল, কাশীনাথ মিশ্র যে টিভির স্টাফ আর্টিস্ট সে তবলা বাজাবে। কাশীনাথ মিশ্র কাশীর ছেলে এবং দীর্ঘদিন বম্বেতেই থাকে এবং প্রায় সব যন্ত্রকারদের সঙ্গে বাজায়। পিত্তিজির কথায় রাজী হয়ে আজও সেজবালের সঙ্গে বাজিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন কাশীনাথ মিশ্রর সঙ্গে বাজালাম। পরের দিন আবার বাজাবার জন্য পিত্তিজি অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে দিন সঙ্গত করবার জন্য কাউকে ডাকেন নি। সঙ্গত করবার জন্য কাউকে

না দেখে অবাক হলাম। পিত্তিজি বললেন, 'আজ কেবল আলাপ শুনব।' নানা অপ্রচলিত রাগ বাজাবার জন্য অনুরোধ করলেন। মনে মনে ভাবলাম, 'বাবা মৈহারে দুইবার ক্রমাগত দুইমাস কেবল অপ্রচলিত রাগ শিখিয়েছিলেন। যদি সেই সব রাগ না শিখতাম, তাহলে আমার অবস্থা তো কাহিল হ'তোই, এ ছাড়া বাবার সম্মান রাখতে পারতাম না।' কয়েকদিন যাবার পর যখন খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, একদিন বললাম, 'এই সব অপ্রচলিত রাগ জিজ্ঞাসা করে আমাকে কি পরীক্ষা করেন এবং বোকা বানাতে চান?' পিত্তিজি বললেন, 'আপনি বাবার কাছে শিখেছেন দীর্ঘদিন। আপনাকে এই সব রাগ জিজ্ঞাসা না করলে কাকে জিজ্ঞাসা করব? আমার এখানে ভারতের অনেক গুণীদের এই সব রাগ জিজ্ঞাসা করেছি, গাইতে বা বাজাতে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলেই বাহানা করে এড়িয়ে গিয়েছেন।' এ কথা শুনে অবাক হলাম। অবশ্য পিত্তিজিকে আমিও পরীক্ষা করেছি। বুঝেছি যেমন রাগের ফরমাস করেন, সেই রাগ সম্বন্ধে নিজেও গবেষণা করেছেন এবং বুঝতে পারেন। সেই যে আলাপ হয়েছিল, তারপর দীর্ঘ বাইশ বছর, প্রতি বছরে বম্বে গিয়েছি এবং পিত্তিজির বাড়ীতে গিয়ে বাজিয়েছি। বর্ত্তমানে বম্বে গেলে, খালি থাকলেই পিত্তিজির বাড়ীতে বাজাই। নানা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তবে একটা কথা বলতে পারি। সঙ্গীতের এত বড় বোদ্ধা, আমার জীবনে কমই দেখেছি। তাঁর এখানে বাজিয়ে আমি নিজেও আনন্দ পেয়েছি। প্রায় দশদিন বম্বে থেকে অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা করে কাশীতে ফিরে গেলাম। কাশীতে যাবার পূর্বদিন পিত্তিজি আমাকে বিনয়ের সঙ্গে একটা খাম দিলেন যা আমার কাছে আশাতীত।

বম্বে থেকে কাশীতে ফিরেছি। এক মাসও পুরো হয়নি, ইতিমধ্যে মৈহার থেকে অরুণের চিঠি পেলাম। আমার কয়েকটা বাজনার ব্যবস্থা করেছে। এই চিঠি আমার কাছে বরদান মনে হোল। মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন সর্বদাই ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবলাম মৈহারে গিয়ে এবারে কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নেবো। এ ছাড়া যে সমস্যাটার নানা লোকের মারফৎ কাগজে বেরিয়েছে, এমন কি বাবাও এক জায়গায় সাক্ষাৎকরে বলেছেন সেই কথাটার সমাধান করতে হবে। মজার কথা সেই বিষয়টি আমার মৈহার থাকাকালীন বাবা অনেককে অন্য কারণে বলেছেন।

নির্দিষ্ট সময়ে মৈহারে গেলাম। অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বই লেখা কতদূর এগোলো?' বললাম, 'অনেক জিনিষ সংগ্রহ করেছি, কিছু এখনও বাকী আছে। সবচেয়ে বড় কথা আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় নি। এবারে দুজনেই বিদেশ থেকে এলে যেমন করে হোক সাক্ষাৎকার নেবো। যদিও আগে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু সময় অভাবে সম্ভব হয় নি। আলিআকবরের কাছে একটা মূল্যবান জিনিষ আছে, সেটা পেলে আমার বইয়ের মস্ত বড় উপাদান হবে।' মৈহারে দেখলাম, অরুণের দুই মেয়ে পিতু ও ঋতু, সেতার ও সরোদ খুব মন দিয়ে বাজাচ্ছে। যদি তিনচার বছর আরও ঠিক মত শিক্ষা এবং সাধনা করতে পারে তা হলে অন্ততঃ সঙ্গীতে প্রবেশ করতে পারবে। ভাল লাগলো, যখন দেখলাম ইলা ভোরবেলায় দুই মেয়েকে বাজাবার জন্য উঠিয়ে দেয়।

সকালে বাবার কাছে গেলাম। বাবার শরীর সেই একরকম। কোন উন্নতি নাই। চুপচাপ

শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'বই লিখছ তো?' বললাম, 'লিখছি।' দেখলাম বাবা মনে মনে খুশী হলেন। দেখলাম একটা গুলমার্গের এয়ার কুলার রয়েছে কিন্তু চলছে না। এত গরম অথচ মেসিন চলছে না কেন? জুবেদা বেগমের কাছে শুনলাম আলিআকবরের নির্দেশে গুলমার্গ কেনা হয়েছে গরমের জন্য, কিন্তু বাবা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আসলে বাবা চিরকালই সাধারণ ভাবে জীবন কাটাতে পছন্দ করতেন, নইলে বাড়ীতে একটা ইলেকট্রিক ফ্যান লাগান নি কেন? বাবাকে বরাবরই বলতে শুনেছি, 'সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করবে। বিলাসিতা বাড়ালেই সেটা বাড়তেই থাকে। বিলাসিতায় মন দিলে সঙ্গীতের ক্ষতি হয়।' বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না বলে সংবাদপত্রে যে বেরিয়েছিল, সে নিয়েও কথা হোল জুবেদা বেগমের সঙ্গে। ব্যাপারটা বুঝলাম। এর আগে যখন মৈহার এসেছিলাম, তখনও বাবাকে অসুস্থ দেখেছিলাম। অরুণ ও ইলা বাবার সেবা করছে অক্লান্ত ভাবে। আলিআকবরের নির্দেশে আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখবার জন্য বারান্দায় এয়ার কুলারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু বাবা সেই যন্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করায়, তা বাধ্য হয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অবাক হয়ে ভাবি প্রাচুর্যের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও বাবা কেন এই দারিদ্র্য বরণ করেছেন? কিসের জন্য? কার জন্য? যাক এবারে কথার ফাঁকে ফাঁকে, মা এবং জুবেদা বেগমের কাছেও বহু তথ্য জোগাড় করলাম।

বাবার কতই তো শিষ্য হয়েছে যাঁরা সব জায়গায় বলে থাকে, বাবার কাছে শিখেছে। কিন্তু আশ্চর্য! বাবার দুইবার স্ট্রোক এবং প্রস্টেটগ্লাণ্ড হবার পর, দীর্ঘ নয়বছর ক'জন বাবার কাছে দেখা করতে এসেছে? মনে মনে নানা কথা ভাবছি, হঠাৎ বাবা বললেন, 'বিপদের দিনেই লোক চেনা যায়। যদি এখনও শেখাতে পারতাম তাহলে কত শিষ্যই আসত। কিন্তু যেহেতু আমি অক্ষম, তাই কেউ আর আসে না। পরের কথা কি বলব? নিজের লোকেরাই আসে না।' এই বলে আমার বন্ধু ও ইলাকে দেখিয়ে বললেন, 'গতজন্মে এঁরা নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলো, নইলে রোজ নিয়মিত সকাল বিকেলে আমার কাছে আসে কেন? আমি তো এঁদের কোন শিক্ষা দিই নি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্য কথা বইতে লিখছো তো?' গতকালই জিজ্ঞেস করেছেন, আবার আজও সেই কথা বললেন। মনে মনে ভাবলাম, বাবার উপর সত্য কথা সব লিখবার জন্য এত আগ্রহ কেন? নিজের মনে দুবছরে যা ভেবেছি বোধ হয় ঠিক। মনে হয় মুখ্য পাঁচটা জিনিষ, যে ভুল চলে আসছে, তার জন্য বাবা মনে মনে অপরাধী ভাবছেন, যার জন্য মানসিক অন্তরদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাবার প্রশ্নের উত্তরে আজও বললাম, 'অনেকটা শেষ করেছি কিন্তু আপনার জীবনী লেখা তো সহজ নয়।' বাবা বললেন, 'একটা কথা নিশ্চয়ই লিখবে, আমার মা অন্নপূর্ণাকে শকুন্তলার মত করে মানুষ করেছিলাম কিন্তু তাঁকে রবু রাবণের মত সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। আর আলিআকবর? আলিআকবর হল চোর। আমার ঘরের বাজনার সব খাতাপত্র নিয়ে চলে গিয়েছে। সে হোল বিভীষণ।' এই কথা বলেই কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'আমার মা অন্নপূর্ণার বাজনায় মা সারদা দেবীর আবির্ভাব হয়। আলিআকবরের মধ্যেও সেই ভাব ছিল, সেও বাজনা দিয়ে সকলকে কাঁদাতে

পারত, কিন্তু রবু হোল মিরাশি, মিথ্যাবাদী। রবুর কুমন্ত্রণায় আলিআকবরও ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে গিয়েছে।' বাবার এই উক্তিতে উত্তেজিত ভাব দেখে, ইলা কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বাবাকে বলল, 'এখন আপনার মাথা ধুয়ে দেব। লক্ষ্মী ছেলের মত এবারে খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আমারও তো খিদে পেয়েছে।' বাবা এই কথা শুনে বললেন, 'আরে আরে, মা তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? এখানেই খাবার খেয়ে নাও।' ইলা বাবার গা মুছিয়ে বিছানায় চাদর বদলে দিল। এই সময় বাবা নিঃসাড়ে নিজের লুঙ্গি, চাদর প্রায় খারাপ করে দিতেন। ইলা মা'র কাছে গিয়ে খাবার এনে বাবাকে খাওয়ালো। তারপর অরুণের জিপে করে আমরা বাড়ী গেলাম।

বাড়ী যাবার সময়ে ভাবলাম বাবা কেন উত্তেজিত হয়ে গেলেন, আলিআকবর রবিশঙ্কররের কথা বলতে গিয়ে। আসলে প্রাণাধিক কন্যা অন্নপূর্ণার ভবিষ্যৎ ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন। মনে মনে বলি, বাবা চিরকাল জানতেন অন্নপূর্ণা প্রেমের দ্বারা যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন রবিশঙ্করের ঘরে অন্নপূর্ণাদেবী লোভের দ্বারা বন্দী হয়ে আছেন, প্রেমের দ্বারা যুক্ত নয়। বাবার কথা শুনে মনে হোল, লোকমুখে নামমাত্র কিছু শুনে হয়ত কিছুটা অনুমান করেছেন। আমার কাছে এখন বিরাট সমস্যা। এ সব কথা লিখব কি করে? এ সব লিখলে নিজেদের গায়েই কাদা লাগবে। লোকে রসিয়ে উপভোগ করবে। অরুণের গাড়িতে বাড়ী এসে গেছি। গাড়ী থেকে নামছি না দেখে অরুণ বলল, 'কি হোল? গাড়ীতেই বসে থাকবে? কি ভাবছ?' অরুণের কথায় চমক ভাঙ্গল। গাড়ী থেকে নেবে কিছুক্ষণ পরে খাবার খেয়ে নিজের খাতা নিয়ে টুকরো টুকরো ঘটনা লিখতে লাগলাম।

৫৭

বাবার জীবনী এ যাবৎ বহু জায়গায় বেরিয়েছে। যে ভুল তথ্যগুলি একবার বেরিয়েছে, সেই ভুল তথ্য এখনও বেরোচ্ছে। বাবার বয়সের ভুল তথ্যের সমাধান করেছি। সব জায়গায় বেরোয় বাবা শাকাহারী, অথচ বাবা মাছ, মুরগি, ডিম খান। এই ভুল তথ্যেরও সমাধান করেছি। সেই যে মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ছাত্রদের নিজেদের বাড়ীতে রেখে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে শিক্ষা দেন, সেটা যে কত বড় ভুল তারও সংশোধন করেছি। উপস্থিত তিনটে সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাবা বাঁ হাতে কেন সরোদ বাজান, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণ লেখা হয়েছে। অবশ্য এর জন্য বাবা কতটা দায়ী সেটা জানতে হবে। এ যাবৎ তিনটে কারণ, মাসিক পত্রিকা এবং সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। অথচ বাঁ হাতে বাজাবার কারণ মৈহার থাকাকালীন বাবা বহু লোককে যা বলেছেন তা ভিন্ন। সে কথা আমি আগেই লিখেছি। আসলে বাবার কথা অনেকেই বোঝেন না, যার ফলে ছাগলকে পাগল এবং পাগলকে ছাগল বলে লিখতে মৈহার থাকাকালীন দেখেছি। এ যাবৎ কোন জায়গায় বেরিয়েছে যে আহমদ আলি খাঁ প্রথম সরোদ শেখাতে রাজি হয়েছিলেন, যদি বাবা বাঁ হাতে সরোদ বাজান। বাবা নাকি এই শর্তে রাজী হয়ে বাঁ হাতে সরোদ শুরু করেন। আবার এক জায়গায় বেরিয়েছে, যে উজীর খাঁর কাছে রামপুরে বাবা যখন যান, তখন বাবা ডান হাতে সরোদ বাজাতেন। উজীর খাঁ বাবাকে বলেছিলেন, 'তোমার হাতের টিপ ভুল পড়েছে

সেইজন্য যদি বাঁ হাতে বাজাও তাহলে শেখাব।' এই কথায় বাবা নাকি বাঁ হাতে সরোদ শুরু করেছিলেন। এ সব ঘটনা অনেক আগে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। কিন্তু আমার মৈহার থাকাকালীন যে সময় শান্তিনিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসার হয়ে গিয়েছিলেন, সেই সময় বাবার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শুভময় ঘোষ। সেই সাক্ষাৎকারটি সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। বাবা শুভময় ঘোষকে নূতন কথা বলেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, 'রামপুরে চার বছর ডান হাতেই সরোদ শিখেছি। কিন্তু দরবারের সকলে ধুতিওয়ালা, মাছ খাও, বাঙ্গালী বলে ঠাট্টা করত। সকলেই মাংস খাবার জন্য বলতো, যার ফলে গায়ে শক্তি হলে সরোদ বাজাতে পারব। সকলের ঠাট্টা শুনে একদিন রাগের চোটে বলেছিলাম মা সরস্বতীর জিনিষ, তাই পায়ে জবা ধরব না, তবে বাঁ হাত দিয়ে বাজিয়ে শোনাব। সেই থেকে বাঁ হাতে তারের যন্ত্র আর ডান হাতে চামড়ার যন্ত্র বাজাই। থাপ্পড়ও বাঁ হাতে মারি।' মৈহার থাকাকালীন বাবার সাক্ষাৎকার পড়ে মনে মনে অবাক হয়েছিলাম।

আমার মৈহার থাকাকালীন, বাবা বহু লোককে বাঁ হাতে বাজাবার কারণ হাসতে হাসতে বলতেন, 'যে হেতু শৌচাদি বাঁ হাতে করি, সেইজন্য জবা বাঁ হাত দিয়ে ধরি।' সরোদের প্লেটে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে বলতেন, 'ডান হাত দিয়ে মা সারদার সেবা করি।' সাপ্তাহিক পত্রিকায় যখন উপরোক্ত সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই নি, কেননা বয়স নিয়ে সাতনার যতীন ব্যানার্জির সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল সে কথা ভুলি নি। যদিও নানা প্রসঙ্গে বাবার সঙ্গে যত কথা আমি বলেছি, তত কথা বাড়ীর কোন সদস্য বা ছাত্রকে বলতে দেখিনি। সকলকে বাবার সামনে মূক থাকতেই দেখেছি। তবে বাইরের লোকের সঙ্গে বাবা খুব সহজ এবং রসিকতা করে কথা বলতেন। উপস্থিত বাবা যখন দিব্যি দিয়েছেন সব সত্য কথা লিখতে, তখন আমার কাছে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। বাবাকে ডান হাতে হারমোনিয়াম, তবলা এবং মৃদঙ্গ বাজাতে বরাবর দেখেছি। অথচ এ যাবৎ বহু চর্চিত হয়ে কাগজে বেরিয়েছে, বাবার গুরুভক্তি এত ছিলো যে গুরুর কথায় বাঁ হাত দিয়ে সরোদ বাজিয়ে, গুরু ভক্তির প্রমাণ দেখিয়েছেন। বহু লোককে এই কথা বলতেও শুনেছি। কিন্তু বাবার শেষ সাক্ষাৎকার শান্তিনিকেতনে শুভময় ঘোষকে যে দিয়েছেন, সেই সংবাদটি হিন্দিতে অনুবাদ করে ভূপাল থেকে, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীত একাডেমির সম্পাদক, অশোক বাজপেয়ী উনিশশো বিরাশি সনে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। তবে এই বইটি প্রকাশ হওয়ার আগেই আমার 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক' উনিশশো ঊনআশি সনে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিলো। সেই ইংরেজী বইটি এ্যাকাডেমিতেও পাঠান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শুভময় ঘোষ-এর বাংলা বইয়ের হিন্দি অনুবাদ করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা হোল কেন? হিন্দি অনুবাদ করবার আগে একবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন মনে কেন করলেন না অশোক বাজপেয়ী? আমার ইংরাজি বইটি কি লাইব্রেরির শোভাবর্দ্ধন করবার জন্যই রাখা হয়েছে? বইটি পড়বার সময় কি তাঁর হয় নি? একবারও কি তাঁর মনে হয় নি, আগামী প্রজন্মের সঙ্গীত শিক্ষার্থী, এই ভুল তথ্য নিয়েই রিসার্চ করে ডক্টর অফ মিউজিক উপাধি নেবে? যাক

যা ভুল হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। ভুল মানুষেরই হয়। কিন্তু ভুলকে স্বীকার করতে লজ্জার কি আছে? এ বিষয়ে অন্যকে কি বলব? নিজের ঘরের লোক, আলিআকবর, রবিশঙ্কর সব জেনেও চুপ করে থেকেছে। তাঁদের সময় কোথায় এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার?

আমার সমস্যার কথাই বলি। আমার ইংরেজী বইতে এর সমাধান সংক্ষেপেই সেরেছিলাম এবং লিখেছিলাম বাবা ছিলেন লেফ্‌ট হ্যাণ্ডার। বাবা প্রথম জীবনে বেহালা বাজাতেন বাঁ হাত দিয়েই। সেই সময় কে বাবাকে দিব্যি দিয়েছিলো বাঁ হাতে বাজাবার? আবার ইংরেজী বইতে এ বিষয়ে প্রমাণ সহিত লিখেছি, বাবা ছিলেন লেফ্‌ট হ্যাণ্ডার। আসলে বাবা ছিলেন সব্যসাচী। মা'কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে মা যা বলেছিলেন সে কথা সংক্ষেপে লিখছি। কিন্তু বাবার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই কথাটিই এবারে বলি, অরুণ, ইলা এবং আমি সন্ধ্যাবেলায় বাবাকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা'কে বললাম, 'বাবার কথায় বই তো লিখছি, কিন্তু একটা সমস্যায় পড়েছি। বাবা দিব্যি দিয়েছেন সব সত্য কথা লিখতে, কিন্তু একটা ঘটনাকে নানা ভাবে বলা হয়েছে।' মা বললেন, 'কি হয়েছে বেডা?' বললাম, 'আচ্ছা মা, বলুন তো, আপনি কখনও কি বাবাকে ডান হাত দিয়ে সরোদ বাজাতে শুনেছেন?' অবাক হয়ে মা বললেন, 'বরাবর তো তোমার বাবাকে বাঁ হাত দিয়ে সরোদ বাজাতে দেখেছি। কখনও ডান হাত দিয়ে বাজিয়েছেন বলে তো শুনিনি। তোমার বাবা ডান হাত দিয়ে খাবার খায় কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে সরোদ বাজায়।' মা'র কথা শুনেও সংশয় থাকে। রামপুরে শিক্ষাকালীন চারবছর সরোদ বাজাবার পর, যদি লোকের টিটকিরিতে বাঁ হাত দিয়ে বাজান, সে কথা মা নাও জানতে পারেন। সামান্য চিন্তা করে মা'কে বললাম, 'আগামীকাল বাবার মেজাজ ভাল থাকলে, একটু কায়দা করে বাবাকে কি বলতে পারবেন, কেন সরোদ বাঁ হাতে বাজান?' মা আমার পরিস্থিতি বুঝে বললেন, 'ঠিক আছে বেডা। কাল সকালে এসো, দেখবো তোমার বাবা কি বলে।' বাবা শুয়েই আছেন দেখে মার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা চলে গেলাম। পরের দিন সকালে অরুণ, ইলা এবং আমি বাবার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, বাবা জেগে আছেন। সকলেই বাবাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। ইলাকে দেখেই বাবা বললেন, 'আমার মা এসেছে। মা এলেই আমি ভাল থাকি।' ইলা বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমি মাকে গিয়ে বললাম, 'একটু কায়দা করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন বাঁ হাতে সরোদ বাজান।' মা বললেন, 'চলো যাচ্ছি।'

বাবার কাছে এসে দেখি, ইলা বাবাকে বলছেন, 'সব সময় শুয়ে থাকলে কি শরীর ভাল থাকে?' অরুণ ও ইলা বাবাকে একটু বসিয়ে, পিছনে দুটো বালিশ হেলান দিয়ে তাঁকে বসিয়ে ইলা বলল, 'এই তো কত ভাল লাগছে।' বাবা হেসে উঠলেন। ইতিমধ্যে মা এলেন। হঠাৎ মা এসে বাবাকে বললেন, 'বলতো তোমার নাম কি?' বাবা অবাক হয়ে ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে হেসে বললেন, 'আরে তুমি কি ভেবেছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।' মা বললেন, 'বলই না, তোমার নাম কি?' বাবা ধীরে ধীরে বললেন, 'আল্লাউদ্দিন। আমি আল্লার দিন, মানে সেবক। আমার বাবা নাম রেখেছিলেন আল্লাউদ্দিন। কিন্তু লিখতে হয় বলে আলাউদ্দিন বলি।' মা এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো তোমার বাবার নাম কি?' বাবাকে দেখে মনে হোল খুব মজা পাচ্ছেন। বাবা আগের কথাই পুনরাবৃত্তি করে হেসে বললেন, 'আরে এ সব কি জিগাও? আমাকে কি পাগল ভাবছ নাকি?' মা আবার সেই এক প্রশ্ন করলেন। বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'সাধু খাঁ।'

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো তোমার শ্বশুরের কি নাম?' বাবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মা'র এই রসিকতায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'বশীর মহম্মদ।' পরে মা'কে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম বাবা নিজের শ্বশুর অর্থাৎ মা'র বাবার নাম ঠিকই বলেছিলেন।

এবারে মা বললেন, 'একটা কথা বলো তো? তোমার পোলা আলিআকবর, যতীন ডান হাত দিয়ে সরোদ বাজায়, কিন্তু তুমি বাঁ হাত দিয়ে সরোদ কেন বাজাও?' এই কথা শুনেই বাবার মুখটা যেন কি রকম করুণ মনে হোল। মুখের হাসি উড়ে গিয়েছে। মনে হোল কি একটা কঠিন তাপ গা বেয়ে মুখের উপর উঠে আসছে। বাবা ধীরে ধীরে বললেন, 'জানি না।' এই কথা বলেই বাবা ইলাকে বললেন, 'মা, তুমি আমাকে শুইয়ে দাও।' পরিবেশটা হঠাৎ বদলে গেল। মা যে ভাবে বাবাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ভেবে অবাক হলাম। মা'র এই উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয়, এ যাবৎ কখনও দেখি নি। এ যাবৎ কাজের কথা ছাড়া, মা'কে কখনও বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। বাবার মুখ দেখে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমার স্থির বিশ্বাস, বাবার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ছিলো। আজ না হয় বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চার রকম কথা, বাবা কেন এক একজনকে এক এক রকম কথা বলেছেন। বাবাকে চিরকালই দেখেছি, মিথ্যা কথা বললে রেগে যেতেন। এ স্বভাবটা বরাবরই। বাড়ীর সকলের কাছে শুনেছি চিরকালই বাবা রাগী, স্পষ্টবক্তা এবং সত্য কথা বললেই সাত খুন মাফ, এবং মিথ্যা কথা বললেই তাঁর আর নিস্তার ছিলো না। আমি দীর্ঘ তেইশ বছর তাই দেখেছি। বাবার বাঁ হাতে বাজাবার উপর চাররকম যে কথাগুলি চলে আসছে সবই ভুল। যদি কেউ বলেন কি করে এই সিদ্ধান্তটা ঠিক বলছি? তাঁর উত্তরে একটা কথাই বলব প্রথম জীবনে ভায়োলীন কেন বাবা বাঁ হাত দিয়ে বাজাতেন? সেটাও কি কারো টিটকিরির জন্য বাজিয়েছেন। সে কথা কখনও বাবা বলেন নি। আসল কথা হোল, ভাইলিন বাদক হাবু দত্ত এবং সরোদ বাদক আহমদ আলি খাঁ দুজনেই ছিলেন বাঁ হাতি। শিক্ষাকালীন যে হেতু বাবার কাছে কোন টাকা পয়সা ছিলো না, সেইজন্য তাঁদের যন্ত্রে তিনি তাঁদের মতই বাঁ হাতে বাজাতেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাবা যদিও ভায়োলিন কিছুদিন শিক্ষার পর কোলকাতায় কিনেছিলেন, কিন্তু সরোদ শিক্ষার বেশ কিছুদিন পর নিজের ভাই আয়েৎ আলিকে দিয়ে সরোদ তৈরী করিয়েছিলেন। এ ছাড়া বাবা কখনও বাঁ হাতে থাপ্পড় মারতেন না। বাবাকে ডান হাতেই বরাবর থাপ্পড় বা লাঠি মারতে দেখেছি। অথচ শুভময় ঘোষকে বলেছেন 'বাঁ হাতে থাপ্পড় মারি'। এ সব কথা লিখলাম দুইটি কথাই ভেবে। প্রথম কথা বাবা দিব্যি দিয়েছেন সব সত্য কথা লিখতে, এবং দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস যাতে বিকৃত না হয় তার জন্যই লেখাটা প্রয়োজন।

মৈহারে এবার সাতদিন থেকে, বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে দেখা করলাম। বাবার সম্বন্ধে নানা তথ্য জোগাড় করলাম। মৈহার থেকে মদনলাল ব্যাসকে চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'যে সব সামগ্রী দিয়েছি সেগুলো ঠিক করে সাজিয়ে লিখবেন। ইতিমধ্যে বহু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এ ছাড়া বহু লোকের সাক্ষ্য নেব। সাক্ষাৎকার নেবার পরই আমার সব সামগ্রী যোগাড় হয়ে যাবে। বম্বে গিয়ে কিছুদিন থেকে বই-এর কাজ সম্পূর্ণ করে দেব। এই চিঠিটা লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে দেখাবেন। আপনি যতটা লিখেছেন সেটাও গর্গকে দেখাবেন। বাকী সব দেখা হলে কথা হবে।'

বাবার শরীর একরকমই আছে। আসলে এটা হোল বার্দ্ধক্য রোগ। যে কোন রকমে বইটা প্রকাশিত হয়ে গেলে বাবার হাতে দিতে পারি, সেইটাই হোল আমার কাছে একমাত্র স্বপ্ন। যখনই সময় পাই, তখনই ধারাবাহিক ভাবে সকলের সাক্ষাৎকার লিখে রাখি। রাত্রে হঠাৎ কি মনে হোল জানি না, অরুণ ও ইলাকে বললাম, 'মৈহারের যাঁরা প্রাচীন এবং নবীন বাবার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁদের কাছে বহু সামগ্রী তো পেলাম। একটা কথা বলো তো? তোমরা তো প্রায় পাঁচ বছর মৈহারে বদলী হয়ে এসেছ। তোমাদের সঙ্গে বাবার কি ভাবে আলাপ হোল। এ ছাড়া কোন ঘটনা, যা কি মনে রাখবার মতো, কিছু বলতে পারো? সকলের জন্য কি ভাবে প্রশ্নের তালিকা বানাই তা তো দেখেছো। এর মধ্যে আলিআকবর এবং রবিশঙ্করকে কি কি প্রশ্ন করবো তা আগে থেকে লিখে রেখেছি। তোমরা আজকের দিনটা ভাবো। আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে কথা বলে দেখব কোন নূতন ঘটনার সন্ধান পাই কি না।'

আজ বড় ক্লান্ত, পরের দিন সকালেই বাবার কাছে গেলাম। বাড়ীতে ঢুকতেই বাবাকে দেখলাম কাউকে ইসারা করে ডাকছেন ইধার আ, ইধার আ। কাকে ডাকছেন, বাবা এইরকম ভাবে। দেখলাম দূরে চাকরানি ধীরে ধীরে বাবার কাছে আসছে। অবাক হলাম বাবার মুখের ভাব দেখে। চাকরানি আসবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, বাবা রেগে গিয়ে বলছেন, 'ভাগ, ভাগ!' চাকরানি হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বাবার রাগ দেখেই ভয়ে পালিয়ে গেল। বাবার জোর গলায় আওয়াজ পেয়েই, মা দেখি এসে হাজির। মা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি, কেন বাবা রেগে গেছেন। ইতিমধ্যে আমরা বাবার কাছে পৌঁছে গেছি। আমাদের দেখেই মা বাবাকে বললেন, 'এত শরীর খারাপ, তা সত্ত্বেও কেন রাগ কর? তোমার রাগটা একটু কমাও তো।' হঠাৎ বাবা চোখ কটমট করে মা'কে বললেন, 'কি বললে? আমার মুখের উপর কথা। উঠতে পারি না বলে।' বাবার উত্তেজিত ভাব দেখেই, মা বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে বললেন, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।' সঙ্গে সঙ্গেই বাবা নরম হয়ে গেলেন। দেখলাম বাবার চোখে জল। তবুও বলব, বাবার বহিঃপ্রকাশ নাই। বাবার রাগ এখনও যায় নি। মুহূর্তের মধ্যেই যে ঘটনাটা ঘটল তা আমার চোখে ভাল ঠেকল না। আজকাল তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনায় বাবার চোখে জল দেখি। এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, যাঁরা চিরকাল গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁরা যখন কথায় কথায় চোখের জল ফেলে, সে লক্ষ্মণটা ভাল নয়। তবে আজ বাবা যে ভাবে ইশারায় চাকরানিকে ডাকলেন, সেটা দেখে বুঝতে পারলাম বাবার ভীমরতি হয়েছে। এবারে এসে কয়েকদিন

দেখলাম, খাবার দেবার পর বাবা বলছেন, 'এই মাত্র তো খেয়ে উঠলাম, আবার কেন খাবার দিচ্ছ?' আবার এও দেখেছি, খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর বাবা বলছেন, 'আরে তোমরা এতক্ষণ কি করছ? আমাকে এখনও খাবার দিলে না?' বার্দ্ধক্যে এই সব ঘটনা হয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবাকে আগে কি রকম দেখেছি, কিন্তু আজ? যদিও রাগ এখনও আছে, কিন্তু এত সহজে তো রাগের পরমুহূর্তেই চোখের জলে পরিণত হওয়া কখনও তো দেখিনি। বাবার এই মানসিক পরিবর্তন দেখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। তিন চারদিন পরেই কাশী যেতে হবে, তাই অরুণের দুই মেয়ে পিতু ও ঋতুকে সেতার ও সরোদ শেখালাম। বিকেলে চা খেয়ে অরুণ ও ইলাকে বললাম, 'প্রথম থেকে বলো তো, বাবার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ হোল। যে ঘটনাই মনে থাকে তাই বলো। তাঁর মধ্যে যদি মনের মত তথ্য পাই সেটা আমি বুঝে নেব।'

ইলাই প্রথম বলল, 'জান তো আমি এলাহাবাদের মেয়ে। আমি ছোটবয়সে যখন পড়ি, সেই সময় আমাদের স্কুলে বাবা একবার বাজিয়েছিলেন। বাজাবার পর বাবার কাছে অটোগ্রাফের ছোট নোট বুক নিয়ে কাছে গিয়ে বলেছিলাম, সই করে দিতে। বাবা হেসে আমাকে একটা কবিতা লিখে সই করে দিয়েছিলেন।' এই কথা বলে ইলা আমাকে তাঁর অটোগ্রাফটা দেখাল। দেখলাম বাবার হাতের লেখা কবিতা এবং স্বাক্ষর। তারিখ দেখে বুঝলাম তেত্রিশ বছর আগে বাবা লিখেছেন। বাবার কাছে যে কবিতাটা বহুবার শুনেছি সেই কবিতাটাই লিখেছেন। বাবা লিখেছেন,

আমি তোমার পোষাপাখি ওহে দয়াময়
যা করাও তা করি আমি
আমি কিছু নয়।

বাবার লেখাটা দেখে বুঝলাম, আমার মৈহার যাবার বহু আগে বাবা এটা লিখেছেন। অটোগ্রাফটা দেখে ইলাকে বললাম, 'এবারে বল মৈহারে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে।' ইলা বলল, 'ছয় বছর আগে যখন তোমার বন্ধু মৈহারে বদলি হয়ে এলো তার পরের দিনই সারদা দেবীর মন্দির দর্শন করে আমার প্রসাদ নিয়ে বাবার কাছে ছেলে মেয়েদের নিয়ে গেলাম। বহুদিন থেকে শোনা ছিল বাবা খুব রাগী লোক। তা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে লাল পেড়ে সাড়ী পরে বাবার কাছে গেলাম। বাবা এবং মা'কে দেখলাম। বাবা আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছ?' তোমার বন্ধু নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'মৈহারে গতকাল বদলী হয়ে এসেছি।' বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'আরে আরে, তুমি তো লেখাপড়া করা লোক, বিরাট অফিছার।' বাবার কথা বুঝতে অসুবিধা হলেও বুঝলাম। কথার মধ্যে পূর্ব বাংলার টান আছে। আমার ছেলে মেয়েদের দেখে খুশী হলেন। আমি তো চুপটি করে ভয়ে মাথা নীচু করে বসে আছি। এতক্ষণে বাবা আমাকে দেখলেন। কিছুক্ষণ পরে লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে, ছোট ছেলের মত আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই পোলার তুমি মা হবে।' সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'হবো।' বাবা তখন বললেন, 'আমি তো ম্লেচ্ছ—মোছলমান। তা সত্ত্বেও তুমি আমার মা হবে।' জানি না বাবার মত লোকের সামনে

কি করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো 'হবো।' এই কথা শুনেই বাবা আমাকে, মা বলেই নিজের হাতটা হাঁটুর কাছে আনতেই, আমি হাতটা ধরে আমার মাথায় ঠেকালাম। বাবাকে সারদা দেবীর প্রসাদ দেওয়াতে খুব আনন্দের সঙ্গে খেলেন। তারপরই বললেন, 'মা আজ তুমি, জামাই এবং নাতি নাতনিরা এখানেই খাবে।' বাবার কথা শুনে মনে হোল বাড়ীতে দুটা প্রাণীর মধ্যে যদি আমরা খাই তাহোলে অসুবিধা হবে। তাই বললাম, 'বাড়ীতে রান্না করে এসেছি। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মুসলমান বলে কি ছেলের কাছে খাবে না?' বাবার কথায় অভিভূত হয়ে বললাম, 'আগামী কাল এসে নিশ্চয়ই খাব।' বাবা খুশী হলেন।

সেই যে প্রথম দিন গেলাম, তারপর থেকে বরাবর আজ পর্যন্ত যাই। প্রথম প্রথম প্রত্যেক সপ্তাহে সারদা দেবীর দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে যেতাম। এই ছয় বছরের মধ্যে বাবার শরীর ধীরে ধীরে কত খারাপ হয়ে গেছে। উপস্থিত কয়েক বছর, রোজ একবার বাবার কাছে যাই। বাবা আমাকে দেখলেই ছেলে মানুষের মত বলেন, 'আমার মা এসেছে, আমার শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে।' ইলা কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, অরুণ ইলাকে বলল, 'সেই মালপোয়ার গল্পটা বলো।' আমি বললাম, 'মালপোয়ার আবার কি গল্প?' হঠাৎ দেখলাম ইলা গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বলব, 'সে দিনের ঘটনাটা আজও আমার মনে পড়লে অবাক লাগে। কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর ইলা বলল, 'প্রতি সপ্তাহে সকালে, সারদা দেবীর দর্শন করে যেমন বাবার কাছে যাই এবং প্রসাদ খাইয়ে আসি, সেইরকম একদিন গিয়ে একটা ব্যতিক্রম দেখলাম। পাঁচ ছয় মাস আগে একদিন বাড়ী গিয়ে দেখি, দরজায় ছিটকিনি লাগান এবং ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তালা লাগান আছে। দুপুরের অনেক আগেই তালা লাগান হয়েছে কেন? বাড়ীতে চাকর আছে তা সত্ত্বেও তালা। ছিটকিনির আওয়াজ করাতে, মা এসে তালা খুলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তোমার পোলা দেখ আমাকে তালা ছুঁড়ে মেরেছে। এই দেখ আমার কপাল ফুলে গেছে।' এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'এই অসময়ে তালা লাগিয়েছেন কেন আর বাবাই বা কেন তালা ছুঁড়ে মেরেছেন?' মা বললেন, 'তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি যে সময় রান্না ঘরে থাকি, তার ফাঁকে দুদিন চাকরের মুখে শুনেছি, দুটি ছেলেমেয়ে এসেছিলো। তোমার বাবার মাথার কাছে যে কাচা লুঙ্গী থাকে তা দিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য তালা লাগিয়ে দিয়েছি।' আজ তোমার বাবাকে খাবার দিতে যখন গেলাম বললেন, 'আমাকে তো মালপোয়া মিষ্টি একজন মেয়ে এসে খাইয়ে গেল। পেট ভরে আছে তাই আজ কিছু খাব না।' তোমার বাবার কথা শুনে বললাম, 'দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছি, এরমধ্যে কে তোমায় খাইয়ে গেল।' তোমার বাবা অবুঝের মত বারবার বলছে কপালে সিন্দুরের ফোটা লাগিয়ে একজন মেয়ে এসে তাঁকে মালপোয়া আর মিষ্টি খাইয়ে গেছে। তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দরজার তালা খুলে যখন তোমার বাবাকে দেখালাম, তালা লাগান অবস্থায় কে তোমাকে খাবার খাওয়াল? এই কথা শুনেই তোমার বাবা রেগে গিয়ে বলল, আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? এই কথা বলেই তালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল যা আমার কপালে লেগেছে।' মা'র কাছে এই কথা শুনে বাবার কাছে গিয়ে দেখি বাবা জেগে থাকলেও গম্ভীর হয়ে আছেন। রোজ

আমাকে দেখে যে ভাবে অভ্যর্থনা করেন, তার লক্ষণ দেখলাম না। বাবার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'আমার ছেলে হয়ে আপনি আমার মা'কে তালা দিয়ে মেরেছেন?' সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলে মানুষের মতো দুই হাতে দুটো কান ধরে বললেন, 'মা ভুল হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করো আর কখনও করব না। তবে তোমার মা কেন বিশ্বাস করছে না, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা যেমন তুমি লাগাও, সেই রকম সিন্দুর এবং ঘোমটা পরে আমাকে মালপোয়া এবং মিষ্টি খাইয়ে গেল একজন মেয়ে। এই দেখ, আমার পেটভরা আছে গলা পর্যন্ত,' বলেই একটা ঢেকুর তুললেন। বললেন, 'এ ছাড়া আমার গলায় মালা পরিয়ে গেল।' বাবার একথা শুনে অবাক হলাম। সত্যই গলায় দেখলাম লাল সুতো, যেমন মন্দিরে পুজোর পরে পাণ্ডা লাল দাগা দেয়। এ ছাড়া ঢেঁকুর তোলা দেখে মনে হোল সত্যই খেয়ে উঠেছেন। কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা আপনি কি মালপোয়া খেতে ভালোবাসেন?' বাবা বললেন, 'এত ভাল মালপোয়া কখনও খাই নি।' এ কথা শুনে বাবাকে বললাম, 'কাল আমি মালপোয়া তৈরী করে এনে খাওয়াব।' বাবা খুশী হলেন। এর পর মা'কে গিয়ে বললাম, 'হয়ত আপনার অজান্তে কেউ এসে বাবাকে খাইয়ে গেছেন তাই আজ আর খাবার দিতে হবে না। আমি বিকেলে আবার আসব। সেই সময় সন্ধ্যা হলেই বাবাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে যাব।' এই কথা বলে ইলা বলল, 'আজও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, গলায় বাবাকে লাল সুতো কে পরাল, এবং প্রচুর পরিমাণে খেলে যেমন ঢেঁকুর ওঠে তাই বা কি করে হোল? বাবার বিষয়ে এই গল্পটা বলে ইলা চুপ করে গেল।

অরুণ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল, 'মৈহারে আসার পর, বছরে একটা দিন আমি খুব বিপদে পড়তাম বাবাকে নিয়ে।' অরুণের কথা শুনে কৌতুহল হোল। বললাম, 'কি রকম বিপদ?' অরুণ বলল, 'ঈদের দিন আমার জীপে বাবাকে বসিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতাম। বাবাকে নমাজ পড়তে দেখতাম। আমিও মাথায় একটা রুমাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। দূর থেকে বাবা আমাকে দেখতে পেতেন। ঈদের নমাজ পড়বার পর, বাবা সোজা ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে সবচেয়ে আগে কোলাকুলি করতেন, তারপর কিছু লোকের সঙ্গে কোলাকুলি শেষ হলে, বাবাকে জীপে চড়িয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিতাম। বিপদ হতো যখন হর্ণ বাজাতাম। বাবা বলতেন, 'জামাই বাবা লয়ে হর্ণ বাজাও।' প্রথম প্রথম আমি বুঝতাম না, বাবা কি বলতে চাইছেন। একদিন বাবা, এক, দুই, তিন, চার বলে নিজেই হর্ণ বাজিয়ে বললেন, 'এই রকম লয়ে হর্ণ বাজাবে।' অরুণের কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। অরুণ বলল, 'লোক দেখলেই তো হর্ণ বাজাব। আর তা ছাড়া লোক যদি না থাকে, তাহলে বাবার কথামত, চারবার হর্ণ কি করে বাজাব? আরে ভাই, আমি লয়ের কি বুঝি?' অরুণের কথা শুনে বললাম, 'এখন এই অবস্থায় বাবাকে কি করে নিয়ে যাও? ঈদের তো আর বেশী দেরী নেই।' অরুণ বলল, 'ছয় বছর হোল মৈহারে এসেছি। গত বছরে নিয়ে যাই নি শরীর খারাপ বলে। আর এই বছরে তো নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' আমাদের কথার মধ্যে ইলা আমায় জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ীতে তালা দেওয়া সত্ত্বেও ববার গলায় লাল ধাগা এবং মালপোয়া খাওয়াটা কি ব্যাপার বলো তো? তুমি তো আধ্যাত্মিক এবং সাইকিকাল রিসার্চ-

এর অনেক গল্প বলেছো। এই জিনিষটাকে তুমি কি বলবে?' কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বললাম, 'এখন চলো বাবার কাছে, বাড়ীতে এসে এর জবাব দেবো।'

যথারীতি বাবাকে গিয়ে দেখলাম খাটে শুয়ে আছেন। বাবার মেজাজ খারাপ ছিল, কিন্তু আমরা যাবার পর ইলাকে দেখেই বাবার প্রসন্ন মুখ দেখলাম। সকালে রোজই ইলা গিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে শরীর মুছিয়ে দেবার পর, পাউডার লাগিয়ে দেয়। বাবা খুশী হন। আমি মৈহারে গেলেই বাবার জন্য আতর নিয়ে যাই। ইলা আতরও লাগিয়ে দেয়। বাবার মুখে হাসি দেখি। কিন্তু আজ বিকেলে গিয়ে, ইলা পাউডার লাগিয়ে দিল, বাবা বললেন, 'কেন এই বুড়ার জন্য এত কষ্ট করো?' ইলাও সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'ছেলে ছোট হলে মা ছাড়া আর কে করবে?' বাবা ইলার হাতদুটো ধরে মা মা বললেন। কিছুক্ষণ পর ইলা, মা এবং জুবেদা বেগমের কাছে গেল। অরুণ ও আমি বাবার কাছে বসলাম। বাবার কাছে গেলেই চাম্পি করি। মৈহার থাকাকালীন অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে বলে কিছুদিন হাত, মাথা টিপতে দিতেন না। কিন্তু শরীর খারাপের পর যতবার গেছি প্রথমে আপত্তি করলেও বাধা দিতেন না। টিপে দেবার পরই প্রাণখুলে আশীর্বাদ করতেন। বাবার খাবার পর আমরা চলে এলাম।

বাড়ীতে এসেই ইলা আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'বলতো বাবাকে কে মালপোয়া খাইয়েছিলো?' উত্তরে বললাম, 'দেখ আমি বাজনা বাজাই। প্রথমেই ঝালা শুনতে চাও। আলাপ না করে, কি করে ঝালা বাজাব? আজ তোমার কথা শুনে বুঝলাম, বাবা কেন তোমায় এত ভালবাসেন। আসলে, প্রথম দিন বাবার কাছে ঘোমটা দিয়ে, গোল বড় সিঁদুর কপালে লাগিয়ে, পুজো দেবার জন্য, বড় লালপেড়ে সাড়ী পরে গিয়েছিলে। সেই দিনই, বাবা তোমাকে বাঙ্গালীর মাতৃরূপে দেখেই, আবেগে তোমার পোলা হতে চেয়েছিলো। এতদিন আমার চোখে পড়ে নি। আজ লক্ষ্য করলাম, বাবার সামনে ঘোমটা দিয়ে লাল গোল সিন্দুর পরেছিলে। বাবার সামনে বরাবর ঘোমটা দাও অথচ অন্য কোন সময়ই ঘোমটা দাও না। সত্যই তোমার তুলনা নাই। এ তো গেল ভূমিকা। এবারে আসল কথায় আসি। বাবার মালপোয়া খাবার, দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হতে পারে মন্দিরের কোন পাণ্ডা মা'র অজান্তে গিয়ে গলায় পুজোর লাল দাগা পরিয়ে প্রসাদ দিয়ে চলে গিয়েছিলো। হয়ত কপালে পাণ্ডার সিন্দুর ছিল। বাবার ব্যাণ্ডের দশরথের ভাইপো, সারদা দেবীর পাণ্ডা বোধ হয় এসেছিলো। বয়সের জন্য বাবা ছেলেকেই মেয়ে ভেবেছেন। দশরথের ভাইপোটা বেঁটে, সুন্দর এবং দেখতে মেয়েদের মত। মনে হয় পুজোর ভোগে কেউ মালপোয়া চড়িয়েছিল, যা কিনা বাবাকে দিয়ে গিয়েছে। আর এ যদি না হয় কোন অলৌকিক ঘটনা বলো তাও অসম্ভব নয়। ভারতে অনেক সাধক, এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা দেখেছেন। যেমন স্বরূপানন্দ, কাঠিয়াবাবা, পরমহংসদেবের গল্প পড়ে জানা যায়। অঘটন আজো ঘটে। এ কথা তো ঠিক, বাবা সারদা দেবীর অনন্য ভক্ত। সারদা দেবীর অলৌকিক ঘটনা, মৈহারের বয়োবৃদ্ধ লোকের কাছে কিছু শুনেছি। যাই হোক না কেন, বাবা দিনে দিনে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় এসেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার একটাই ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি বইটা লিখে বাবার কাছে দিতে পারি।'

এই ঘটনার কয়েকদিনের পরই কাশী গেলাম। কাশী আসবার পর দিল্লী, কোলকাতা এবং বিভিন্ন জায়গায় বাজাতে গিয়েছি। ইতিমধ্যে বই লেখার ব্যাপারে বাবার সম্বন্ধে সব কথা অবশ্য একসঙ্গে জানতে পারি নি। ছাড়াছাড়া ভাবে বাবার কাছে অনেক কথা শুনেছি। মা, এবং জুবেদা বেগমের কাছে অনেক কথা শুনেছি। মেয়েদের কৌতুহল প্রবৃত্তিটা এভারেজ দেখতে পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে সেটা গুণে বলা যেতে পারে। কৌতুহল দমন করে সংযম, শিক্ষা, ছোটবেলায় যাঁরা শিক্ষা পান তাঁরাই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়েন অন্নপূর্ণাদেবী।

অন্নপূর্ণাদেবীর মুখ থেকে কথা বের করা কঠিন। তাহলেও কিছু তথ্য পেয়েছি। এ ছাড়া বাবাকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাঁদের কাছেও অনেক কথা শুনেছি। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। বেশীর ভাগ লোক যে মুহূর্তে জানতে পেরেছেন, বাবার উপর বই লিখছি সেই মুহূর্তে নিজের সম্বন্ধে বাড়িয়ে চড়িয়ে অনেক কথা বলেছেন। বেশীর ভাগ লোককেই দেখেছি, অতিরঞ্জিত করে নিজের প্রাধান্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা, তার যাচাই করতে আমাকে অসাধ্য সাধনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাবা বলেছিলেন, 'এই বই লিখলে তোমার শিক্ষা দীক্ষার পরীক্ষা হবে।' এই বই লিখবার জন্য সব জায়গায় যদি না যেতাম তাহলে সংগীত জগতের অনেক কিছু অজানা থেকে যেত। আমি যদিও বরাবরই ঘরকুনো, বই লিখবার ফলে সঙ্গীত জগতের অনেক অজানা জিনিষ চোখে পড়েছে। সত্যই আমার শিক্ষা দীক্ষার পরীক্ষা হোল। অনেক পুরুষ নিজের উন্নতি আর নিজের খ্যাতির জন্য যে কতরকম হীন কাজ করে তা ভাবা যায় না। দেখলাম, বন্যার জল আর টাকার বন্যা এক বস্তু। এক সময় ছিল টাকার জন্য চটি ঘসে গেছে, বন্ধুরা নানা অসৎ উপায়ে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। সেই সময় চোখে অন্ধকার দেখতে হয়েছে, কিন্তু আবার সময় যখন হয়েছে, টাকার বন্যায় দিশেহারা করে দিয়েছে। মুষ্টিমেয় সঙ্গীতজ্ঞকে আবার একটা সেকেণ্ড ফ্রন্ট রাখতে দেখেছি।

এই সেকেণ্ড ফ্রন্ট হোল চামচের দল, সবাই মোসাহেবী করতে ব্যস্ত। এই চামচেদের বশ করা হয়েছে টাকা, জিনিষ, প্রোগ্রাম কিংবা চাকরি দিয়ে। তার ফলে, এই চামচেরা কত যে হীন চক্রান্ত করছে, ভাবতেও অবাক লাগে। এই সেকেণ্ড ফ্রন্টের কাজই হোল সঙ্গীতজ্ঞকে তুলে ধরা সকলের চোখে, যেন তেন প্রকারেণ। কিন্তু যে সঙ্গীতজ্ঞরা এই সেকেণ্ড ফ্রন্টকে টাকা দিয়ে বশ করছে, সেটাও একটা বড় আর্ট। সবাই তো পারে না। টাকা উপায় করা যেমন একটা আর্ট, সেই টাকায় পরকে দিয়ে কার্য সিদ্ধি করতে পারা আরও বড় আর্ট। মনে পড়ে যায় বাবার কথা।

মৈহারে বাবা প্রথমে নিজের বাড়ীর নামকরণ করেছিলেন শান্তিকুটির। বাবার বাড়ী ছিল আশ্রম। দীর্ঘদিন থাকাকালীন, আশ্রমের মাহাত্ম্য বুঝি নি। কিন্তু ছাড়বার পর থেকে আজ পর্যন্ত বুঝলাম, যেখানে যতো স্বচ্ছলতা, সেখানে তত অশান্তি। যেখানে যত পুণ্যের জাঁকজমক, সেখানে তত পাপের পসরা। যেখানে যত শৃঙ্খলা সেখানেই তত বিশৃঙ্খলা। মানুষকে শান্তি দেবার নাম করে, অশান্তির রাজত্ব কায়েম করতে হয় কিভাবে, তারই মহড়া

চলছে। সঙ্গীত শিক্ষার নামে কি ব্যভিচার। সঙ্গীত শেখানের নামে কেবল টাকা নেবার ফন্দি। তাঁরা মনে করেন এই নেওয়ার মধ্যেই পরমার্থ লুকিয়ে আছে। কিন্তু এ জিনিষ বাবার মধ্যে তো দেখি নি। বাবার কাছে দেখেছি কেবল দেওয়ার পালা। বাবা জীবন ভোর দিয়েই গিয়েছেন। কিন্তু মৈহারের বাইরে গিয়ে দেখলাম কারো দেবার নাম নাই, কেবল নিতেই ব্যস্ত। বাবার উপর বই লিখতে গিয়ে কত শিল্পীর সঙ্গে কথা হোল। অবাক হই, যখন দেখি আজকালকার যাঁরা নামী দামী শিল্পী, যাঁর কাছ থেকে শিখেছে তাঁদের নামও করে না, উপরন্তু বদনাম করে। অথচ বাবাকে দেখেছি, যাঁর কাছে একটুও শিক্ষা পেয়েছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম নিয়েছেন। আজকালকার বোধ হয় এইটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য পরিণতি হোল, সঙ্গীতের নিম্নগামী হয়ে যাওয়া।

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। উপস্থিত বহু সামগ্রী জোগাড় হয়েছে। বছর শেষ হতে আর দেরী নাই। কোলকাতায় বাজিয়ে, কাশীতে এসেই দুটো চিঠি পেলাম। মেহার থেকে অরুণ চিঠি দিয়েছে। আগামী বছরের চোদ্দ জানুয়ারী রবিশঙ্কর বিকেলে গাড়ী করে মৈহার আসছে। জব্বলপুরে বাজিয়ে, মৈহারে এসে তিনদিন থেকেই চলে যাবে। এ ছাড়া রবিশঙ্কর আসবার আগে, পর পর তিনদিন আমার প্রোগ্রাম ঠিক করেছে রেওয়া, সাতনা এবং কাটনিতে। যাক একটা মস্ত বড় সুযোগ পেয়েছি। মৈহারে নিরিবিলিতে তিনদিন রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নিতে পারব। বাকী রইল আলিআকবর। জানুয়ারীতে আলিআকবর আসবে। কোলকাতায় সেই সময় প্রোগ্রাম করতে যাব এবং আলিআকবরের সাক্ষাৎকার নিলেই অনেকটা কাজ শেষ হবে।

দ্বিতীয় চিঠিটা লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ বম্বে থেকে লিখেছে। গর্গ লিখেছে, 'মাতাজি খুব কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। রবিশঙ্কর দীর্ঘদিন মাতাজির হাত খরচের জন্য বাটলিওয়ালার মারফৎ মাসিক দুই হাজার টাকা মাসের পয়লা তারিখে দেয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন হোল, পয়লা তারিখে টাকা দেওয়ার বদলে মাসের মাঝামাঝি দেয়। মাতাজি টাকার জন্য নিজের ছাত্রকে পাঠালে, বাটলিওয়ালা তিন চারবার বলার পর টাকা দেয়। এর জন্য মাতাজি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। এ ছাড়া সব রকমের ট্যাক্স দিয়ে মাতাজির এই টাকায় চালান কষ্টকর হয়ে ওঠে। একমাত্র তুমিই পার রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলে এর সমাধান করতে। রবিশঙ্করকে বলবে, মাসিক তিনহাজার টাকা যেন সে দেয়। এছাড়া, বাটলিওয়ালাকে যেন কড়া নির্দেশ দেয় যে মাসের পয়লা তারিখে টাকাটা যেন মাতাজি পান।'

চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। ছয় মাস আগে যখন বম্বে গিয়েছিলাম তখন অন্নপূর্ণাদেবী আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। আসলে আমার মাথা গরম বলে কিছু বলেন নি, পাছে এ নিয়ে গোলমাল করি। বরাবরই দেখেছি সহজে কিছু বলতে চান না। বাবার বিষয়ে অথবা নিজের পারিবারিক বিষয়েই কি সবকিছু বলেছেন? আসলে কায়দা করে তাঁর কাছে কথা বার করতে হয়। আগে বরাবরই রবিশঙ্কর মাসিক তিনহাজার করে দিত। কিন্তু হঠাৎ এক হাজার কবে থেকে কম করে দিচ্ছে? যে হেতু শুভ চলে গেছে, তার জন্যই কি রবিশঙ্কর টাকা কম করে দিয়েছে। রবিশঙ্করের এই ব্যবস্থাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম। চিঠিটা বারবার

পড়লাম। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। টাকার জন্য বারবার ছাত্রদের পাঠাতে হয়, এই কথাটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। যেমন করে হোক এর সমাধান করবই। যাক একদিক দিয়ে ভালই সুযোগ এসে গিয়েছে। মৈহারে রবিশঙ্করের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা হবে। সেই সময় কথা বলব। গর্গকে টেলিগ্রাম করে জানালাম, কোন চিন্তা না করতে। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে জানাব।'

মৈহারে অরুণকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম নির্দিষ্ট সময়ে, আগামী বছরে পৌঁছব। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সে নিজের গতিতে চলে। পুরোনো ক্যালেণ্ডার বাতিল হয়ে নূতন ক্যালেণ্ডার নিজের স্থান করে নেয়।

৫৮

মানুষ যে দিন জন্মায় সেই সময় থেকে মৃত্যু তার পেছনে ধাওয়া করে। এ নিয়ম সব জীবের পক্ষে সত্যি। চোখের সামনে প্রতিদিন এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করলেও, কেউই কল্পনা করে না যে এমন একটা দিন আসছে, যে দিন তাঁকেও এই নিয়মের অধীন হয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। যখন বিদায় নেওয়ার পালা আসে তখন বড়ো দেরী হয়ে গিয়েছে। তখন খেয়াল হয়, এখনও তার অনেক করণীয় কাজ বাকি পড়ে আছে। তখন মনে পড়ে যায়, জীবনটা বড় বাজে কাজে খরচ হয়ে গিয়েছে। তখন মনে পড়ে যায় যা করবার জন্য তার জন্ম হয়েছিলো, তা আরম্ভই করা হয় নি। যা পরে করবো বলে বাকী ফেলে রেখে দিয়েছিলো, তা বকেয়াই পড়ে রয়েছে। পরের বলে যা হাতে আছে তা কেবল শূন্য।

বছরের শুরু হোল ভালভাবেই কিন্তু কে জানত, উনিশশো বাহাত্তর সনটিতে চিত্রগুপ্ত নিজের খাতায় আমার জীবনে এত বড় অকল্পনীয় বিষয় লিখে রেখেছেন। কিন্তু সে কথা পরে। আগের কথাই প্রথমে বলি। নির্দিষ্ট দিনে, রাত্রে মৈহার পৌঁছলাম। স্টেশনে অরুণকে দেখলাম। গাড়ী থেকে নেমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা কেমন আছেন?' অরুণ বলল 'বছরের প্রথম দিনেই পান্না গিয়েছিলাম বাবা মা'য়ের কাছে। আটদিন থেকে আজই সন্ধ্যার সময় সকলকে নিয়ে মৈহার ফিরেছি। তবে পান্না যাবার দিন, বাবার সঙ্গে দেখা করেই গিয়েছিলাম। তুমি যেমন দেখে গিয়েছিলে সেইরকমই আছেন।' তিনদিন, পরের পর কবে, কোথায় প্রোগ্রাম হবে সব বিষয় জানতে পারলাম। যাক তার জন্য কোন চিন্তা নাই।

সকালে ইলা বলল, 'কয়েকদিন মৈহারে না থাকার ফলে, অনেক কাজ বেড়ে গেছে। মা'কে গিয়ে বোলো আমি বিকালে যাব।' বললাম, 'ঠিক আছে।' অরুণ জীপে আমাকে বাবার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বলল, 'এখন যাচ্ছি অফিস। লাঞ্চ টাইমে তোমাকে নিয়ে বাড়ী যাব। সেইসময় বাবার সঙ্গে দেখা করব।' অরুণ অফিস চলে গেল। আমি বাড়ীতে ঢুকেই, আলিআকবরকে দেখে অবাক। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার খুব নিশ্চিন্ত মনে নিতে পারব। ধ্যানেশকেও দেখলাম। ধ্যানেশের কাছে শুনলাম, তাঁর বড় দাদু, ফকির সাহেবের মেয়ে, ইন্দুবালা নিজের মেয়ে সাহানাকে নিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধের ভয়ে কোলকাতায় এসেছিলো। কোলকাতায় থাকার জায়গার অভাবে তাঁর মা, অর্থাৎ জুবেদা বেগম বাবার শরীর খারাপ বলে তাঁদের নিয়ে মৈহারে এসেছেন। এতদিন ফকির

সাহেব-এর নানা গল্প শুনেছি, কিন্তু আজ ফকির সাহেবের কন্যা এবং তাঁর নাতিকে দেখলাম।

বাবাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। বাবাকে দেখে মনে হোল আরো শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাবা আচ্ছন্নের মত হয়ে আছেন। দেখলাম বাবাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। বাবা কিছুক্ষণ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বাবার হাত একটু চাম্পি করে দেবার পর চিনতে পারলেন। বাবা বললেন, 'কে যতীন?' বুঝলাম প্রথমে চিনতে পারেন নি। দেখি বাবার চোখে জল। চোখের জল পুছিয়ে দেবার পরই, আবার চোখ বুজলেন। বাবার গলার আওয়াজটা বদলে গেছে। বারান্দায় দেখলাম আলিআকবর, জুবেদা বেগম এবং গুলগুল কথা বলছে। আলিআকবরকে বললাম, 'কবে এলেন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে?' উত্তরে বলল, 'আমেরিকা থেকে দিল্লী এসে সোজা মৈহারে এসেছি কয়েকদিন হোল।' বললাম, 'ভালই করেছেন। বাবার শরীর খারাপের দিকেই যাচ্ছে।' আলিআকবর বলল, 'আমি যখন এসেছি প্রথমে তো চিনতেই পারেন নি। পরে চিনেছেন। কখনও কখনও খুব সজাগ, আবার পরমুহূর্তেই আধ ঘুমোন অবস্থায় থাকেন।' আলিআকবরকে চিন্তিত দেখলাম। খুবই স্বাভাবিক, চিন্তার তো কথাই। জুবেদা বেগম এবং গুলগুল ধীরে কথা বলছে। তাঁদেরও চিন্তিত দেখলাম। আমাকে দেখে জুবেদাবেগম ও গুলগুল কাছে এল। আলিআকবরকে বললাম, 'কি ব্যাপার? আপনাদের সকলকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ডাক্তার কিছু বলেছে না কি?' আলিআকবর বলল, 'বাবাকে এই অবস্থায় দেখব, ভাবতে পারি নি। চিন্তার কারণ তো আছেই।'

আলিআকবরকে বললাম, 'আগে বাবাকে দেখে আসি।' বাবাকে দেখে অবাক হলাম। বাবাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। শিরার মধ্যে ছুঁচ লাগিয়ে গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে। গতবারে এ সব তো দেখি নি। বাবার এই অবস্থা দেখে অবাক হলাম। বুঝলাম, বাবার শরীর খুবই খারাপ। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে হাজির। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবাকে কি রকম দেখছেন?' ডাক্তার বলল, 'বাবার কোমা স্টেজ চলছে। এই অবস্থায় এক বছরও বাঁচতে পারেন, আবার আগেও পরপারে যেতে পারেন। বাবা জীবনভোর সঙ্গীতের সাধনা করে, এখন বাজাতে পারছেন না। এটাই বাবাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে।' বললাম, 'বরাবর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও বাবার আঙ্গুল চলছে। মনে হয়, লয়ে আঙ্গুল ঠিক চলে যাচ্ছে। এটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।' ডাক্তারবাবু কোমা স্টেজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তারপর বললেন, 'বাবা মনে মনে সঙ্গীতের লয়ে চলছেন। এতদিনের দীর্ঘ অভ্যাস কি যেতে পারে? মনে হয় সেই মনীষীর কথা, 'লেট মি হ্যাভ ডায়িং উইত মাই মিউজিক এনড আই সিক নো মোর ডিলাইট।' বাবাও বোধ হয় সেই কথা ভাবছেন। এই ভেবেই নিজের অজান্তে আঙ্গুল ঠিক ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। আঙ্গুল চালান বন্ধ হলেই বাবাও আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না।' এই কথা কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত সব চিকিৎসা করেও যদি ভাল না হয়, তবে এ সবের কি দরকার? ডাক্তার সব দেখে চলে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেখলাম। মনে হোল অভ্যাসে সঙ্গীত হৃদয়ে বসে। তেমনি করেই এ বিশ্বাস বাবার হৃদয়ে জুড়ে ছিলো। শেষের

দিনে নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও এই বিশ্বাস নিয়ে চোখ বুজেছেন, নইলে এই অচেতন অবস্থায় তাঁর আঙ্গুল নিজের অজান্তে লয়ে পড়ে কি করে? এ আমার কাছে পরম বিস্ময়।

বাবাকে দেখে আলিআকবরের কাছে গেলাম। বাবার চিকিৎসা নিয়ে আলিআকবরের সঙ্গে নানা কথা হোল। আচমকা আলিআকবর বলল, 'আচ্ছা একটা কথা বলো তো? বাবা বাড়ীর উইল করেছিলেন। আমি এসে অবধি সব জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু উইলটা পাচ্ছি না। তুমি কি জানো বাবা কোথায় বাড়ীর উইলটা রেখেছেন।' বললাম, 'জানি।' আমার কথা শুনেই জুবদা বেগম গুলগুলকে বললেন, 'আপনি বাইরের বারান্দায় দাঁড়ান।' দেখলাম মিনিটের মধ্যে জুবেদা বেগম বারান্দা থেকে এসে, আলিআকবর এবং আমাকে ইশারা করে বাবার ঘরের দিকে যেতে বললেন। দেখলাম বাবা চুপ করে চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। ধীরে ধীরে বাবার ঘরের তালা খুলে আমাকে বললেন, 'উইলটা কোথায় আছে খুঁজে বার করুন।' এই রকম চুপি চুপি বাবার ঘরের তালা খোলা এবং ধীরে কথা বলা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত চুপিচুপি ঘরের দরজা খুলে কথা বলছেন কেন?' উত্তরে বললেন, 'ঘরের চাবি খুললেই বাবা চটে যান। একদিন উনি উইলটা খুঁজবার জন্য ঘরে ঢুকেছিলেন। তালা খোলার আওয়াজ পেয়েই বাবা বলেছিলেন, 'আমার ঘরে কে চোর ঢুকেছে?' এই কথা শুনে বললাম, 'বাবার কথায় এখন মনে করার কি আছে? উপস্থিত বাবা সজ্ঞানে নাই।' আলিআকবরকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের বাইরে জুবেদা বেগম দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে ঢুকে দেখলাম বাবা যে ঘরে শুতেন, সেই ঘরের টেবিলটা খালি। টেবিলটায় সঙ্গীতের কিছু খাতা এবং ম্যাগাজিন বরাবর দেখেছি। কিন্তু আজ দেখলাম ডেক্সটার উপর কিছুই নাই। যাই হোক, বাবার শোবার ঘরের লাগোয়া ছোট ঘরে গিয়ে, প্রথমে একটা জায়গা দেখিয়ে বললাম, 'এই মাটির নীচে কিছু গুপ্তধন আছে বাবা বলেছিলেন।' আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলিআকবর বলল, 'সেই মোহর পেয়েছি কিন্তু উইলটা পাচ্ছি না।' বাবা দু'বছর আগে আমাকে উইলের জায়গা এবং গুপ্তধনের কথা বলেছিলেন। অবশ্য গুপ্তধনের কথাটা আমার মৈহার থাকাকালীন যে সময়ে মক্কা গিয়েছিলেন সেই সময়েও বলেছিলেন। দুই বছর আগেও উইল এবং গুপ্তধনের জায়গাটা বলেছিলেন। মোহরের কথাটা আগেই বলেছিলেন বলেই আলিআকবর সেটা পেয়েছে। বাবা না বললে, সেটা পাবার কথা নয়। যাই হোক ছোট আলমারী খুলে, টিনের একটা চোঙ্গার মধ্যে যেখানে উইলটা ছিল, বার করলাম। পাশে একগোছা কাগজ দেখলাম। কাগজগুলো দেখলাম হোটেলের বিল। বিদেশে বাবা যখন গিয়েছিলেন, সেই সময়কার বহু হোটেলের বিল এবং নানা ধরনের বিল। বাড়ীর উইল এবং বিলগুলি বার করে বললাম, 'এইটা হোল বাড়ীর উইল।' হোটেলের বিলগুলো দেখে মনে হোল বাবা সঞ্চয়ী ছিলেন। বললাম, 'এই বিল ছাড়া আরো যদি কিছু থাকে একদিন দেখব। আপনি বোধ হয় শুনেছেন আমি বাবার কথায় একটা বই লিখছি। সেই বই-এ বাবা যে সব জিনিষ রেখে দিতেন, তার প্রমাণ স্বরূপ এই ধরনের কিছু পেলে, বাবার চরিত্রের একটা দিক দেখানো যাবে।' উত্তরে আলিআকবর বলল, 'বই লিখছো এটা শুনেছি, কিন্তু সব কথা জানি না। ঠিক আছে এই হোটেলের বিল এবং অন্য কিছু থাকলে, তোমাকে পরে

একদিন দেখে সব দেবো। উপস্থিত বাড়ীর উইলটা নিয়ে এখন চলো। যদি বাবা উঠে যান এবং দেখেন আমরা এই ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তাহলে বাবা চটে যাবেন।'

আলিআকবরের কথায় ছোট ঘরে তালা দিয়ে, বৈঠকখানার ঘরের বাইরে এসেই দেখি, জুবেদা বেগম দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর দলিল পেয়েছি শুনে, জুবেদা বেগম খুশী হয়ে, বৈঠকখানার ঘরের তালা লাগিয়ে বললেন, 'এখন চলুন উপরের ঘরে।' গুলগুলকে জুবেদা বেগম বললেন, 'উপস্থিত বাড়ীতে যান।' আমরা উপরের ঘরে গেলাম। বাড়ীর উইলটা পড়লাম। আলিআকবর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একটা চিঠি ডি. এম. কে লেখোতো। চিঠিতে লেখো, 'উইল নিয়ে প্রবেটের জন্য কবে গেলে কাজ হয়ে যাবে। আসলে ডি. এম. এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ডি. এম. বলেছেন উইলটা না দেখলে সব সম্পত্তি আমার নামে করা যাবে না। কিন্তু এসে অবধি উইলটা পাচ্ছিলাম না বলেই দেরী হয়ে গিয়েছে।' আলিআকবরের কথানুযায়ী ডি. এম. কে চিঠি দিলাম। চিঠি লেখার পর, খামটা নিয়ে জুবেদা বেগম নীচে চলে গেল। বলল, 'চিঠিটা কাউকে দিয়ে পোস্টঅফিস পাঠাচ্ছি আর আপনাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।' আলিআকবরকে নিভৃতে পেয়ে বললাম, 'আপনাকে মৈহারে দেখতে পাব আশা করি নি। একদিকে ভালই হোল। এর পর কেন বই লিখছি বিস্তারপূর্বক সব বলে বললাম, 'রবিশঙ্কর আসছে জেনেই এসেছিলাম মৈহারে। যদিও তিন দিন আমার বাজনা আছে। রবিশঙ্কর যে দিন সন্ধ্যায় আসবে, সেই দিন সকালে আমিও বাজিয়ে ফিরে আসব। রবিশঙ্কর এলে তাঁর সাক্ষাৎকার নেবো, কিন্তু তার আগে এই ফাঁকে আপনার সাক্ষাৎকার নিয়ে নেব।' আমার সব কথা শুনবার পর আলিআকবর হেসে বলল, 'তুমি তো রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নেবে বলে এসেছ। আমাকে এখানে পাবে তো ভাবো নি। তুমি কোলকাতায় গেলে, তোমার যা যা জানবার আছে বলব।' আমি হেসে বললাম, 'কোলকাতা এত একান্ত ভাবে আপনাকে কি পাব? এত ভাল সুযোগ কোলকাতায় পাব না। তা ছাড়া কোলকাতায় গিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে গেলে অযথা ট্রেনের খরচ আছে। কোন বাজনার প্রোগ্রাম না থাকলে কাশী থেকে আমি কোথাও যাই না।' আলিআকবর বলল, 'কোলকাতায় যাবার খরচা তোমাকে আমি দেব। তার জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই।' এই কথা শুনে অবাক হলাম। বুঝলাম রবিশঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না করে আলিআকবর কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। এতক্ষণ ভাবছিলাম ইয়ারকি করছিল, কিন্তু কথাটা শুনে মনে হোল এ তো রসিকতা নয়। বেশ ভাল মেজাজে ছিলাম, কিন্তু এই কথা শুনে নানা কথা ভেবে রেগে বললাম, 'শুনুন, যদি সাক্ষাৎকার এখানে দেন তো ভাল, আর যদি টালবাহানা করেন, তাহলে সোজা বইতে লিখে দেব আপনি সাক্ষাৎকার দেন নি।' আমার মেজাজ আলিআকবর জানে, তাই বললো, 'বৃথা রাগ কোরো না। ঠিক আছে আমি না হয় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো কিন্তু রবু চিঠিতে বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছে, মৈহারে তিনদিন থাকাকালীন কোন লোকের সঙ্গে দেখা করবে না।' বললাম, 'রবিশঙ্কর লিখতে পারে মৈহারের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করবে না, কিন্তু তার মানে এ তো নয়, যে আমার সঙ্গে দেখা করবেন না।' আলিআকবর বলল, 'ঠিক আছে রবু আগে তো আসুক। রবু যদি রাজী হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে,

তোমার বই-এর জন্য প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহলে আমিও তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। আচ্ছা একটা কথা বলো তো? বম্বেতে, আমার সঙ্গে মদনলাল ব্যাস-এর দেখা হয়েছিলো। সে বলেছিলো, বাবার উপর একটা বই লিখছে।' একথা শুনে মদনলাল ব্যাস-এর সব ঘটনা বলে বললাম, 'সমস্ত সামগ্রী তাঁকে আমিই দিয়েছি। তাঁকে দিয়েই লেখাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমি আরো নানা সামগ্রী যোগাড় করে বম্বেতে গিয়ে বইটা শেষ করব।'

আলিআকবর স্বভাব অনুযায়ী চুপ করে সিগারেট খেতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, বাড়ীর দলিল যখন খুঁজে পান নি তখন অন্য রূপ ছিলো, কিন্তু তারপর এ কি ধরনের কথাবার্তা। বুঝলাম, আমার ধারণা ঠিকই। আসলে রবিশঙ্করের সঙ্গে আগে পরামর্শ করবে। তারপর রবিশঙ্করের কথানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। তার জন্যই এ সব বাহানা। বললাম, 'দেখুন তিন দিন আমার বাজনা আছে। আগামীকাল ভোরবেলায় চলে যাব এবং বাজনা বাজিয়ে মৈহার ফিরতে রাত কাবার হবে। সুতরাং আগামীকাল থেকে আর এ বাড়ীতে আসতে পারব না। রবিশঙ্কর যেদিন বিকেলে এসে পৌঁছবে সেদিনই আমিও মৈহার ফিরে এসে আর কোথাও বাজাতে যাব না। রবিশঙ্কর এলে আমার বইএর কথা বলবেন। কোলকাতায় বহু লোকের এ যাবৎ সাক্ষাৎকার নিয়েছি। রবিশঙ্করের এ কথা নিশ্চয়ই অজানা নেই। আমার বই-এর কথা শুনে যদি রবিশঙ্কর দেখা না করতে চায় তাহলে আমারও দরকার নাই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। রবিশঙ্কর চলে যাবার পর, বাবার সঙ্গে দেখা করব এবং মৈহারে কয়েকদিন থেকে কাশী চলে যাব। আজ যাচ্ছি এবং রবিশঙ্কর যে দিন সন্ধ্যায় আসবে, সেইদিন সকালে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে যাব। উপস্থিত আপনাকে একটা চিঠি দেখাব। আমি তো জানতাম না যে আপনি এসেছেন। আপনি যখন এসে গেছেন একদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। এই চিঠিটা পড়ে রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলবেন।' অবাক হয়ে আলিআকবর বলল, 'কি ব্যাপার? কিসের চিঠি? কার চিঠি? রবিশঙ্করের সঙ্গে কি কথা বলতে হবে?' বললাম, 'সে সব অনেক কথা, যে দিন আসব সেই দিনই বলব। আজ সন্ধ্যায় আসতে পারব না কেননা কাল ভোরেই গাড়ী করে কাটনি চলে যাব।'

ইতিমধ্যে অরুণ এসে হাজির। অরুণকে দেখে আলিআকবর অভ্যর্থনা করে বসাল। অরুণ আলিআকবরকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কবে এলেন? আসবার কথা জানিয়ে কোন সংবাদ তো দেন নি?' আলিআকবর বলল, 'কোন খবর না দিয়েই সোজা চলে এসেছি।' অরুণ আলিআকবরকে দেখে আমাকে বললো, 'তোমার তো তা হলে ভালই হোল। যে দুজনের সাক্ষাৎকারের জন্য তুমি অধীর হয়ে ছিলে সেই দুইজনকেই পেয়ে যাবে।' আলিআকবর কথা ঘুরিয়ে বললো, 'তোমরা দুজনেই এখানে খাবার খেয়ে যাও।' বললাম, 'গতকাল গভীর রাত্রে মৈহারে এসেছি। আজ সকাল থেকে দুপুর হতে চলল। বাড়ীতে আবার স্নান করব তারপর খাব।' এই কথা বলেই অরুণকে বললাম, 'চলো বাড়ী যাই।' হঠাৎ আলিআকবর আমাকে বললো, 'শোনো তোমার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে।' অরুণ এই কথা শুনেই বাবার কাছে গেল। আলিআকবর বললো, 'বাবার খুব ইচ্ছা নাতবৌ দেখবার জন্য। তাই স্থির করেছি, এই মাসের শেষেই, বাবার সামনেই ধ্যানেশের

বিয়ে দিয়ে পরের মাসে কোলকাতায় বিয়ের পার্টি দেব।' অবাক হয়ে বলি, 'পাত্রীটি কে?' আলিআকবর বলল, 'আমার ফকির জ্যেঠামশায়ের মেয়ে, নিজেই মেয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দেব। বাবার ইচ্ছার কথা ভেবেই, আশিসের বিয়ের আগেই ধ্যানেশের বিয়েটা দিচ্ছি। কোলকাতায় বিয়ের পার্টির সময় তোমায় কিন্তু যেতেই হবে।' কোলকাতায় পরের মাসে বিয়ের পার্টির তারিখ জেনে বুঝলাম, সেই সময় কোলকাতায় বাজনা আছে। সুতরাং বললাম, 'ঠিক আছে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব।' বাড়ী গিয়ে খেতে বসে অরুণ এবং ইলার সামনে, আলিআকবরের সংগে যে কথা হয়েছিলো সব বললাম। অরুণ অবাক হয়ে বলল, 'পান্না যাবার আগে রবিশঙ্করের চিঠি আমি নিজে পড়েই তোমাকে জানিয়েছিলাম সে আসছে। কিন্তু সেই চিঠির মধ্যে তো লেখে নি যে মৈহারের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করবে না। তবে আমার পান্না যাবার পর যদি টেলিগ্রাম করে জানায় তা হলে বলতে পারব না। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না রবিশঙ্কর যদি টেলিগ্রাম করেও থাকে, মৈহারের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করবে না, তাহলে তোমার সঙ্গে কেন দেখা করবে না?'

বললাম, 'আসলে কি জানো? আলিআকবর একমাত্র সঙ্গীতই বোঝে। জটিল সমস্যা এলেই তাঁর মন্ত্রণাদাতা হোল রবিশঙ্কর। রবিশঙ্কর যা বলবে সেইমত কাজ করবে। যাক যা হবার হবে। চিন্তা করার কিছু নাই।' ইতিমধ্যে দীপচন্দ এসে হাজির। দীপচন্দ বলল, 'গতকাল বিকেলে দিল্লী ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক আমার কাছে এসে বলেছিলো, হিন্দির সাপ্তাহিক 'দিনমান' পত্রিকায় বাবার একটা ইন্টারভিউ ছাপাতে চায়। কোন জায়গায় আপনার নাম শুনেই, বোধ হয় আমার কাছে এসে বাবার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, বাবার এই সময় শরীর খারাপ। এ ছাড়া বাবা ভালভাবে কথাও বলতে পারেন না। আপনার পরিচয় দিয়ে বলেছি, আপনিই একমাত্র বাবার বিষয়ে সব কিছু বলতে পারেন। আপনি বাবার উপর বই লিখছেন এ কথাও বলেছি। আপনি এসে ব্যস্ত থাকবেন বাজনার ব্যাপারে। যদি ছয়দিন এখানে থাকতে পারেন, তাহলে আপনার কাছে ববার বিষয় সব জানতে পারবেন। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বলেছিলেন, পাঁচ দিন পরেই তিনি মৈহার আসবেন। গতকাল রাতের ট্রেনে তিনি তাঁর এক আত্মীয়র কাছে জব্বলপুর চলে গেছেন। ভদ্রলোক মৈহারে এসে তিন চারদিন থেকে বাবার বিষয়ে সব তথ্য আপনার কাছে নেবেন। মৈহারে গেস্ট হাউসে থাকবার ব্যবস্থার জন্য আমাকে বলে গেছে। তার জন্য আমি অগ্রিম ঘর ঠিক করে রেখেছি। দাদা আপনার মতামত না নিয়ে আমি কথা দিয়েছি।' দীপন্দকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। বাবার বিষয় কেউ লিখতে চাইলে নিশ্চয়ই তাঁকে বলব। এর জন্য সঙ্কোচের কিছু নাই।'

পরের দিন থেকে তিনদিন, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাজিয়ে চতুর্থ দিন ভোর বেলায় মৈহারে এলাম। আজ চোদ্দ জানুয়ারী, রবিশঙ্কর সন্ধ্যার সময়ে আসবে। তাই বাবার বাড়ী গেলাম। বাবা দেখলাম ঘুমিয়ে আছেন। আলিআকবর উপরের ঘরে আছে জেনে, সোজা গিয়ে কোন গৌরচন্দ্রিকা না করে, লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গের চিঠিটা পড়তে বললাম আলিআকবরকে। চিঠি পড়ে ক্ষণিকের জন্য গম্ভীর হয়ে থাকার পর বলল, 'গর্গ তোমাকে যখন চিঠি দিয়েছে তখন

তুমিই এবিষয়ে রবুর সঙ্গে কথা বোলো।' বললাম, রবিশঙ্কর এসে যদি আমার সঙ্গে দেখা না করে, তাহলে কি করে কথা বলব?' আলিআকবর বলল, 'এখানে দেখা না হলে পরের মাসে কোলকাতায় দেখা হলে তখন বোলো।' কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'বলিহারি।' আপন ভাই হয়ে নিজের বোনের অসম্মান এবং কষ্ট হচ্ছে জেনেও রবিশঙ্করকে বলতে পারবেন না? আপনি এখানে থাকতেও আমাকে বলতে হবে?' আলিআকবর দোনামোনা করে বলল, 'তুমিও তো বাবার ছেলে। তুমিই এই বিষয়ে কথা বোলো।' অবাক হবার কিছু নাই। বললাম, 'আপনার তুলনা আপনিই!—চললাম।' আলিআকবর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি। কি রকম বাজনা হোল? এখানে খাবার খেয়ে তারপর যেয়ো।' বললাম, 'আজ ভোরে মৈহারে পৌঁছে ঘুম থেকে উঠেই এসেছি। অবাক হলাম আপনার উত্তর শুনে। আপনার মতি গতি বোঝা ভার। সকলের কাছে বোবা হয়ে ভাল থাকতে চান। প্রয়োজনের সময়, আমি বাবার ছেলে আর অন্য সময়? আপনার বলা আর আমার বলা এক নয়। যাক আমি চললাম।'

সবে খাওয়া শেষ করে উঠেছি ইতিমধ্যে দীপচন্দ এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির। ভদ্রলোক বিশেষ ভূমিকা না করেই বলল, 'আশা করি আমার আসার কারণ শুনেছেন। আসলে হিন্দি সাপ্তাহিক 'দিনমানের' এডিটর আমাকে পাঠিয়েছেন বাবার উপর একটা ফিচার লিখবার জন্য। যদিও আমি সাংবাদিক নই, কিন্তু সখের জন্য একটু গান করি। আসলে আমি দিল্লী ইউনিভারসিটির আণ্ডারে, কিরণ মল কলেজে ফিলজফির প্রফেসার।' প্রফেসারের বিনয় ভাষণ শুনে বললাম, 'বাবার বিষয়ে বলতে গেলে তো সব কিছু বলা যাবে না। কয়েকদিন সময় লাগবে।' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বলল, 'আমি তিন চারদিন থাকব। আপনি যে সময়ে ডাকবেন, সেই সময়ে আসব।' বললাম 'ঠিক আছে। আজ একটু ব্যস্ত আছি। আগামীকাল একটা খাতা নিয়ে এখানেই এসে চা খাবেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর সেই সময় দেব। আমি একটা বই লিখছি বাবার উপর। যেহেতু হিন্দি ভাষায়, তাই একজনকে দিয়ে লেখাচ্ছি। যাকে দিয়ে লেখাচ্ছি, তাঁর কাছে বহু সামগ্রী পাঠিয়ে দিয়েছি। যার ফলে বহু নাম, সন এবং তারিখ সঠিক বলতে পারব না। তবে ঘটনা সব বলতে পারব।' উত্তরে প্রফেসর বলল, 'দীপচন্দজীর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। আপনি যা বলবেন তা আমার জন্য অনেক। আমি একদিনের জন্য যখন এসেছিলাম, সেই সময় উস্তাদের বাড়ী এবং উস্তাদকে কেবল চোখের দেখা দেখে গিয়েছি। আগামী কাল ঠিক সময়ে এসে আপনাকে কষ্ট দেবো।' বিদায় নেবার মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এতক্ষণ কথা হোল, অথচ আপনার নাম কি জানা হোল না।' প্রফেসর হেসে বলল, 'আমার নাম রজত অরোরা।' অরোরা চলে গেল গেস্ট হাউসে।

সন্ধ্যাবেলায় শীতের হিমেল হাওয়া ভাল নয়, এ কথা জানা সত্ত্বেও বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। বসে বসে অলস মাথাকে শয়তানের কারখানা হতে দেব না এ কথা ভেবে ঢুকলাম ঘরে। যন্ত্র নিয়ে বসলাম। মনে ভাবলাম 'শ্রী' রাগের ভাবগম্ভীরতায় চিন্তার উটকো আপদরা অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। সবে মাত্র মিনিট পাঁচেক হয়েছে, একটা গাড়ীর ঘনঘন